

প্রাচীন জন্মস্থান। শ্রীনন্দ ভবন—চৌরাশী খম্বা।
শ্রীধাম পুরানী গোকুল-মহাবন

ওপরে ঃ শ্রীজী বা শ্রীরাধিকার মন্দির—বর্ষাণা। নীচে ঃ নন্দরায় মন্দির—নন্দগ্রাম

কোশী

বিল্ববন

মধু-বৃন্দাবনে

(মহাবন পর্ব)

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রহ্মাণ্ডঘাট—বাঁয়ে ধর্মশালা, সামনে মন্দির

ব্রহ্মাণ্ডঘাট

প্রকাশক :

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : রথযাত্রা, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : চরণ-পাহাড়ীর পথে (কা[illegible]ন)

আলোকচিত্র : লেখক

অঙ্কন : শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রণে :

দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৯ এ, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

যাঁরা আমাকে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন,
যাঁরা আমাকে বৃন্দাবনের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন,
সেই পরমশ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিকদ্বয়

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ও

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ-কে

এই লেখকের কয়েকখানি ভ্রমণকাহিনী :

চতুরঙ্গীর অঙ্গনে

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

নীল-দুর্গম

পঞ্চ-প্রয়াগ

চরণ-রেখা

গহন-গিরি-কন্দরে

গিরি-কান্তার

উত্তরস্যাং দিশি

গঙ্গাসাগর

কেঁদুলীর মেলায়

লীলাভূমি লাহুল

গঙ্গা-যমুনার দেশে

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব)

মধু-বৃন্দাবনে (বনপর্ব)

সাধারণভাবে আমি ভূমিকা লেখার পক্ষপাতী নই। আমার বিশ্বাস লেখকের ... লেখাতেই পরিস্ফুট হওয়া উচিত। কিন্তু আজ আমাকে এই বই শেষ করার পরেও কলম নিয়ে বসতে হয়েছে। কারণ, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে।

প্রথমেই সবিনয়ে বলব—প্রচলিত অর্থে আমি ভক্ত কিংবা বৈষ্ণব নই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রজ-পরিক্রমাকে কেন্দ্র করে আমার এই বই লেখার অধিকার আছে কিনা?

হয়তো নেই। তবু আমি ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমা করেছি, তাঁদের বুঝবার চেষ্টা করেছি এবং পাঁচ বছরের প্রচেষ্টায় তিনটি পর্বে এই 'মধু-বৃন্দাবনে' রচনা করতে সমর্থ হয়েছি। কিন্তু কেন?

কেন আমি দূর-দুর্গম হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরের আকর্ষণ ছেড়ে ব্রজ-মণ্ডলের প্রতি আকৃষ্ট হলাম? কেন আমি পর্বতারোহণের পরিবর্তে কৃষ্ণলীলাস্থলকে অবলম্বন করে সম্ভবত আমার জীবনের বৃহত্তম গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ হলাম?

উত্তরে বলব—পথের বৈচিত্র্যের কথা শুনেই প্রথম আমার পরিব্রাজক-মন ব্রজ-পরিক্রমায় আগ্রহী হয়েছিল। কিন্তু পরিক্রমাকালে আমার বাঙালী-মন বার বার বিচলিত হয়ে উঠেছে। কেবলই মনে হয়েছে, বর্তমান ব্রজ-মণ্ডল তো বাঙালীরই অবদান, অথচ বাঙালী আজ তাকে ভুলতে বসেছেন! তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রবর্তিত ব্রজ-পরিক্রমাকে। আমার মন বলেছে—বিস্মৃতপ্রায় ব্রজ-মণ্ডলের এবং ব্রজ-পরিক্রমার কথা ও কাহিনীকে বাঙালীর কাছে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেবার সময় এসেছে। যোগ্যতর-জনেরা যখন এ কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসছেন না, তখন আমার একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন—ভাব ও ভক্তির প্রাচীর তুলে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলাস্থলসমূহকে দুর্গম করে তুলেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার কোন আপস করা সম্ভব হয় নি। আমি ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণবের দৃষ্টি দিয়েই কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করেছি। কিন্তু দর্শনকালে উপলব্ধি করেছি—পূজারী ও পাণ্ডাদের অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশ্বাস না করলেও আমি শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করি।

ভক্তরা যাঁকে বলেন ভগবান, তিনিই আমার পরম-পুরুষ। ধার্মিকদের যিনি নারায়ণ, তিনিই আমার চোখে নর-নারায়ণ। বৈষ্ণবদের কাছে মানুষরূপী ভগবান, আমার কাছে তিনি ভগবানরূপী মানুষ এবং বিশ্ব-ইতিহাসের মহোত্তম মহামানব। তিনি কেবল কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের আরাধ্য নন। তিনি ভারতীয় জীবনধারার উৎস, ভারতের আদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক। সেই মহামানবের মহাজীবনের অংশ-বিশেষকে ভ্রমণকাহিনীর মাঝে ধরে রাখবার বাসনাই আমাকে 'মধু-বৃন্দাবনে' রচনার শক্তি যুগিয়েছে।

এই সুকঠিন কর্তব্য পালনে আমি কতখানি সফলকাম হয়েছি, তা বিচারের ভার আমার পাঠক-পাঠিকাদের। আমি শুধু তাঁদের বলতে পারি—আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব হল, আমি ততটুকুই সম্পাদন করলাম। কোন যোগ্যতর ব্যক্তি যদি অবশিষ্ট কাজ করতে এগিয়ে আসেন, তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হবে।

ভূমিকার শেষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা সাধারণ রীতি রয়েছে। কিন্তু 'মধু-বৃন্দাবনে' রচনায় আমি এত বেশি সংখ্যক লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করেছি যে, তাঁদের সবার নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তাই বই-য়ের শেষে আমি তাঁদের পৃথকভাবে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। তাহলেও তাঁদের যে তিনজনের নাম আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না, তাঁরা হলেন সর্বশ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, গজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ। রবিবাবু 'মধু-বৃন্দাবনে' প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ করেছেন। আর কাকাবাবু (গজেনবাবু) ও সুমথকাকা আমাকে তাঁদের সঙ্গে করে প্রথম বৃন্দাবন নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্নেহপ্রবণ সুসাহিত্যিকদ্বয়ের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সামান্য স্বীকৃতি স্বরূপই আমি এই পর্বটি তাঁদের দু'জনকে উৎসর্গ করলাম। শুভেচ্ছান্তে—

বিনয়াবনত

লেখক

ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

রথযাত্রা, ১৩৬৭

মধু-বৃন্দাবনে

‘ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥’

হে দেবদেব !
তুমিই আমার মাতা আবার তুমিই আমার পিতা,
তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা,
তুমিই বিদ্যা, তুমিই সম্পদ,
আমার সর্ব-সত্তায় কেবল তুমিই রয়েছো ।

বৃন্দাবন মধুময়। কিন্তু মধু-বৃন্দাবন আর বৃন্দাবন এক নয়।

মধু-বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের শৈশব এবং কৈশোরের কর্মভূমি, বৃন্দাবন ও মথুরালীলার পুণ্যভূমি। বারোটি বন, বারোটি তীর্থ এবং পাঁচটি স্থল নিয়ে গঠিত এই মোক্ষক্ষেত্র। ভক্তরা বলেন ব্রজমণ্ডল, কিন্তু আমি বলি মধু-বৃন্দাবন।

দ্বাদশ বন নিয়ে ব্রজমণ্ডল। বর্তমান বৃন্দাবন শহর সেই মণ্ডলের একটি বন মাত্র। ভক্তরা এই মধুর তীর্থকে বলেন শ্রীধাম বৃন্দাবন, আর আমি বলি মন-বৃন্দাবন।

ব্রজমণ্ডলের অপর এগারোটি বন হল—মধুবন, তালবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খেলনবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাটবন, বিল্ববন, লৌহবন ও গোকুল-মহাবন। আমি এই একাদশ বনের নাম রেখেছি বন-বৃন্দাবন।

চুরাশি ক্রোশ খালি-পায়ে হেঁটে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা পূর্ণ করতে হয়। কলকাতার এক আশ্রমের শতাধিক শিষ্য-শিষ্যা ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি আজ বারোদিন ধরে এই মধুময়মণ্ডল পরিক্রমা করছি।

পরিক্রমার প্রথম পাঁচদিন আমরা মন-বৃন্দাবনে বাস করেছি। সেই কথা নিয়ে রচিত হয়েছে আমার 'মধু-বৃন্দাবনে'র 'ব্রজপর্ব'।

ষষ্ঠদিন সকাল থেকে শুরু হয়েছে বন-বৃন্দাবনের পথে পথে পদ-চারণা। গত ছ'দিনে দর্শন করেছি মধুবন, তালবন, ধ্রুবটিলা, কুমুদবন, শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন, গোবর্ধন, পৈঠা ও ডিগ্। পরিক্রমা করেছি মথুরা, রাধাকুণ্ড ও গিরিরাজ-গোবর্ধন। সেই কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আমার 'মধু-বৃন্দাবনে'র 'বনপর্ব'।

আর আজ থেকে শুরু হল 'মহাবন-পর্ব'।

আজ আমাদের বন-পরিক্রমার সপ্তম দিন। আমরা এখন ডিগ্ থেকে কাম্যবনে চলেছি। কাম্যবনের সরকারী নাম কামাঁ। চোদ্দ মাইল হাঁটতে হবে। তাই আজ খুব সকালে ডিগ্ থেকে বেরোতে হয়েছে।

আমরা কিন্তু আর মথুরা জেলায় নেই, এমন কি উত্তর প্রদেশেও নেই। আমরা এখন রাজস্থানের ভরতপুর জেলায়। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য ভরতপুর ও ঢোলপুরকে নিয়ে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছে এই জেলা। এটি সেই থেকেই রাজস্থান য়ুনিয়নের অন্তর্গত।

ভরতপুর জেলা রাজস্থানের পূর্ব-সীমায় অবস্থিত। এ জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবের গুরগাঁও জেলা, পুবে মথুরা এবং আগ্রা জেলা, দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের মোরেনা জেলা এবং পশ্চিমে রাজস্থানের মাধোপুর ও আলোয়ার জেলা।

বারোটি তহশীল নিয়ে ভরতপুর জেলা, তার মধ্যে ডিগ্ ও কামাঁ দু'টি তহশীল। সব মিলিয়ে 'ন'টি শহর আছে এই জেলায়, তাদের মধ্যেও দু'টি হল ডিগ্ এবং কামাঁ। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী ডিগ্ এবং কামাঁ শহরের জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৭,৬৬৮ এবং ১২,১৪০।

মানসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসে করে গতকাল সন্ধ্যের একটু আগে রাধাকুণ্ড থেকে ডিগ্ পৌঁছেছি। মাত্র মাইল পনেরো পথ, কিন্তু সময় লেগেছে প্রায় দু' ঘণ্টা। কারণ উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান সীমান্তে চুঙ্গি তথা টোল্-ট্যাক্সের ঝামেলা মেটাতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তাহলেও সহযাত্রীদের খুঁজে বের করতে আমার কোনই কষ্ট হয় নি। বাসস্ট্যাণ্ডে একজন টাঙ্গাওয়ালাকে বলতেই সে আমাকে পৌঁছে দিয়েছে প্রাইমারী স্কুল-প্রাঙ্গণে। সহযাত্রীরা সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা সকালে গোবর্ধন থেকে রওনা হয়ে গতকাল

দুপুরে ডিগ্ পৌঁছেছিলেন। আমি আগের দিন রাতে মানসীর সঙ্গে রাধাকুণ্ডে থেকে গিয়েছিলাম।

ডিগ্ ভরতপুর জেলার একটি মহকুমা সদর। ২৭° ২৮´ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭° ২০´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। জেলা-সদর ভরতপুর থেকে দূরত্ব ২৩ মাইল। মূল্যবান বেলে-পাথরে তৈরি রমণীয় রাজপ্রাসাদ শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয়। প্রাসাদের ভেতরে রয়েছে চমৎকার বাগান এবং জলের ফোয়ারা। আর রয়েছে পুবদিকে পাড়-বাঁধানো এক প্রকাণ্ড দীঘি, দক্ষিণে শ্বেত-পাথরের সুরম্য অট্টালিকা ও একটি জলাধার এবং উত্তরে নন্দভবন নামে একটি বিরাট প্রাসাদ। এই প্রাসাদের ভেতর দিকের ছাদে কাঠের খোদাই কাজ দেখবার মতো। রাজপ্রাসাদের পশ্চিম দিকে রয়েছে গোপাল-ভবন—মোগল স্থাপত্য-শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

আমার সহযাত্রীরা কিন্তু এ-সব কিছুই দেখেন নি। কারণ ভারতের ইতিহাসে ডিগ্ রাজপ্রাসাদের যত মূল্যই থাক, তার সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোন সম্পর্ক নেই। আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই ভক্ত-বৈষ্ণব। তাঁদের কাছে ইতিহাসের তেমন কোন মূল্য নেই। তাঁরা বলেন—ইতিহাস হল একটি স্থূল বস্তু।

তাহলেও তাঁরা ডিগে রাত্রিবাস করেছেন। কারণ গোবর্ধন শহর থেকে পায়ে হেঁটে একদিনে কাম্যাঁ যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ডিগে এখন কোন বিখ্যাত মন্দির না থাকলেও, ডিগ্ হচ্ছে কৃষ্ণলীলা-কালের লাঠাবন। সুতরাং এখানে রাত্রিবাস করলে পুণ্য সঞ্চয় হয়।

কথাটা গতকাল সকালে মানসী বলেছে আমাকে। ঠিকই বলেছে। সে যে গত বছর বন-পরিক্রমা করেছে, ব্যাপারটা জানা আছে তার।

আজ পথে বের হবার পর থেকে বার বার আমার কেবল তার কথাই মনে পড়ছে—মানসীর কথা। সে আজও আমার কাছে দুর্বোধ্য রয়ে গেল। নইলে বৃন্দাবনে বসে অত করে বলার পরেও

লোকলজ্জার জন্য যে আমার সঙ্গে এলো না, সে কেমন করে হঠাৎ রাধাকুণ্ডে এসে সবার সামনে দেখা করল আমার সঙ্গে ?

শুধু তাই নয়, গুরুমহারাজের অনুমতি নিয়ে মানসী পরশু রাতে আমাকে রেখে দিল রাধাকুণ্ডে।

পরশু সেখানে ছিল কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীর স্নান। হাজার হাজার স্নানার্থী সমবেত হয়েছিলেন রাধাকুণ্ডের তীরে। ঘাটের এক কোণে একখানি সতরঞ্চি পেতে মানসী আগের থেকেই জায়গা রেখেছিল। স্নানের পরে সেখানেই কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়েছি আমরা। গতকাল সকালে টাঙ্গায় করে সে আমাকে নিয়ে গেল গুলালকুণ্ড ও গাঁঠুলির মন্দিরে। বিকেলে আবার আমরা ফিরে এলাম রাধাকুণ্ডে। আমাকে ডিগের বাসে তুলে দিয়ে, তবে সে বৃন্দাবন রওনা হয়েছে।*

কিন্তু মানসীর কথা এখন থাক্, কালকের কথাও আর নয়, এবারে আজকের কথায় আসা যাক্। আজ সকালে আমরা ডিগ্ থেকে কাম্যবনের পথে রওনা হয়েছি। কীর্তন করতে করতে পথ চলেছি। সিঁথির ব্রহ্মচারী কেষ্টপ্রভু সংকীর্তন শোভাযাত্রা 'লীড্' করছেন। অর্থাৎ তিনি প্রথমে গাইছেন, আমরা পরে গাইছি। কেষ্টপ্রভু এখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে গেয়ে চলেছেন—

'প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান।
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবন॥...'

আনুমানিক ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জনৈক সঙ্গীকে নিয়ে হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ দ্বাদশবন-পরিক্রমা করেছিলেন। এই পরিক্রমা-কালেই তিনি লুপ্ত মধু-বৃন্দাবনকে আবিষ্কার করেন। আর তাঁর সেই পরিক্রমা থেকেই শুরু হয়েছে ব্রজ-পরিক্রমা।

কেষ্টপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সেই পরিক্রমার কাহিনী কীর্তন করছেন। মহাপ্রভু গাঁঠুলিতে গোপালদেবকে দর্শন করে কাম্যবনে

---

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য।

গিয়েছিলেন। আমিও মানসীর সঙ্গে গতকাল গাঁঠুলি গিয়েছিলাম, আজ চলেছি কাম্যবন। আজ মানসী নেই আমার সঙ্গে।

আমরা মথুরা থেকে ভরতপুর জেলায় এসেছি। অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ থেকে রাজস্থানে। কিন্তু পথের প্রকৃতি অপরিবর্তিত। কে বলবে রাজস্থান মরু-অঞ্চল ? বরং এ অঞ্চলকে মথুরার চেয়ে উর্বরতর মনে হচ্ছে। পথের দুদিকেই সবুজ-ক্ষেত। ক্ষেতের মাঝে জল-ভরা খাল। যেখানে খাল নেই সেখানে গভীর নলকূপ, চাষীরা জল তুলে ক্ষেতে দিচ্ছে। পথের পাশে নিমগাছের সারি। কাজেই প্রখর রোদ হলেও খুব একটা গরম লাগছে না। তবে মাঝে মাঝে শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ছি। তাই নিমের ছায়ায় জিরিয়ে নিতে হচ্ছে।

কেষ্টপ্রভু গান থামিয়েছেন। বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। বটেই তো, পাশ-করা গলা হলেও একটা মানুষ একনাগাড়ে কতক্ষণ চেঁচাতে পারে ?

তাই বলে কীর্তন বন্ধ হয় নি। বন্ধ হবার উপায় নেই যে। কীর্তন ছাড়া পরিক্রমা পুণ্যহীন। সুতরাং কেষ্টপ্রভু কীর্তন থামাতেই মথুরা মহারাজ কীর্তন ধরেছেন। তিনি চণ্ডীদাসের গান গাইছেন—

‘বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হও তুমি॥···
এ কুলে ও কুলে দু’কুলে গোকুলে
আর কেবা মোর আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
কান্দিব কাহার কাছে॥
বুঝিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়···’

আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। সবার আগে পথ-জোড়া ফেস্টুন-হাতে দু'জন ব্রহ্মচারী। ফেস্টুনে হিন্দীতে আমাদের আশ্রমের নাম লেখা, যাতে পথচারীদের বুঝতে কোন অসুবিধে না হয় যে, কারা এই বনযাত্রা পরিচালনা করছেন।

ফেস্টুনের পরে চারজন সেবক একটি সুসজ্জিত দোলনা বহন করে নিয়ে চলেছেন। দোলনায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দণ্ডায়মান প্রতিমূর্তি—পরিক্রমার বিজয়-বিগ্রহ। পরিক্রমার সময় আমরা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবা-পূজা করছি। কারণ, গৌরাঙ্গদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

দোলনার পরে শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে রয়েছেন গুরুমহারাজ ও তাঁর তিনজন সন্ন্যাসী গুরুভাই। তাঁদের পেছনে সীনিয়ারিটি হিসেবে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, সেবক ও শিষ্যগণ কীর্তনরত। তাঁরা সবাই তিলকসেবা করে গলায় মালা পরে নিয়েছেন। কীর্তনীয়াদের পরে মহিলারা। সবার শেষে আমরা—শিষ্য ও অশিষ্য, ভক্ত ও ভক্তি-হীনের দল।

মহিলাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতেই পতাকা। বাঁশের কঞ্চির সঙ্গে এক টুকরো ত্রিকোণাকৃতি রঙীন কাপড়। তাতে স্বস্তিকার ছাপ। অধিকাংশই বৃদ্ধা এবং বিধবা। কয়েকজন বয়স্কা সধবাও রয়েছেন। সেনবাবুর স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের বৌদি তাঁদেরই অন্যতমা।

জানকী এখন আমাদের দলের একমাত্র অবিবাহিতা এবং যুবতী। আর তাই বোধহয় সে পতাকার পরিবর্তে হাতে নিয়েছে একটি শাঁখ। শাঁখ বাজাতে বাজাতে পথ চলেছে জানকী।

জানকীর দিকে নজর পড়তেই সেই ভাবনাটা আবার দেখা দেয় আমার মনে। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে জানকী তার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছে। কিন্তু মধু-বৃন্দাবনের বনপথে পদ-পরিক্রমা পূর্ণ করে সে কি তার ভাবী জীবন-পথের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারবে?

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা বিমলাকুণ্ডের তীরে পৌঁছলাম। কাম্যা শহরের উপকণ্ঠে সুবিশাল সরোবর। চারিদিক বাঁধানো, দু'দিকে পাথরের ঘাট। কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিমলাদেবীর মন্দির। মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কীর্তন করা হল। বৈষ্ণব কবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত ভক্তিরত্নাকর থেকে কেষ্টপ্রভু গাইলেন—

'বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥'···
'এ বিমল কুণ্ড স্নানে সর্বপাপক্ষয়।
হেথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়॥'···

কীর্তনের পরে প্রণাম অর্থাৎ দণ্ডবতের পালা শুরু হল। প্রথমে বিমলাদেবীকে, তারপরে কুণ্ড, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের। যাঁদের সঙ্গে পথ চলছি, তাঁদেরও বার বার প্রণাম করতে হচ্ছে—বিচিত্র নিয়ম!

প্রণামের পালা চুকলে গুরুমহারাজ নির্দেশ দিলেন, "চট করে স্নান করে নাও। স্নানের পরে দর্শন ও কুণ্ড-প্রদক্ষিণ করে ধর্মশালায় যাবে, প্রসাদ পাবে। প্রসাদের পরে শুরু হবে কাম্যবন দর্শন।" একবার হাসেন তিনি। তারপরে আবার বলেন, "একটা কথা, স্নান করবার সময় জিনিসপত্র সাবধান। এখানে বড়ই বানরের উৎপাত!"

সত্যই তাই। কুণ্ডের চারিদিকের গাছে, মন্দিরের ছাদে, দেওয়ালে, ঘাটে—সর্বত্রই বানর দেখতে পাচ্ছি! তারা সপরিবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্যও বেশ বোঝা যাচ্ছে—সুযোগ পেলেই যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে গাছে উঠবে। এবং খাবার না পেলে কিছুতেই ফেরত দেবে না।

সুতরাং সজাগ হতে হয়। সাবধানে ঘাটের দিকে এগোই। এটি

কুণ্ডের পশ্চিম তীর। ঘাটের পাশে রাধাগোপাল ও জগন্নাথদেবের মন্দির।

সহযাত্রী চক্রবর্তী, বোসবাবু, সেনবাবু, বৌদি ও জানকী আগেই ঘাটে এসে গেছে। আমাকে দেখেই চক্রবর্তী বলে ওঠে, "এই যে প্রভু এসে গিয়েছো, একটা কাজ করো দেখি!"

আমি প্রভু নই, একজন নগণ্য সরকারী কর্মচারী, সুতরাং জনসাধারণের ভৃত্য। কিন্তু ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমায় এসে 'প্রভু' পদে উন্নীত হয়েছি। ভক্ত-বৈষ্ণবরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের প্রভু এবং আমি ভক্তিহীন-অবৈষ্ণব হওয়া সত্ত্বেও এঁরা আমাকে 'প্রভু' বলে অভিহিত করছেন।

কিন্তু সে ভাবনা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করি, "কি কাজ করতে হবে ভাই?"

"তুমি এখানে একটু বসো, আমাদের মালপত্রগুলো পাহারা দাও, আমরা স্নানটা সেরে নিই।"

জামা-কাপড়, ঘড়ি পেন, চশমা ব্যাগ প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসপত্র ঘাটের ওপরে স্তূপীকৃত। বানর-বাহিনী নিকটেই আছে, তারা লব্ধদৃষ্টিতে পুণ্যার্থীদের ঐশ্বর্য দর্শন করছে। সুতরাং একজন শক্তিশালী পাহারাদারের প্রয়োজন। গুরুমহারাজের ভাবী-শিষ্য ভক্তিমান গোবিন্দ চক্রবর্তী আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করতে চাইছে।

আপত্তি করার কোন কারণ নেই। অতএব মাথা নেড়ে বলি, "বেশ তো, আমি তোমাদের মালপত্র পাহারা দিচ্ছি, তোমরা স্নান করে নাও। তোমাদের হলে আমি জলে নামব।"

"না।" সহসা জানকী প্রতিবাদ করে ওঠে।

আমি তার মুখের দিকে তাকাই। সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। চক্রবর্তীকে বলে, "আপনারা স্নান করে নিন, আমি মালপত্র দেখছি।"

বি. এ. পাশ এই আধুনিকাটি কেন এ বয়সে বন-পরিক্রমায় এলো, এটা আমার কাছে একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। মাত্র

ক'দিন আগে এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি—শুনেছি ব্যর্থ প্রেমের এক করুণ কাহিনী।

হয়তো বা আমার স্বাভাবিক সহানুভূতির জন্য জানকী আমার প্রতি একটু বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকবে। তাই কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীর রাতে সে রাধাকুণ্ডে স্নানের আবদার করেছিল। আমি প্রথমে রাজি হই নি। কিন্তু পরে মানসীর আকস্মিক আগমনে যখন রাধাকুণ্ডে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হলাম, তখন জানকী আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছে। এবং সে আজ দু'দিন হল আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে আছে। বলাবাহুল্য এখনও তার রাগ পড়ে নি। আমিও তাই কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে বলে উঠি, "তুমি পারবে না।"

"কি পারব না?" জানকী কথা বলে।

হেসে উত্তর দিই, "বানরদের সামলাতে। দেখছো না কি ভয়ানক চেহারা আর কেমন বেপরোয়া"...

জানকী আড়চোখে বানর-বাহিনীর দিকে তাকায়। তারপরে নিঃশব্দে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে যায়। বৌদি মুচকি হেসে তাকে অনুসরণ করেন।

স্নানের পরে শুরু হল কুণ্ড-প্রদক্ষিণ। সংঘবদ্ধভাবে নয়, বিচ্ছিন্নভাবে। স্নান শেষে ছোট-ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আমরা বিমলাকুণ্ড প্রদক্ষিণ করলাম। পশ্চিমতীরের রাধাগোপাল ও জগন্নাথদেবকে দর্শন করে এলাম উত্তরতীরে। দর্শন করলাম শ্রীবলরাম ও শ্রীহনুমানজীকে। তারপরে এলাম দক্ষিণতীরে। প্রণাম করলাম মদনমোহন মন্দিরে।

কুণ্ড দর্শন শেষ হল, কিন্তু যাত্রা শুরু হল না। প্রদক্ষিণ-পদ্ধতির বিপক্ষে প্রবল প্রতিবাদ পেশ হল গুরুমহারাজের সমীপে। বিদ্রোহী বৈষ্ণবদের প্রধান অভিযোগ—কুণ্ড-প্রদক্ষিণকালে কীর্তন করা হয় নি। অতএব গুরুমহারাজ রায়দান করলেন—সংকীর্তন সহযোগে পুনরায় প্রদক্ষিণ।

কপালে বাড়তি পুণ্য থাকলে খণ্ডাবে কে? ডবল-প্রদক্ষিণ করে ডবল-পুণ্য সঞ্চয় করা গেল! বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সহযাত্রীরা সবিশেষ উল্লসিত। আর তাঁদের মধ্যে জানকীর মা অন্যতমা।

অথচ জানকী কিন্তু তাঁর বহু অনুরোধেও দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করল না। হেসে বলল, "আমার পুণ্যের দরকার নেই মা!"

মা রেগে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে এসেছিস কেন?"

"নিজের পাপের কথা ভুলে থাকতে।"

মা আর কিছু বলতে পারলেন না।

দ্বিতীয়বার বিমলাকুণ্ডে প্রদক্ষিণের পরে সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল কামাঁ শহরের দিকে। সেখানকার একটি ধর্মশালাতেই আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা হয়েছে।

বাঁধানো রাজপথ। কাজেই কাঁটা নেই। কিন্তু পাথুরে পথ রোদে তেতে উঠেছে। পায়ের তলায় খুবই গরম লাগছে। আমার কাঁধের ঝোলাতে একজোড়া চপ্পল রয়েছে। কিন্তু পরতে পারছি না। কেউ যখন জুতো পায়ে দেন নি, তখন আমি একা দিই কেমন করে?

কষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কষ্ট তো কেবল আমার নয়, আমার শতাধিক সহযাত্রীর প্রত্যেকের। তাঁদের অধিকাংশই যে আমার চেয়ে বয়সে বড়। তাঁরা যদি পারেন, আমি কেন পারব না? তাছাড়া কিসের আকর্ষণে তাঁরা এই দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট সইছেন, তা যে জানতে হবে আমাকে। যাঁদের কথা জানতে এসেছি, তাঁদের মতো না হতে পারলে তো তাঁরা ধরা দেবেন না আমার কাছে।

পথের দু'ধারে তেমনি সবুজ ক্ষেত। শুধু সবুজ নয়, সুজলাও বটে। এত জল এলো কোত্থেকে? তাহলে এদিকে বোধহয় বৃষ্টি হয়ে গেছে?

"না।" মথুরা মহারাজ বলেন, "সবই সেচের জল। বৃষ্টি কম হয় বলেই এ ব্যবস্থা। রাজস্থানের চাষীরা এখন আর বৃষ্টির মুখাপেক্ষী নয়।"

মথুরা মহারাজ আমাদের আশ্রমের গুরুমহারাজের গুরুভাই। প্রবীণ ও পণ্ডিত সন্ন্যাসী।

আরও একটি সংবাদ দেন মথুরা মহারাজ। বলেন, "আমরা এখন যেখানে রয়েছি, এটি সেকালে রাজা যশোদনের রাজ্য ছিল।"

"যশোদন কে মহারাজ?" পাশ থেকে জানকী প্রশ্ন করে।

মথুরা মহারাজ বলেন, "মা-যশোদার বাবা।" একবার থেমে তিনি আবার বলেন, "ঐ যে দূরে পাহাড়ের মতো দেখছিস, ওটা হচ্ছে একটি মাটির গড়, ওখানেই চরণ-পাহাড়ী। আমরা কাল ওখানে যাব।"

"ওখানে কি আছে মহারাজ?" এবারে বৌদির প্রশ্ন।

"শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন।" মথুরা মহারাজ উত্তর দেন।

চক্রবর্তী সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছোঁয়ায়।

কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি। কামাঁ শহরের বাড়ি-ঘর দেখা যাচ্ছে এবারে। ছোট শহর কামাঁ। ভরতপুর জেলার একটি মহকুমা সদর। ২৭° ৩৯´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৭° ১৬´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর। এখান থেকে ভরতপুর ৩৫ মাইল।

এ জেলার প্রাচীনতম শহর কামাঁ। প্রাচীন নাম ব্রাহ্মণপুর। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের আটাত্তর পর্যায়ের বংশধর জনৈক যাদব-রাজপুত প্রথম এ জেলায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এ অঞ্চল ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লী) তানওয়ার-রাজপুত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। পাঠান এবং মোগল আমলে কামাঁ বিদ্রোহী মেওয়াত রাজ্যের অধীনে ছিল। কখনও কখনও অবশ্য জয়পুরের মহারাজার শাসনাধীন হয়েছে। অবশেষে কামাঁ ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।*

---

*Assessment Report (1898—99) by M. F. O'Dwyer, I.C.S.

॥ দুই ॥

প্রসাদ-পর্ব শেষ হতে দু'টো বেজে গেল। খাওয়াটা ভালই হয়েছে। পদের অবশ্য কোন বালাই ছিল না—স্রেফ আলু-কপির খিচুরি। খিদের পেটে গরম-গরম খেতে কিন্তু খুবই ভাল লেগেছে। মনে হচ্ছে, একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছি।

বোসবাবু ও সেনবাবু গামছা পেতে ধর্মশালার বারান্দায় শুয়ে পড়লেন। তিনটের সময় দর্শন শুরু হবে। ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নেওয়া যাক্।

কিন্তু শুতে গিয়েও শুতে পারলাম না। কোথা থেকে চক্রবর্তী এসে হাজির হয়। আর সে এসেই আদেশ করে, "চলো হে, একটু ঘুরে আসা যাক্।"

"এখন আবার কোথায় ঘুরতে যাবে? একটু বাদেই তো পরিক্রমা শুরু হচ্ছে।" আমি আপত্তি করতে চাই।

"তাই তো, এখুনি যাওয়া দরকার। কাজটা সেরে তিনটের আগে ফিরে আসতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে?" প্রশ্ন করি।

চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "বাজারে।"

"বাজারে!"

"হ্যাঁ ভাই, গুরুমহারাজের আদেশ!"

অতএব উঠে দাঁড়াই। বোসবাবু ও সেনবাবুর দিকে একটা লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে চক্রবর্তীর সঙ্গে ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে আসি।

পথে নেমে চক্রবর্তী বলে, "কাল তো জানো একাদশী?"

"হ্যাঁ ভাই, শুনেছি। কাল নাকি উপোস করতে হবে?"

আমার কথা শুনে হো-হো করে হাসতে থাকে চক্রবর্তী। হাসি থামলে বলে, "উপোস করবে কেন?"

"তাহলে ?"

"চাল এবং আটা ছাড়া সবই খেতে পারবে তোমরা।"

"তার মানে আমরা ভরপেট খেতে পাবো কাল ?"

"হ্যাঁ, তোমরা। কিন্তু আমি বাদে। আমাকে কাল সত্যই উপোস করতে হবে।"

"কেন ?"

"কাল যে আমার দীক্ষা।"

"তাই নাকি !"

"হ্যাঁ, ভাই !"

"কনগ্র্যাচিউলেশন। কিন্তু এতবড় সুসংবাদটা তুমি এতক্ষণ চেপে রেখেছো ?" আমি তার সঙ্গে করমর্দন করি।

"আমিও কি জানতাম রে ভাই, আমিও জানতাম না। কেমন করে জানব বল ? মাত্র বছর তিনেক হল কলকাতার আশ্রমে যাতায়াত করছি। তার ওপর সংসারী মানুষ, দালালীর ব্যবসা করি। এত সহজে যে গুরুমহারাজ আমাকে কৃপা করবেন, ধারণাই করতে পারি নি।"

"আজ বুঝি তিনি বললেন সেকথা ?"

"হ্যাঁ ভাই ! প্রসাদের পরে হঠাৎ গুরুদেব তলব করলেন তাঁর ঘরে, তারপরেই বললেন কথাটা।" চক্রবর্তীর চোখে-মুখে আনন্দ উপচে পড়ছে।

ধর্মশালা থেকে খানিকটা এগিয়েই বাজার—মফঃস্বল শহরের বাজার যেমন হয় আর কি। সংকীর্ণ পথের দু'ধারে সারি সারি দোকান। এটা বাজারের সময় নয়, তবু দেখছি বাজার বেশ ব্যস্ত।

খোঁজাখুঁজির পরে পথের ধারে একটা সেলুন পাওয়া গেল। চক্রবর্তীকে নরসুন্দরের হাতে সমর্পণ করে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। ছোট ঘর, ভেতরে গরম লাগছিল। চড়া রোদ উঠেছে কিনা। চক্রবর্তী কাল দীক্ষা নেবে, সুতরাং সে মস্তক-মুণ্ডন করবার

জন্য গরমে সিদ্ধ হোক্। আমার কি দরকার ভেতরে বসে কষ্ট পাবার? আমি তো আর ভক্ত-বৈষ্ণব নই।

কয়েক পা এগিয়েই একটা পানের দোকান। খিদের পেটে খাওয়াটা···। ছিঃ ছিঃ, এ কি করছি আমি? আজ বারো দিন ধরে শতাধিক ভক্ত-বৈষ্ণবের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা করছি, আর এখনও বলছি কিনা খাওয়া! না, না, খাওয়া নয়, প্রসাদ। ভক্ত-বৈষ্ণবরা খাওয়াকে বলেন প্রসাদ পাওয়া। তাঁরা ভাতকে বলেন অন্ন, পোলাওকে বলেন পুষ্পান্ন আর ঝোলকে বলেন রসা।

অতএব খাওয়া নয়, প্রসাদ। দুপুরের প্রসাদটা পরিমাণে একটু বেশি হয়ে গেছে। চক্রবর্তীর দীক্ষাকালীন মস্তক-মুণ্ডনের জন্য বিশ্রাম করাও হয়ে উঠল না। একটা পান পেলে মন্দ হত না।

তাই পানের দোকানে আসি। দোকানীকে একখিলি পান দিতে বলি। দোকানী পান সাজতে শুরু করে।

সহসা একটা আর্ত চীৎকার কানে আসে। বাংলায় চীৎকার। মনে হচ্ছে চক্রবর্তীর গলা! তাড়াতাড়ি পানটা নিয়ে দাম মিটিয়ে ছুটে আসি সেলুনে।

এ যে দেখছি একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! চক্রবর্তীর রক্ত ঝরছে!

না, মারামারি নয়। কারণ চক্রবর্তী একাই চেঁচাচ্ছে। নরসুন্দর নির্বাক। সে ক্ষুর-হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চক্রবর্তীর মাথার একটা দিক কেবল কামানো হয়েছে। আরেকটা দিকও কামানো দরকার। কিন্তু নরসুন্দর সাহস করে চক্রবর্তীর কাছে এগোতে পারছে না।

আমাকে দেখে চক্রবর্তী একেবারে ফেটে পড়ে। বলে ওঠে, "বাঃ, বেড়ে জায়গায় ঢুকিয়ে কেটে পড়েছো!"

"কেন, কি হল?"

"কি হতে আর বাকি রইল? দীক্ষা নেব বলে মস্তক-মুণ্ডন করতে এলাম। আর এই উজবুকটা আমার কান কেটে দিলে!"

"কান কেটে দিল !"

"এই যে দেখছো না কি রকম রক্ত বেরোচ্ছে ?" চক্রবর্তী তার কানের কাটা জায়গাটা দেখিয়ে দেয়।

তাড়াতাড়ি কাছে আসি। সত্যই নরসুন্দর মস্তক-মুণ্ডন করতে গিয়ে চক্রবর্তীর কান কেটে ফেলেছে। কেটেছে সামান্য। কিন্তু সে স্বাস্থ্যবান মানুষ—বেশ রক্ত পড়ছে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর ! মাথা কামাবার সময় কানের ও জায়গাটা কাটল কেমন করে ? ছোটবেলায় দাদুর কাছে শোনা সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল—জনৈক শিকারী নাকি মাটির শেয়াল গুলি করতে গিয়ে গাছের ডাব মাটিতে ফেলেছিল।

নরসুন্দরকে জিজ্ঞেস করি, "তোমার কাছে ডেটল আছে ?"

"নহী জী !"

"ফিটকিরি ?"

"থা। লেকিন অভি খতম হো চুকা।"

"উজবুক। বুঝলে হে, একেবারে একটা আস্ত উজবুকের পাল্লায় পড়েছি। বেটা ক্ষুর ধরতে শেখে নি, সেলুন খুলে বসেছে !" আমি কিছু বলে ওঠার আগেই চক্রবর্তী হেঁকে ওঠে।

এ অবস্থায় আমার পক্ষে অযোগ্যতার জন্য নরসুন্দরকে তিরস্কার করা সম্ভব নয়। চক্রবর্তীর মাত্র অর্ধেক মস্তক মুণ্ডিত হয়েছে। অবশিষ্ট কেশমুক্ত না হয়ে সে কিছুতেই এ দোকানের বাইরে বেরুতে পারবে না ! উপরন্তু তিরস্কার করলে লোকটা আরও বেশি 'নার্ভাস' হয়ে পড়বে। তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। সে হয়তো বাকি আধখানি মাথা কামাতে গিয়ে চক্রবর্তীর অন্য কানটিও কেটে দেবে।

আমি তাই চক্রবর্তীকে ধমক লাগাই। বলি, "এতো চেঁচামেচি করছো কেন ? একটু সুস্থ হয়ে বসো, আমি পানের দোকান থেকে চুন নিয়ে আসছি। চুন লাগিয়ে দিলে তোমার কাটা কানের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।"

চুন লাগিয়ে দেবার পরে সত্যই চক্রবর্তীর রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। এবং আমার 'স্ট্রিক্ট সুপারভিশানে' নরসুন্দর একসময় চক্রবর্তীর মস্তক-মুণ্ডন সমাধা করল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চক্রবর্তীকে জিজ্ঞেস করি, "দাড়ি কাটবে না?"

"তুমি পাগল হয়েছো?" চক্রবর্তী আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে। বলে, "উজবুকটা মাথা কামাতে গিয়ে কান কেটে দিয়েছে। দাড়ি কামাতে বললে তো গলা কেটে দেবে হে!"

আশংকাটা অমূলক নয়। কিন্তু দাড়ি না কামিয়ে কি চক্রবর্তী দীক্ষা নিতে পারবে?

আমি কোন প্রশ্ন করার আগেই চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "আমার সঙ্গে 'সেফ্‌টি রেজর' রয়েছে। কাল সকালে নিজেই দাড়ি কামিয়ে ফেলব।"

সুতরাং শ্রান্ত ভক্তের সঙ্গে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসি। বাজারের ভেতর দিয়ে ফিরে চলি ধর্মশালায়। বলা বাহুল্য চক্রবর্তী এখনও নরসুন্দরের শ্রাদ্ধ করে চলেছে।

একটা চায়ের দোকান দেখে চক্রবর্তীকে বলি, "চা খাবে নাকি?"

"পেলে তো ভালই হয়। কাল থেকে তো আবার চা ছেড়ে দিতে হবে।"

"কেন?"

"বারে, কাল আমি দীক্ষা নিচ্ছি না?"

"তাতে কি হয়েছে?"

"না, তুমিও দেখছি একটা আস্ত উজবুক। ভক্ত-বৈষ্ণবের যে নেশা, করা নিষেধ, এ কথাটাও জান না?"

চা যে একটা নেশা এ কথাটা একেবারেই খেয়াল ছিল না। তাই নিঃশব্দে চায়ের দোকানের সামনে আসি। আমি কিছু বলার

আগেই চক্রবর্তী দোকানীকে বলে, "এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো ?"

ইস, বেচারীর পিপাসা পেয়ে গেছে! পাবেই তো, সোজা ঝক্কি গেছে ওর ওপর দিয়ে! মস্তক-মুণ্ডন করতে এসে প্রায় মস্তক বিক্রয় করে ফেলতে হয়েছিল আর কি!

দোকানী পরামর্শ দেয়, "আমার কাছে তো ঠাণ্ডা জল হবে না। আপনারা বরং পাশের ঘরে যান। সেখানে বরফ দেওয়া জল পাবেন, খেয়ে আসুন।"

তাকে চা বানাতে বলে আমরা পাশের ঘরে আসি। একটি অল্প-বয়সী ছেলে বসে আছে। চক্রবর্তী বলে, "আমরা পরদেশী আদমী ভাই! আমাদের দু'গ্লাশ বরফ দেওয়া জল খাওয়াবে ?"

ছেলেটি কি যেন একটু ভাবে। তারপরে আমাদের বসতে বলে ভেতরে চলে যায়। আমরা একটি টেবিলের সামনে দু'খানা চেয়ারে বসে পড়ি। এমনি আরও কয়েকখানা টেবিল রয়েছে ঘরটিতে। প্রত্যেকটি টেবিলের চারদিকে চেয়ার। চেহারাটি রেস্তোরাঁর মতো, কিন্তু এখন অন্য কোন খদ্দের নেই।

দু'টি কাচের গ্লাশে জল নিয়ে ফিরে আসে ছেলেটি। জলের ওপর বরফ ভাসছে। তৃষ্ণার্ত চক্রবর্তী সকৃতজ্ঞ চিত্তে ছেলেটির কাছ থেকে গ্লাশ হাতে নেয়। এক চুমুকে জলটুকু নিঃশেষ করে। তার খুবই পিপাসা পেয়েছিল।

ছেলেটির হাতে গ্লাশটি ফিরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় চক্রবর্তী। তাকে জিজ্ঞেস করে, "এটা বুঝি জলসত্র ?"

ছেলেটি হাসে। বলে, "না, জলসত্র হবে কেন ? এটা দোকান।"

"দোকান! কিসের দোকান ?"

"মদের।"

"মদের!"

"জী শেঠজী।"

"যে গ্লাশে আমাকে জল দিয়েছিলে, সেই গ্লাশে লোক মদ খায়?"

"জী মহারাজ!"

"তার মানে, তুমি আমাকে মদের গ্লাশে জল দিয়েছো?" চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে।

"জী!"

"হায় কৃষ্ণ! এ তুমি কি করলে প্রভু! কাল সকালে আমি দীক্ষা নেব, আর আজ কিনা মদের দোকানে মদের গ্লাশে মদের বরফ দেওয়া জল খেয়ে ফেললাম! এর আগে আমার মৃত্যু হল না কেন প্রভু?" চক্রবর্তী চোখ মোছে।

তাড়াতাড়ি জলটা শেষ করে উঠে দাঁড়াই। যথাসম্ভব গম্ভীর হবার চেষ্টা করতে থাকি।

"উজবুক, বুঝলে ঘোষ! একেবারে উজবুক। এখানকার প্রত্যেকটা লোক এক-একটা আস্ত উজবুক···" বলতে বলতে চক্রবর্তী বেরিয়ে যায় দোকান থেকে।

চক্রবর্তী বাংলায় বললেও দোকানের ছেলেটি অনুমান করতে পারে যে, কথাটা ভাল নয়। সে ক্ষেপে যায়। ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কেয়া বোলা?"

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "তোমাকে নয়, আমাকে বলেছে। ও এমনি মাঝে মাঝে আমাকে উজবুক বলে। মাথাটা একটু গরম কিনা!"

"সাচ্ বাৎ।" ছেলেটি মাথা নাড়ে।

আমি তাকে নমস্কার করে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে। দেখি চক্রবর্তী চায়ের দোকানে না ঢুকে ত্রস্ত পায়ে ধর্মশালার দিকে এগিয়ে চলেছে। ছুটে আসি কাছে। জিজ্ঞেস করি, "যাচ্ছো কোথায়? চা খাবে না?"

"না।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "মস্তক-মুণ্ডন করতে গিয়ে কান কেটে দিয়েছে, ঠাণ্ডাজল খেতে চাওয়ায় মদের জল খাইয়েছে, এখন চা-য়ের বদলে খানিকটা বিষ খাইয়ে দিক আর কি! না, না, আমি এখানে চা খাবো না। গোটা কাম্যবনটাই একটা উজবুকের জায়গা।"

"মুখ সামলে কথা বলো চক্রবর্তী।" আমি তাকে ধমক লাগাই। গম্ভীর স্বরে বলি, "কৃষ্ণলীলাস্থল এই রমণীয় কাম্যবন শ্রীভগবানের পরম-পবিত্র ক্ষেত্র। আর তুমি কিনা বলছো উজবুকের জায়গা!"

কাজ হয়। চক্রবর্তী চলা বন্ধ করে। আমার দিকে তাকায়। করুণ কণ্ঠে বলে, "অন্যায় হয়ে গেছে ভাই! আমি না ভেবেই বলে ফেলেছি কথাটা। কৃষ্ণ-ভগবান নিশ্চয়ই আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করবেন।" সে হাতজোড় করে। তার কণ্ঠস্বরে ভক্তির মূর্চ্ছনা।

"না।" আমি প্রতিবাদ করি। বলি, "দোকানীকে চায়ের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সে চা বানিয়ে বসে আছে আমাদের জন্য। এ অবস্থায় চা না খেয়ে ধর্মশালায় ফিরে গেলে কৃষ্ণ-ভগবান কিছুতেই ক্ষমা করবেন না তোমাকে।"

"বেশ, চলো তাহলে, চা খেয়েই আসা যাক্।"

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে চক্রবর্তী বলে, "এক টিপ নস্যি দাও তো!"

বিস্মিত হই। তবু পকেট থেকে নস্যির কৌটোটা বের করে তার হাতে দিই। বলি "তুমি তো নস্যি নাও না!"

"নিই না, তবে কাল থেকে নিতে হবে তো। তাই অভ্যেস করছি।" চক্রবর্তী এক টিপ নস্যি হাতে নিয়ে কৌটোটা আমাকে ফিরিয়ে দেয়।

"কাল থেকে নস্যি নেবে কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"দীক্ষা নেবার পরে যে আর সিগারেট খেতে পারবো না।"

একবার থামে সে। তারপরে বলে, "তবে বাবা, গুরুদেবকে অল্‌রেডি বলে দিয়েছি, চা কিন্তু আমি ছাড়তে পারবো না।"

"তিনি কি বললেন ?"

"বললেন, ছাড়তে হবে না। তবে দীক্ষার পরে তিন দিন অন্তত চা খাওয়া চলবে না। কি বিপদ বলো তো ?"

আমি মাথা নাড়ি। মনে মনে ভাবি—কে তোমাকে দীক্ষা নেবার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে ? দীক্ষা না নিলে তো আর এ বিপদে পড়তে না।

ধর্মশালায় ফিরে আসতেই নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সহযাত্রীদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। কিন্তু এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া বৃথা। সত্যই চক্রবর্তীর চেহারাটা হাস্যকর হয়েছে। একে তো বেঁটে ও মোটা মানুষ এবং গায়ের রঙটি ঘন-কৃষ্ণবর্ণ। তার ওপর মুণ্ডিত-মস্তকে সুদীর্ঘ ও স্থূল একটি টিকি—ওঁরা বলছেন শিখা। সর্বোপরি মুখময় কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

তাহলেও সহযাত্রীদের সঙ্গে গলা মেলাতে পারি না আমি, পারেন না বোসবাবু ও সেনবাবুও। আমরা তার আপনজন। তাই বলে বৌদি এবং জানকী কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। জানকী বলে, "ও চক্রবর্তীদা! কানে আবার অতগুলো চুন লাগিয়েছেন কেন ?"

"আর ব'লো না ভাই, ঘোষ আমাকে বেড়ে এক নাপিতের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বেটা মস্তক-মুণ্ডন করতে গিয়ে কান কেটে দিয়েছে।"

আবার হাসির ফোয়ারা ছোটে। হাসি থামলে বৌদি বলেন, "সর্বনাশ, কান কেটে দিয়েছে! তাহলে তো আপনার অঙ্গহানি হয়ে গেছে। আপনি কাল দীক্ষা নেবেন কেমন করে ?"

"না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখছি!" সেনবাবু বৌদিকে ধমক লাগান, "আজে-বাজে কথা বলছো কেন ? কে আবার গিয়ে গুরুমহারাজের কানে লাগিয়ে দেবে, মহাবিপদ হবে তাহলে।"

কথাটা বোধহয় খেয়াল ছিল না বৌদির। তিনি একটু লজ্জা পান।

সেনবাবু কাঁধ থেকে গামছাখানি হাতে নিয়ে চক্রবর্তীকে বলেন, "এদিকে আসুন তো! এই গামছাটা আপনার মাথায় বেঁধে দিচ্ছি, চুন-লাগানো কানটা কারও নজরে পড়বে না। রাতে ধর্মশালায় ফিরে গামছা খুলে চুনটা ফেলে দেবেন। ততক্ষণে আপনার কাটা কানের রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে।"

অনুগত কনিষ্ঠের মতো চক্রবর্তী সেনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ায়।

বিকেল তিনটে নাগাদ শুরু হল পরিক্রমা। সেই একইভাবে সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। সবার আগে পথজোড়া ফেস্টুন-হাতে দু'জন সেবক। তারপরে গুরুমহারাজ, অন্যান্য সন্ন্যাসী ও সিনিয়াব ব্রহ্মচারিগণ। তাঁদের পেছনে খোল-কাঁধে কিংবা করতাল-হাতে কীর্তনীয়ারা। তারপরে পতাকা-হাতে পুণ্যার্থীবৃন্দ। শেষের সারিতে আমি। বলা বাহুল্য, চক্রবর্তী চলে গেছে কীর্তনীয়াদের দলে।

আমরা কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি কাম্যবনের পথে। কেষ্টপ্রভু কীর্তনের ভেতর দিয়ে কাম্যবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। তিনি ভক্তিরত্নাকর থেকে গাইছেন—

'সর্বকামফলপ্রদ কাম্যবন হয়।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখক্ষয়॥
এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর।
করিবে দর্শন স্নানকুণ্ড বহুতর॥···
দেখ মহাতেজোময় শিব কামেশ্বর।
গরুড়-আসন স্থান অতি মনোহর॥'

আমি কীর্তন করছি না কিন্তু মনে মনে আমিও কাম্যবনের কথাই ভেবে চলেছি। ভাবছি—

মহাভারতের বনপর্বে কাম্যবনের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে—বনবাসকালে পাণ্ডবগণ কিছুকাল এই বনে এসে বাস করেছিলেন। তাঁরা লোমশমুনির পরামর্শে এখানে এসেছিলেন। ঘটোৎকচ তাঁদের নিয়ে আসেন। কিছুকাল বেশ সুখেই ছিলেন তাঁরা। তারপরে হঠাৎ একদিন অর্জুন তপস্যা করতে চলে গেলেন। যুধিষ্ঠির বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। তিনি তখন সবাইকে নিয়ে চলে গেলেন প্রভাসতীর্থে। দেখা হল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দান করলেন। তাঁর অশান্ত চিত্ত শান্ত হল। সপরিবাবে যুধিষ্ঠির আবার ফিরে এলেন এখানে—এই কাম্যবনে।

কিছুদিন বাদে কৃষ্ণ নিজেই এলেন তাঁর এই বাল্যলীলাস্থলে—এলেন পাণ্ডবদের কাছে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—আপনি ধার্মিক, কখনই ধর্মপথ পরিত্যাগ করবেন না। ধর্মপথে স্থিব ও অবিচলিত থাকলে আপনি অচিরেই বাজ্যলাভ করবেন।

বলা বাহুল্য, যুধিষ্ঠির সে উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কবেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের সেই ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হয়েছিল। যে পুণ্যক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমরা এখন সেই রম্য-কাম্যবনের পথ-পরিক্রমা করছি।

কামেশ্বর শিবমন্দিরের সামনে শোভাযাত্রা নিশ্চল হল। পায়ে-চলা পথের বাঁদিকে একটু উঁচুতে মন্দির—ছোট শিবমন্দির। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা মন্দির-চত্বরে উঠে এলাম। মন্দিরের দেওয়ালে একখানি প্রকাণ্ড আয়না রয়েছে। অনেকদিন নিজের মুখ দেখি না। রোদে-ধূলায় দাড়ি-গোঁফে না জানি কি ভীষণ চেহারা হয়েছে। কাজেই আয়নার সামনে এগোতে সাহস পাই না।

তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে গর্ভ-মন্দিরে উঠে আসি। লাল পাথরের লিঙ্গমূর্তি। সামনে ছোট নন্দীমূর্তি। পাশে শ্বেতপাথরের পার্বতী ও গণপতি। পেছনের দেওয়ালের সঙ্গে একটি কাঠের সিংহাসনেও কয়েকটি ছোট ছোট শিবলিঙ্গ রয়েছে।

প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে আসি বাইরে। কীর্তন আরম্ভ হয়, শোভাযাত্রা চলতে শুরু করে।

মথুরা মহারাজ ইসারা করে খানিকটা দূরে একটি জায়গা দেখিয়ে বলেন, "ওখানে একটা কুয়ো আছে। সেই কুয়োর ধরেই বকরূপী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন। দেরি হয়ে যাবে বলে, আমরা এখন আর ওখানে যাবো না।"

"কিন্তু ধর্মরাজ তো মায়াবলে এক দিব্য সরোবর সৃষ্টির করে, তারই তীরে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করেছিলেন ?"

আমার প্রশ্নে মথুরা মহারাজ একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলেন, "যদি বলি, পরবর্তীকালে পুণ্যার্থীরা সেখানেই এই কূপ খনন করেছেন ?"

"তাহলে জায়গাটার স্থানমাহাত্ম্য মেনে নেওয়া উচিত হবে।" তাড়াতাড়ি সন্ধি করি। খুশি হন মথুরা মহারাজ।

জানকী নিঃশব্দে তাঁর পাশে পাশে পথ চলছিল। এবারে হঠাৎ কথা বলে সে। আমার সঙ্গে নয়, আমার সঙ্গে সে এখনও প্রায় কথা বন্ধ করে আছে। মথুরা মহারাজকে বলে সে, "দর্শন না হয় না-ই করলাম, গল্পটা শুনতে তো দোষ নেই কোন। বলুন না মহারাজ !"

একটু ভেবে নিয়ে মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন—

"একদিন বনবাসী দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের বড়ই পিপাসা পেল। যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন—দেখো তো, একটু জল যোগাড় করতে পারো কিনা ? বড্ড পিপাসা পেয়েছে।

"এদিকে সেদিনই যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করবার জন্য ধর্মরাজ কাছা-কাছি অবস্থান করছিলেন। সুযোগ বুঝে তিনি মায়াবলে এক দিব্য সরোবর সৃষ্টি করে বকপাখির রূপ নিয়ে তীরে বসে রইলেন।

"একটু বাদেই ভীম উপস্থিত হলেন সেখানে। জল দেখে খুশি হলেন। তাড়াতাড়ি জলে নামতে গেলেন। বকরূপী ধর্ম তাঁকে বাধা

দিলে বললেন—আমি তোমাকে চারটি প্রশ্ন করবো। তার উত্তর দিয়ে তবে তুমি জলস্পর্শ করো, নইলে তোমার মৃত্যু হবে।

"বেপরোয়া ভীম বললেন—দাঁড়াও, দাঁড়াও! ভীষণ পিপাসা পেয়েছে। আগে তো জল খেয়ে নিই, তারপর তোমার প্রশ্ন-ট্রশ্ন ভেবে দেখা যাবে।

"তিনি জলস্পর্শ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

"ভীমের দেরি দেখে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। তিনি অর্জুনকে ডেকে বললেন—ভীম বোধহয় জল আনতে গিয়ে কারও সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে বসেছে। শিগ্‌গীর গিয়ে ধরে আনো তাকে। আর সেই সঙ্গে জল নিয়ে এসো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

"যথাসময়ে ধনঞ্জয় সেই সরোবরের তীরে এলেন। বকরূপী ধর্ম তাঁকে একই কথা বললেন, তিনিও শুনলেন না তাঁর কথা। দম্ভভরে জলে নামলেন। দেখলেন বৃকোদর মৃত অবস্থায় জলে পড়ে আছে। ক্ষোভে ও দুঃখে অর্জুন ভাবলেন, আর এ জীবন রেখে কি লাভ? তিনি জল স্পর্শ করলেন। তাঁরও একই পরিণাম হল।

"তারপরে যুধিষ্ঠির একে একে নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে জল আনতে পাঠালেন। মায়াবারি স্পর্শ করে তাঁরা সবাই প্রাণত্যাগ করলেন।

"অবশেষে যুধিষ্ঠির নিজে এলেন সরোবরের তীরে। মৃত ভাইদের ও দ্রৌপদীকে দেখতে পেলেন। ভাবলেন, এ ব্যর্থ জীবন রেখে আর কি হবে? শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে তিনিও সরোবরের জলে আত্মবিসর্জন করতে উদ্যত হলেন। বকরূপী ধর্মরাজ বাধা দিলেন তাঁকে। বললেন —তোমার ভাইয়েরা অহঙ্কারী। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জলস্পর্শ করতে গিয়েই তাঁদের এই দশা হয়েছে। কিন্তু তুমি তো ধর্মপুত্র, তোমার তো অমন হওয়া সাজে না। তার চেয়ে আমি তোমাকে চারটি প্রশ্ন করছি, তুমি তার উত্তর দাও। এতে তোমার মঙ্গলই হবে।

"ধর্মরাজের কথায় যুধিষ্ঠির খানিকটা শান্ত হলেন। সুযোগ বুঝে ধর্মরাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন—

'কিবা বার্তা, কি আশ্চর্য, পথ বলি কারে।
কোন্‌জন সুখী হয় এই চরাচরে॥'

"সঙ্গে সঙ্গে যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

'ঘোটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা॥···
প্রতিদিন জীবজন্তু যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য আছে মহাশয়॥···
বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা কথা কয়॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন॥···
অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি পরাহ্ণ কালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর।
বারিচর শুন চার প্রশ্নের উত্তর॥'

"যুধিষ্ঠিরের উত্তর শুনে খুশি হলেন ধর্মরাজ। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁকে বললেন—তুমি একমন হয়ে একটি বর প্রার্থনা করো, এবং দ্রৌপদী ও তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে কোন এক-জনের প্রাণভিক্ষা করো, আমি এখুনি তার প্রাণ-দান করছি।

"যুধিষ্ঠির নিবেদন করলেন—আমার যেন সর্বদা ধর্মে মতি থাকে,

আপনি আমাকে এই বর দান করুন। আর আপনার কাছে আমি সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা করছি।

"সহদেব! বিস্মিত হলেন ধর্মরাজ। বললেন—সে তো তোমার বৈমাত্র ভাই! তুমি দেখছি রাজা হয়েও জ্ঞানহীন, প্রবীণ হয়েও বালক। তুমি ভীম ও অর্জুনকে ছেড়ে সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা করছো! তারা বীর, তারা তোমার সহোদর। এমন কি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী গুণবতী কৃষ্ণার কথাটা পর্যন্ত মনে পড়ল না!

"সবিনয়ে যুধিষ্ঠির বললেন– বিমাতৃ-নন্দন হলেও নকুল এবং সহদেব আমার প্রাণধন। ভীম ও অর্জুনের চেয়ে তাদের আমি বেশি ভালবাসি। আপনি দয়া করে সহদেবের প্রাণ দান করুন।

মুগ্ধ ধর্মরাজ তখন বললেন—তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যই আমি এই লীলা করেছি। শুধু সহদেব নয়, আমি এখুনি তোমার চার ভাই এবং দ্রৌপদীর প্রাণ দান করছি।

'এত বলি ধর্মরাজ তারে নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনকমলে॥
ধন্য কুন্তী তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্মতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥...'*

---

* কাশীদাসী মহাভারত—বনপর্ব (রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত)

॥ তিন ॥

বাজারের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সংকীর্তন শোভাযাত্রা। আমাদের কীর্তনে কেনা-বেচা বন্ধ। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দোকান-পাট ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। একে তো সংকীর্ণ পথ, তার ওপর এখানে-ওখানে টাঙ্গা ও গরুর-গাড়ি দাঁড়িয়ে। কাজেই শোভাযাত্রাও সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

বাজার ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে একটা বেশ বড় তোরণ। বোধকরি পুরনো কামাঁ শহরের সীমান্ত।

তোরণ পেরিয়েই শুরু হল চড়াই। আমরা সেই পথে চলেছি এগিয়ে।

শহর শেষ হয়ে এলো। এদিকে বাড়ি-ঘর নেই বললেই চলে। পথের দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ।

অবশেষে শ্রীরাধামদনমোহনজীউর মন্দিরের সামনে পৌঁছনো গেল। বৃন্দাবন থেকে জয়পুর যাবার পথে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ইষ্টদেবতা মদনমোহন এই মন্দিরে রাত্রিবাস করেছিলেন।

আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা মথুরা-বৃন্দাবন ধ্বংস করতে আসছে শুনে জয়পুরের মহারাজা গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনসহ বৃন্দাবনের বহু বিগ্রহকে জয়পুরে নিয়ে যান। পরে অবশ্য মহারাজার শ্যালক করৌলীর রাজা মদনমোহনজীউকে নিজের রাজ্যে নিয়ে যান। এখনও তিনি সেখানেই রয়েছেন। বৃন্দাবনে, খেলনবনে এবং এখানে তাঁর প্রতিনিধি বিগ্রহ পূজিত হচ্ছে। সেই বিগ্রহ দর্শন করতেই আমরা আজ এসেছি এই মন্দিরে।

ছোট জরাজীর্ণ মন্দির। ভেতর শ্রীরাধামদনমোহনের প্রতিনিধি বিগ্রহ। আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। কীর্তন করে এগিয়ে চলি কাম্যবনের পথে।

বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে একটি ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার সামনে এসে শোভাযাত্রা থামল। বন্ধ হল কীর্তন। মথুরা মহারাজ বললেন, "আপনারা জানেন, বনবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী কিছুকাল এই কাম্যবনে বাস করেছিলেন। দুর্যোধনের পরামর্শে পাণ্ডবদের জব্দ করতে বহু শিষ্যসহ দুর্বাসা মুনি এখানেই তাঁদের অতিথি হয়েছিলেন!"

"জানি বৈকি মহারাজ।" চক্রবর্তী মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "আর এও জানি, কৃষ্ণের কৃপায় পাণ্ডবরা জব্দ হন নি, দুর্বাসা নিজেই জব্দ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।"

মথুরা মহারাজ চক্রবর্তীর উক্তিতে বিরক্ত হন না, বরং আরও উৎসাহভরে বলতে থাকেন, "দুর্যোধনের পরামর্শে এই কাম্যবনেই একদিন জয়দ্রথ সুযোগ পেয়ে দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন নি। পথে ভীমের হাতে ধরা পড়ে তাঁকে প্রচুর প্রহার সহ্য করতে হয়েছিল। ভীম হয়তো সেদিন জয়দ্রথকে মেরেই ফেলতেন, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ যুধিষ্ঠির এসে পড়ায় জয়দ্রথ বেঁচে যান।

"পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর আগমনবার্তা পেয়ে দেশ-বিদেশ থেকে বহু রাজা ও মুনি-ঋষি কাম্যবনে এলেন। কাম্যবন প্রায় হস্তিনায় পরিণত হল। যুধিষ্ঠির তাই এখানে এক ধর্মসভা আহ্বান করলেন। কিন্তু সভা বসবে কোথায়? গাছতলায় তো আর সভা বসতে পারে না। তাই তিনি বিশ্বকর্মাকে সভাগৃহ নির্মাণ করতে বললেন। একরাতের মধ্যে চুরাশী স্তম্ভযুক্ত রমণীয় সভাগৃহ নির্মাণ করলেন বিশ্বকর্মা। সেই সভাগৃহের সামনেই এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা।"

মথুরা মহারাজ শেষ করতেই আবার সেই ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাটির দিকে তাকাই। পুরনো, তবে মোটেই মহাভারতের যুগের বলে মনে হচ্ছে না। বড়জোর চার-পাঁচ শ' বছর হতে পারে।

বোসবাবুরও তাই ধারণা। তবে তিনি বললেন, "কথিত আছে, যুধিষ্ঠির এখানেই সেই ধর্ম-মহাসভার আয়োজন করেছিলেন, আর তাই তিন-চার শ' বছর আগে বল্লভী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ চুরাশী স্তম্ভযুক্ত এই সভাগৃহটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আজ তার এই দুর্দশা।"

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। অর্ধচন্দ্রাকার একটি সভামণ্ডপ। ভেতরের দিকে দেওয়াল নেই। মাঝখানে পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণ। কারুকার্যময় কতকগুলি প্রস্তর-স্তম্ভের ওপর সভা-মণ্ডপের ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলি দর্শনীয়। আমরা তাই দেখছি।

হঠাৎ মথুরা মহারাজ জানকীকে বলেন, "গুনে দেখ তো কতগুলো স্তম্ভ আছে?"

জানকী গুনতে শুরু করে। আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকি। গণনা শেষ করে জানকী বলে ওঠে, "তিরাশী।"

সবাই হেসে উঠি। জানকী লজ্জা পায়। মথুরা মহারাজ বলেন, "আর একবার গুনে দেখ।"

জানকী আবার গুনতে শুরু করে। একসময় শেষ করে বলে ওঠে, "পঁচাশী।"

আমরা আবার হেসে উঠি। এবারে ক্ষেপে যায় জানকী। বলে, "হাসছেন কেন? নিজে গুনে দেখিয়ে দিন তো একবার?"

আমি কিছু বলার আগেই মথুরা মহারাজ বলেন, "পারবে না, কেউ পারবে না, আমিও না। দাগ কেটে কেটে না গুনলে কিছুতেই নির্ভুলভাবে গোনা হবে না, গোলমাল হয়ে যাবেই।"

জানকী শান্ত হয়। আমরাও শান্তিতে বেরিয়ে আসি পথে। শোভাযাত্রা চলতে আরম্ভ করে। শুরু হয় কীর্তন—

'দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে।
হৈল মহা অধৈর্য কৃষ্ণের লীলাগানে॥
এই যে কামনাকুণ্ড জানে সর্বজনা।
এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা॥'

আমরা কিন্তু কীর্তন করছি না। যথারীতি পেছনের সারিতে গল্প করতে করতে পথ চলেছি। কথায় কথায় বোসবাবু বলছেন, "এই সভাগৃহটি যে বল্লভী বৈষ্ণবরা তৈরি করেছেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঐ চুরাশীটি স্তম্ভ।'

"কেমন করে?" জানকী জিজ্ঞেস করে।

"কারণ, বল্লভীদের সব কিছুতেই চুরাশী। তাঁদের চুরাশীজন মোহন্ত···"

বোসবাবু শেষ করতে পারেন না, সহসা কীর্তন থেমে যায়। আমরা গোপীনাথ মন্দিরের সামনে পৌঁছে গিয়েছি।

আমি বলছি গোপীনাথ, ওঁরা বলছেন শ্রীরাধাগোপীনাথ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে রাধা ছাড়া কৃষ্ণ হয় না। তাই রাধাগোবিন্দ, রাধামদনমোহন, রাধাগোপীনাথ।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। আমরা গোপীনাথ মন্দিরে এসেছি। সেই একই ব্যাপার। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের ভয়ে শ্রীমধু পণ্ডিত সেবিত গোপীনাথ বিগ্রহকে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে যাবার পথে এখানে আনা হয়েছিল। গোপীনাথজী এই মন্দিরে রাত্রিবাস করেছিলেন। মূল-বিগ্রহ এখনও জয়পুরে। আর বৃন্দাবনের মতো এখানেও রয়েছে তাঁর প্রতিনিধি বিগ্রহ। এখন তাঁরই দর্শনপ্রার্থী আমরা।

নামেই মন্দির, নইলে ছোট একটি বাড়ি। তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পাথর-বাঁধানো অঙ্গন। অঙ্গনের একদিকে মন্দির, তিনদিকে সেবাইতদের বাসগৃহ। শুধু তাঁদের নয়, তাঁদের গোধনদেরও বটে।

এসেছি রাধাগোপীনাথ মন্দিরে, কিন্তু মন্দিরের অঙ্গনে রয়েছে শ্রীহনুমানের মন্দির। গোপীনাথজীর সঙ্গে হনুমানজীর যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, তা আমাদের অজানা নয়। তবু আমরা দর্শনী দিয়ে দর্শন কারি হনুমানজীকে। তারপরে উঠে আসি গোপীনাথ মন্দিরে।

মাঝারী আকারের মন্দির। সর্বাঙ্গে অযত্নের চিহ্ন। শুধু দেব-সেবায় পেট ভরে না সেবাইতদের। তাই তাঁদের গো-সেবাও করতে হয়। সুতরাং দেবতা অবহেলিত।

আমরা অন্ধকার গর্ভ-মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। ভেতরে প্রদীপ জ্বলছে। তারই মৃদু আলোয় দর্শন করি রাধাগোপীনাথকে।

কাপড়-পরানো দণ্ডায়মান বিগ্রহ। আমরা প্রণাম করি। গুরুমহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত কীর্তন শুরু করলেন—

'গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি॥···
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি॥*

---

* সংকীর্তনমালা—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী কর্তৃক সংকলিত। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মায়াপুর।

গোপীনাথজীকে দর্শন করে আমরা ফিরে চলেছি শহরের দিকে। না, ধর্মশালায় ফিরে যাচ্ছি না। যাচ্ছি রাধাগোবিন্দ মন্দিরে। গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর'। তাঁরা যথাক্রমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

'শ্রীরাধাসহ "শ্রীমদনমোহন"।
শ্রীরাধাসহ "শ্রীগোবিন্দ-চরণ" ॥
শ্রীরাধাসহ শ্রীল "শ্রীগোপীনাথ"।
এই তিন ঠাকুর হয় "গৌড়ীয়ার নাথ" ॥'

কবিরাজ গোস্বামী আরও বলেছেন—

'অতএব ভাগবতে এই "তিন" কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥
এই—"সম্বন্ধ", শুন "অভিধেয়" ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যা'র স্থিতি ॥
এবে শুন প্রেম, যেই—মূল "প্রয়োজন"।
পুলকাশ্রু-নৃত্যগীত—যাহার লক্ষণ ॥'

এবং শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদের ভাষায়—'ত্রিবিক্রমের তিনটি আধার—গোবর্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণা। এই তিন ধাম বা আধারে প্রবেশ লাভই—সর্বসাধ্যপরাকাষ্ঠা। শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীপদ কমলমধু-দ্বারা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু-দ্বারা ও শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবক্ষঃ-কমলমধু-দ্বারা যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, সেই গৌড়ীয়াই সাধ্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত সেই মধুপানকারীকে সাধকাবস্থায় "ভাবুক" ও সিদ্ধাবস্থায় "রসিক" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মধুপান না করা পর্যন্ত, বৈষ্ণব বা ভাগবত নামে অভিহিত হইলেও "গৌড়ীয়" নামে আখ্যাত হওয়া যায় না।'*

---

* 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর'।

গোপীনাথ ও মদনমোহনের মতো গোবিন্দদেবের বিগ্রহকেও বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে যাবার পথে কাম্যবনে নিয়ে আসা হয়। গোবিন্দের সেবিকা বৃন্দাদেবীর বিগ্রহকেও তখন তাঁর সঙ্গে আনা হয়েছিল। যেখানে সেদিনের মতো যাত্রা-বিরতি হয়েছিল, সেখানেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে রাধাগোবিন্দ মন্দির। আমরা এখন সেই মন্দিরে চলেছি।

লোকালয়ের মাঝে মন্দির—রাধাগোবিন্দ মন্দির। গোপীনাথ মন্দিরের চেয়েও জীর্ণতর। পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দির-তোরণ।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি।

পাথর-বাঁধানো প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অশ্বত্থ গাছ। তিনদিকে সেবাইতদের বাসগৃহ আর একদিকে মন্দির—পাথরের মন্দির। সামনে বারান্দা। তারপরে পাশাপাশি তিনটি মন্দির। মাঝের মন্দিরে রাধাগোবিন্দ। ডানদিকের মন্দিরে জগন্নাথদেব। জগন্নাথ মূর্তির দু'পাশে নিতাই-গৌরের দণ্ডায়মান মূর্তি।

বাঁদিকের মন্দিরটি রাধারাণীর সখী বৃন্দাদেবীর। এই মন্দিরেই রয়েছে বৃন্দাদেবীর আদি-বিগ্রহ। বৃন্দাদেবী মধু-বৃন্দাবন ছেড়ে যান নি।

কথিত আছে, গোবিন্দদেবের সঙ্গে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে যাবার পথে বৃন্দাদেবীও কাম্যবনে রাত্রিবাস করলেন। পরদিন সকালে জয়পুর যাবার জন্য বৃন্দাদেবীকে রথে তোলা হল। রওনা হবার সময় সহসা সেই রথের চাকা মাটিতে বসে গেল, বহু চেষ্টা করেও সেই চাকা আর মাটি থেকে তোলা গেল না। বৃন্দাদেবীর স্তুতি করে মহারাজা জানতে পারলেন, দেবী কাম্যবনের বাইরে যেতে সম্মত নন। কারণ তিনি ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী এবং কাম্যবন হচ্ছে ব্রজ-মণ্ডলের সীমান্ত।

নিরুপায় জয়পুরাধিপতি তখন বৃন্দাদেবীকে এখানেই প্রতিষ্ঠা

করলেন। তারপরে দৈনিক দেবীপূজার ব্যবস্থা করে তিনি রাধা-গোবিন্দকে নিয়ে জয়পুরে চলে গেলেন।

কিন্তু মহারাজা সেখানে পৌঁছে প্রথম রাতেই স্বপ্ন দেখলেন, বৃন্দাদেবী তাঁকে বলছেন—তুমি তো দিব্যি রাজভোগ খেয়ে বিশ্রাম করছো, আর আমি যে এখানে উপোস করে রয়েছি।

—কেন? মহারাজা প্রশ্ন করলেন। আমি তো আপনার পুজোর ব্যবস্থা করে এসেছি!

বৃন্দাদেবী বললেন—আমার পুজোর ভোগ তো আমি গ্রহণ করতে পারি না।

—কেন? স্বপ্নে মহারাজা আবার একই প্রশ্ন করেন।

বৃন্দাদেবী বলেন, আমি যে রাধাগোবিন্দের সেবিকা। গোবিন্দ-দেবের প্রসাদই আমার একমাত্র আহার্য। তুমি কাম্যবনে গোবিন্দ-পুজোর ব্যবস্থা করে দাও।

তাই করলেন মহারাজা। তিনি রাধাগোবিন্দের এই প্রতিনিধি বিগ্রহ নিয়ে আবার ফিরে এলেন এখানে। বৃন্দা-মন্দিরের পাশেই নির্মিত হল গোবিন্দ-মন্দির। আর সেই থেকে রাধাগোবিন্দের সেবিকারূপে বৃন্দাদেবী বিরাজ করছেন এখানে—এই কাম্যবনে।

ব্রজ-মণ্ডলে যে সামান্য কয়েকটি আদি-বিগ্রহ রয়েছে, বৃন্দাদেবী তাঁদেরই অন্যতম। অপূর্ব সুন্দর ও সুবৃহৎ মূর্তি। আমরা দু'চোখ ভরে দর্শন করি। সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি মধু-বৃন্দাবনের অধি-ষ্ঠাত্রীকে। আর ভাবি আজ আমাদের জীবন ধন্য হল। আমি ধন্য হলাম।

ফিরে এলাম ধর্মশালায়—আজকের মতো পথ-পরিক্রমা শেষ হল। সবাই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সকালে একটানা চোদ্দ মাইল হাঁটতে হয়েছে। তারপরে আবার এই পরিক্রমা।

কিন্তু দামোদর-ব্রতধারী ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছি। সুতরাং বিশ্রামের অবকাশ নেই। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে

গেছে। অতএব ধর্মশালার চত্বরে বিজয়-বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে কীর্তন করতে হচ্ছে।

সন্ধ্যারতির পরে পাঠের আসর বসল। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"সমাগত সুধীবৃন্দ! আজ আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনপঞ্চাশতম অধ্যায়টি পাঠ করব। এই অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে অক্রূরের হস্তিনায় গমনের কথা বলেছেন। আপনারা জানেন কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃঃস্বসা অর্থাৎ পিসীমা। মহারাজ পাণ্ডুর অকাল-মৃত্যুর পরে ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চ-পাণ্ডবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছেন না, এই সংবাদ শুনে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনায় পাঠালেন; তিনি তাঁকে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা জেনে আসতে বললেন।

"মহাত্মা অক্রূর পুরুবংশীয় নরপতিদের রাজধানী, দেবালয়াদির দ্বারা পরিশোভিত হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কুন্তী প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর দেখা হল।

"কথায় কথায় কুন্তী তাঁকে জানালেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের প্রতি বড়ই অত্যাচার করছে। কারণ, প্রজারা বলবান ও বিনয়ী পাণ্ডবদের তাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

"কুন্তী তাঁকে বললেন—হে প্রিয়দর্শন অক্রূর! আশ্রয়দাতা ও ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ এবং কমললোচন বলরাম তাঁদের পিসতুতো ভাইদের মনে রেখেছে কি? হরিণ যেভাবে বাঘের মধ্যে বাস করে, আমরাও এখানে সেইভাবে দিন কাটাচ্ছি। আপনি কৃষ্ণকে বলবেন সে যেন আমাকে ও তার পিতৃহীন ভাইদের পরামর্শ দান করে।

"তারপরেই কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বলতে থাকলেন—হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বপালক! হে গোবিন্দ! হে সর্বেশ্বর! তুমি ছাড়া আমি যে অন্য কোন আশ্রয় দেখতে পাচ্ছি না। আমি তোমার শরণাগতা।

"অক্রূর তখন কুন্তীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ধর্ম, বায়ু ও

ইন্দ্র প্রভৃতি আপনার পুত্রদের জনক। সুতরাং, কেউ তাঁদের অনিষ্ট করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

"তারপরে অক্রূর এলেন নিজ পুত্রগণের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি বিষম ভাবাপন্ন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির সামনেই তাঁকে বলতে থাকলেন—আপনি যদি নিজের ছেলেদের ও ভাইপোদের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে রাজধর্ম পালন করেন ও প্রজাদের মনোরঞ্জন করেন, তাহলেই কীর্তিমান হতে পারবেন। আর যদি তা না করেন, তাহলে ইহলোকে নিন্দনীয় হয়ে পরলোকে নরকবাস করবেন।

"অক্রুর বললেন—হে রাজা! মানুষ একা জন্মে, একা মরে এবং একাই নিজের পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে। সুতরাং সংসারকে স্বপ্নতুল্য বিবেচনা করে শান্ত ও পবিত্র জীবন যাপন করা উচিত।

"অক্রূরের উপদেশ শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—মানুষের যেমন অমৃত-পানের তৃষ্ণা মেটে না, তেমনি আপনার হিতকথা শুনেও আমি তৃপ্ত হতে পারছি না, আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। তবু আমি আপনার উপদেশ মেনে নিতে পারছি না। কারণ, পুত্রস্নেহে অভিভূত আমার চঞ্চল হৃদয়ে আপনার উপদেশ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তবু জানি শ্রীকৃষ্ণের বিধানকে অন্যথা করার সাধ্য আমার নেই। সুতরাং আমি ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় রয়েছি, এবং যাঁর দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছা-শক্তিতে এই সংসার-চক্র আবর্তিত হচ্ছে, সেই পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে প্রণাম করছি।"

॥ চার ॥

শেষরাতে যথারীতি ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আজ তেরো দিন হল আমি আশ্রমবাসী হয়েছি। অর্থাৎ ঘণ্টাকর্ণ হয়ে আছি।

শেষরাত থেকে শুরু হয় ঘণ্টা—মঙ্গলারতির ঘণ্টা, কীর্তনের ঘণ্টা, পরিক্রমার ঘণ্টা, পুজোর ঘণ্টা, ভোগারতির ঘণ্টা, প্রসাদের ঘণ্টা, সন্ধ্যারতির ঘণ্টা, পাঠের ঘণ্টা ও শয়নারতির ঘণ্টা।

অতএব ঘণ্টা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসি। কেবল আমি নই— আমরা সবাই। কাল রাতে সাতজন সহযাত্রীর সঙ্গে আমি একঘরে ঘুমিয়েছি।

হাত-মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম ধর্মশালার চত্বরে— অস্থায়ী মন্দিরে। আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের যে বিজয়-বিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে এই পদ-পরিক্রমা করছি, গতকাল সেই বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ধর্মশালার চত্বরে। সেখানেই শুরু হয়েছে মঙ্গলারতি, অর্থাৎ কীর্তন। ভক্ত-বৈষ্ণবদের সব কিছুতেই কীর্তন। কীর্তনের ভেতর দিয়েই তাঁরা কৃষ্ণ-সেবা করে থাকেন। আমি ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব। তবু ভক্তদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমা করছি। সুতরাং গলা মেলাই।

আরতির পরে মন্দির-প্রদক্ষিণ। এখানে মন্দির নেই। আমরা খোল-করতাল সহযোগে কীর্তন করতে করতে বিজয়-বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করলাম। রাধা-কৃষ্ণ বলুন আর গৌর-নিতাই বলুন, সবই তো মানুষের মনে! 'কায়' 'মন' ও 'বাক'-কে দণ্ডিত করে, একটুকরো গোবর্ধন-শিলাকে প্রদক্ষিণ করলেও গিরিরাজ-গোবর্ধন পরিক্রমার পুণ্যফল অর্জন করা যায়।

প্রদক্ষিণ শেষে শুরু হল জয়ধ্বনি—নবদ্বীপ থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত

তাবৎ তীর্থ এবং বৃন্দাবনচন্দ্র থেকে নবদ্বীপচন্দ্র পর্যন্ত যাবতীয় দেব-দেবীর নামে নামে জয়ধ্বনি করা হল।

জয়ধ্বনির পরে প্রণামের পালা। প্রণাম মানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। প্রথমে বিজয়-বিগ্রহকে দণ্ডবৎ করলাম। তারপরে যথাক্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও সেবকদের। সবশেষে নিজেরা নিজেদের।

এই প্রণামের পরেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের দিন আরম্ভ হয়। আমাদেরও তাই হল।

বোসবাবু, সেনবাবু, বৌদি ও জানকীর সঙ্গে বাজারে এলাম। আজ আর চক্রবর্তী চা খেতে আসে নি। আজ তার উপোস। সে দীক্ষা নেবে। সুতরাং চক্রবর্তী আজ পরিক্রমায় বেরুচ্ছে না।

বাজার থেকে ফিরে এসে দেখি সবার সঙ্গে চক্রবর্তীও দাঁড়িয়ে আছে ধর্মশালার সামনে। ক'দিন একসাথে পথ চলেছি, আজ সে সঙ্গে যাচ্ছে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

কাছে আসতেই চক্রবর্তী বলে, "আমি তো ভাই যেতে পারছি না আজ। আমার আর চরণ-পাহাড়ী দর্শন হল না।" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে সে। তারপরে বলে, "তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ঘোষ!"

"বেশ তো, বল কি করতে হবে?" জিজ্ঞেস করি।

চক্রবর্তী তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট এক শিশি আলতা ও দু'খানি নতুন কাপড়ের টুকরো আমাকে দিয়ে বলে, "এই কাপড়ে চরণ-পাহাড়ী থেকে শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ নিয়ে এসো আমার জন্য।"

গতকালই শুনেছি, আজ আমরা চরণ-পাহাড়ী যাচ্ছি। তবু চক্রবর্তীকে বলি, "কিন্তু কেমন করে ছাপ নিতে হয় তা যে জানা নেই আমার!"

"জানার দরকারও নেই। অনেককেই দেখবে ছাপ নিচ্ছে, তাদের

কাউকে এই আলতার শিশি ও কাপড় দিয়ে দিও। তারাই ছাপ তুলে দেবে।”

যথাসময়ে যাত্রা হল শুরু। শহরের ভেতর দিয়ে কীর্তন করতে করতে আমরা চলেছি এগিয়ে। এক সময় শহর শেষ হয়ে গেল। আমরা শহরতলীর পথে এগিয়ে চললাম।

বেশ কিছুক্ষণ একটানা পথ চলার পরে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা গয়াকুণ্ডের তীরে পৌছল। কোথায় বিহার আর কোথায় এই রাজস্থান? কোথায় গয়া আর কোথায় এই কাম্যবন? কিন্তু দুই-ই ভারতীয় তীর্থ—ভক্তের মানস-স্বর্গ। তাই কাম্যবনের এই জলাশয়টির নাম গয়াকুণ্ড।

সাধারণ একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর। কিন্তু অসাধারণ নাকি এর মহিমা। আমার সহযাত্রীরা কুণ্ডের পুণ্যবারি স্পর্শ করে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করলেন। আমিও অম্লানবদনে তাঁদের শরিক হলাম।

তারপরে এলাম গদাধর মন্দিরে—কুণ্ডের পূর্বতীরে। এই মন্দিরে রয়েছে ব্রহ্মার মালা। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা। সুতরাং তাঁর এই মালাগুলিও জাগতিক নয়। প্রায় টেনিস বলের সমান গোল গোল কাঠের গুলি দিয়ে গড়া—আট-দশ ফুট লম্বা মালা। একটি নয়, তিনটি। পুণ্যার্থীরা অনেকেই দু'হাতে সেই মালা গলায় ঠেকিয়ে ব্রহ্মা হবার চেষ্টা করছেন।

দর্শন সেরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। একা পেয়ে কয়েকটি ব্রজবালক-বালিকা ঘিরে ধরল আমাকে। সকরুণ কণ্ঠে আবদার করতে থাকল—একঠো পাই দে মহারাজ···একঠো পাই···!

পাই! চমকে উঠি। টাকা-আনা-পাইয়ের পালা তো কবে শেষ হয়ে গিয়েছে! পাই যে অদৃশ্য হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই। তার কথা এই ব্রজশিশুরা জানল কেমন করে?

পরক্ষণেই বুঝতে পারি এরা পরাধীন ভারতবর্ষের পাই-পয়সা চাইছে না, স্বাধীন ভারতের নয়া-পয়সা চাইছে। পয়সাকেই পাই

বলছে। বলতেই পারে। একালের পয়সা যে সেকালের পাইয়ের চেয়ে আকারে ছোট এবং মূল্যে অনেক খাটো।

কিন্তু আমার কাছে তো এক-পয়সার মুদ্রা নেই! থাকা সম্ভবও নয়। কারণ ওটি এখন শুধু নামেই বেঁচে আছে, কোন কাজে লাগে না।

তবে তিন-পয়সার মুদ্রা রয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজও যাত্রায় বেরুবার সময় দু'টাকার তিন-পয়সা নিয়ে এসেছি। তারই একটি করে দিয়ে দিই ওদের। ওরা খুশি হয়ে ঘেরাও তুলে নেয়। ভাবি—কত সামান্যে খুশি হয় এরা। আর কত দরিদ্র আমাদের দেশ—শ্রীকৃষ্ণের দেশ।

আবার শুরু হয়েছে পথচলা—আমরা সংকীর্তন সহযোগে খালি-পায়ে হেঁটে চুরাশি ক্রোশ বিস্তৃত বন-পরিক্রমা করছি।

কামাঁ শহর শেষ হয়েছিল অনেকক্ষণ, এবারে শহরতলীও শেষ হয়ে গেল। বিজন প্রান্তরের বুক চিরে একটি পাথর-বাঁধানো পথ। তারই ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের শোভাযাত্রা—শতাধিক নারী-পুরুষের মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা।

পথের পাশে কোথাও ক্ষেত, কোথাও কাঁটাবন। কোথাও বা দু'-একটি কুঁড়েঘর। হাঁস-মুরগী গরু-ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো বা আমাদের দেখছে আর ভাবছে—এই মানুষগুলি এই প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে এমন তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে কোথায় চলেছে? এপথে তো মোটর চলে, তাহলে এরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছে কেন?

ভাববে না কেন—ওরা যে মানুষ নয়, পশু। ওদের তো আর পুণ্যার্জনের প্রয়োজন নেই!

"আচ্ছা, আপনি কি সেদিন রাতে রাধাকুণ্ডে স্নান করেছিলেন?"

চমকে উঠি! পাশে তাকাই। হ্যাঁ, জানকী।

কিন্তু সে তো দু'দিন হল আমার সঙ্গে প্রায় কথা বন্ধ করে আছে। আজ হঠাৎ···

তাড়াতাড়ি জবাব দিই, "হ্যাঁ। খুব ভাল লেগেছে।"

"শীত করে নি?"

"করেছে, তবে তা তেমন কিছু নয়। তুমিও থেকে গেলে পারতে।"

"আমার কথা থাক্।" জানকী গম্ভীর স্বরে বলে। একবার থামে সে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "ঐ ভদ্রমহিলা কে?"

"মানসী।"

"ওঁর নাম বুঝি মানসী?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"না। ভারি সুন্দর নাম।"

"তোমার নামটাই বা খারাপ কিসের?"

জানকী যেন সহসা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "আমার কথা ছেড়ে দিন। আমার মতো কালো-কুচ্ছিতের আর কত ভাল নাম হবে?"

আমি বলি, "কিন্তু যাঁর নাম থেকে তোমার নাম রাখা হয়েছে, তিনি বিশ্বের প্রথমা সুন্দরী, রামায়ণের নায়িকা সীতাদেবী।"

"হ্যাঁ, জনমদুঃখিনী জানকী।" সে মন্তব্য করে।

আমি চুপ করে থাকি।

একটু বাদেই জানকী নীরবতা ভঙ্গ করে। বলে, "উনি আপনার কে হন?"

এবারে একটু হাসতে হয় আমাকে। তারপরে বলি, "এক কথায় এর জবাব দেওয়া আমার পক্ষে একটু কষ্টকর।"

"উনি আপনাকে খুব ভালোবাসেন, না?"

"খুব কিনা বলতে পারব না। তবে খানিকটা বাসে বৈকি।'

"আপনি?"

"আমিও বাসি। এ সংসারে ভালোবাসার জন যে ওর বড়ই কম।"

"যাদের ভালোবাসার জন কম, আপনি বুঝি ভালোবাসেন তাদের?"

"অন্তত চেষ্টা করি।"

জানকী আর কোন প্রশ্ন করে না। কোন কথাও বলে না সে। সহসা এগিয়ে যায় কীর্তনীয়াদের কাছে। কীর্তন শুরু করে দেয়।

অনেকটা এগিয়ে এসেছি। খুবই গরম লাগছে—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। কেবল আমার নয়, সহযাত্রীদের সকলের। বিশেষ করে শ্রান্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের। কিন্তু আমার ওয়াটার-বট্‌লের জল শেষ হয়ে গেছে। পথের পাশে কোন জলাশয়ও নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ-ধূ করছে মাঠ। সেই মাঠের মাঝে পথের দু'পাশে দু'টি মাটির গড়। গতকাল কাম্যবনে যাবার পথে এই গড় দেখেছি। মনে হচ্ছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রুখতে সেকালের কোন রাজা গড় নির্মাণ করেছিলেন। আর একালে সেটি কিংবদন্তীতে রূপান্তরিত হয়েছে। জানকীর প্রশ্নের উত্তরে মথুরা মহারাজ বলছেন, "ঐ গড়ের ওপর বসে কৃষ্ণ-ভগবান তাঁর পিতৃপুরুষদের তর্পণ করেছিলেন।"

সামনের সহযাত্রীরা সহসা সোচ্চার স্বরে চিৎকার করে উঠলেন—জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় কাম্যবন! জয় চরণ-পাহাড়ী…!

কিন্তু কোথায়?

মথুরা মহারাজ বলেন, "দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ তো বাঁদিকে, পাহাড়ের ওপরে।" তিনি ইশারা করে দেখিয়ে দেন।

সত্যিই তাই। পথ থেকে খানিকটা দূরে—বাঁদিকে, পাহাড়ের ওপরে একটি ছোট মন্দির। অর্থাৎ আমার শ্রান্ত সহযাত্রীদের এবারে পর্বতারোহণ করতে হবে। যদিও সিঁড়ি আছে, তবু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পক্ষে কাজটা কোনমতেই সহজ নয়। ভরসার কথা, এখানে পথের পাশে কয়েকটা বড় বড় গাছ রয়েছে। আর সামনের বাড়িটির উঠোনে রয়েছে একটি ইঁদারা। গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ

জিরিয়ে নিয়ে শীতল জলে তেষ্টা মিটিয়ে তাঁরা 'ক্লাইম্বিং' শুরু করতে পারবেন।

তাই করলেন। সবাই প্রায় একযোগে বসে পড়লেন পথের ধারে—গাছের ছায়ায়। তৃষ্ণার্ত নয়নে তাকিয়ে রইলেন সেই কুয়োটির দিকে।

আমি কাছে আসতেই বৃদ্ধা সহযাত্রী দিদিমা দেশী ভাষায় বলে উঠলেন, "ও নাতি, পিপাসায় বুক যে ফাইট্টা গ্যালো, এট্টু জল খাওয়াও দেহি!"

"হ্যাঁ বাবা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। তোমার ওয়াটার বট্‌লে করে একটু জল নিয়ে এস।" জানকীর মা-ও একই অনুরোধ করেন।

অনুরোধ করেন সহযাত্রীরা অনেকেই। সুতরাং আর দেরি না করে কুয়োর দিকে এগিয়ে চলি।

পথের পাশে একটি বাড়ি—এদেশের বাড়ি যেমন হয়। কয়েকটি কুঁড়েঘর নিয়ে এক-একটি বাড়ি। সেই বাড়ির উঠোনেই কুয়োটি। পাড়-বাঁধানো ঝকঝকে কুয়ো। উঠোনটিও বেশ তকতকে। দরিদ্র গ্রামবাসীদের সুরুচির পরিচয় পেয়ে ভাল লাগছে। মনে মনে তাদের তারিফ করি আর বলি—এই তো চাই, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে যে ঐশ্বর্যের কোন সম্পর্কই নেই।

কয়েকজন মহিলা কুয়োর পাড়ে কাজ করছেন। আর তাঁদের একজন জল তুলছেন। ভালই হল, এদেশে কুয়োয় জল থাকে বহু নিচে। অভ্যেস না থাকলে তোলা শক্ত। মহিলাটি নিশ্চয়ই জল তুলে দেবেন আমাকে।

কুয়োর কাছে আসতেই মহিলারা সসম্ভ্রমে আমাকে পথ ছেড়ে দেন। যিনি জল তুলছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করেন, "আমি জল তুলে দিলে চলবে, না আপনি নিজে তুলে নেবেন?"

সবিনয়ে বলি, "আপনি তুলে দিলেই ভাল হয়।"

মহিলাটি তৎক্ষণাৎ বালতি ধুয়ে পরিষ্কার এক বালতি জল

তুলে আনলেন। তিনি আমার হাতে জল ঢেলে দিলেন। আমি চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আঁজলা ভরে জল পান করি। যেমন মিঠে, তেমনি ঠাণ্ডা—শরীরটা জুড়িয়ে এল। সব শ্রান্তি দূর হল।

জল খেয়ে, জল নিয়ে ফিরে চলেছি সহযাত্রীদের কাছে। তাঁরা প্রায় সকলেই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আচ্ছা, একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, সহযাত্রীদের কেউ তো এল না জল খেতে? সকলেই শ্রান্ত এবং তৃষ্ণার্ত। এত কাছে এমন সুস্বাদু জল, অথচ কেউ এল না কুয়োর ধারে! ব্যাপারটা বিস্ময়কর!

ফিরে আসি দিদিমার কাছে। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন। না, বিষয়টা মোটেই সুবিধের ঠেকছে না।

"দিদিমা!" ডাক দিই। বলি, "জল এনেছি। এই নিন।"

দিদিমা আমার দিকে তাকান। আমি জলভর্তি ওয়াটার বটলটা তাঁর দিকে এগিয়ে ধরি।

তিনি কিন্তু হাত বাড়ান না। অসহায় কণ্ঠে বলেন, "ও জল তো আমরা খাইতে পারমু না। তোমারও খাওয়া ঠিক হয় নাই।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "কেন, কি হয়েছে?"

"যে মাইয়া মানুষটা তোমারে জল তুইলা দিল, হে আমাগো জাতের মানুষ না —ছোট জাতের লোক।"

'জয় রাধে' বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু মনের ইচ্ছেকে মনেই বন্দী করে রাখতে হয়। আমি যে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবনে এসেছি। এই সংকীর্ণতার প্রতিবাদ করার সাধ্য নেই আমার। তাই জলের বোতলটি কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলি চরণ-পাহাড়ীর পথে।

কথাটা কিন্তু কিছুতেই মুছে ফেলতে পারি না মন থেকে। তৃষ্ণার্ত সহযাত্রীরা জল পেয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারলেন না। কারণ যিনি জল তুলে দিলেন, তিনি ভিন্ন ধর্মের মানুষ। কি দুর্ভাগ্য তাঁদের!

না, শুধু তাঁদের নয়, দুর্ভাগ্য এই দুর্ভাগা দেশের—ভারতের

পঞ্চান্ন কোটি মানুষের। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহ নিয়ে বন-পরিক্রমা করছি, কিন্তু অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারছি না— জাতিভেদের সংকীর্ণতা বিসর্জন দিতে পারছি না।

বড় রাস্তা থেকেই শুরু হয়েছে চরণ-পাহাড়ীর এই পায়ে-চলা সংকীর্ণ চড়াই পথ। পথের পাশে পতিত জমি আর কাঁটাবন। বনের কাঁটা পথে এসে ঠাঁই নিয়েছে। লুকিয়ে রয়েছে পথের ধুলোয়। স্বভাবতঃই পথ চলা সুখকর নয়। কিন্তু এ পথ যে ধর্মের পথ। ধর্মপথ চির-কণ্টকাকীর্ণ। দুঃখ না সইলে তো দুঃখহারীর কাছে যাওয়া যায় না। অতএব এগিয়ে চলি।

কণ্টকপথ শেষ হল, শুরু হল সিঁড়ি। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি আর চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখছি।

ওদিকে কীর্তন শুরু হয়েছে। তার মানে আমার সহযাত্রীদের বিশ্রাম শেষ। এবারে তাঁরাও রওনা হবেন। এগিয়ে এসে ভালই করেছি। ওপর থেকে ওঁদের ছবি নিতে পারব।

উঠে এলাম ওপরে—ছোট একটি মাটির টিলার ওপরে। এখান থেকে বড় ভাল লাগছে সহযাত্রীদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। একে তো সংকীর্ণ পথ, তার ওপর পথের দু'পাশে কাঁটাবন। ওঁরা সারি বেঁধে পাহাড়ে উঠছেন—ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ছবি নিলাম।

পাহাড়টির শিখরদেশ প্রায় সমতল। শিখরের কেন্দ্রস্থলে মন্দির—ইটের ছোট মন্দির। দেখতে অনেকটা ছাতার মত। চারিদিক ফাঁকা - দেওয়াল নেই। কয়েকটি স্তম্ভের ওপরে চন্দ্রাতপের মত ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। রয়েছে একখানি পাথর। কেদার-নাথের কথা মনে পড়ছে আমার। সেখানেও এমনি একখানি পাথর—কেদারনাথ-শিলা, নিরাকার পরমব্রহ্মের প্রতীক। তাঁকেই দর্শন করতে যুগ-যুগান্তর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ, ধনী-দরিদ্র, রাজা-

প্রজা, হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ছুটে চলেছে সেই দুর্গম গিরিতীর্থে—প্রাণের ঠাকুরকে প্রণতি জানাতে।*

তেমনি আমরাও আজ এসেছি এখানে—মধু-বৃন্দাবনের এই পরম রমণীয় তীর্থে, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ের পরমাত্মাকে প্রণাম করতে—তাঁর চরণ-চিহ্নকে দর্শন করতে।

পাথরখানির ওপরেই রয়েছে সেই চরণ-চিহ্ন—জায়গাটি সিঁদুর ও আলতায় লাল হয়ে আছে। ভক্তরা নতুন কাপড়ের ওপর এই পদ-চিহ্নের ছাপ নিয়ে যান—আমার সহযাত্রীরাও অনেকে নিয়ে যাবেন। নিতে হবে আমাকেও।

শ্রীকৃষ্ণ মানুষ কি ভগবান জানি নে। এটি তাঁর পদচিহ্ন কিনা, তাও জানি নে। শুধু জানি সহস্র সহস্র বছর ধরে শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি মানুষের মনে ভগবানরূপে পূজিত হচ্ছেন। জানি যে, শত শত বছর ধরে এই চিহ্নটিকে স্পর্শ করে, প্রণাম করে, পরিক্রমা করে —লক্ষ লক্ষ মানুষ ধন্য হয়েছেন। অতএব আমিও স্পর্শ করি—প্রণাম করি। পুণ্যশিলাকে প্রদক্ষিণ করি।

তারপরে আবার এসে দাঁড়াই সিঁড়ির কাছে। সহযাত্রীদের কেউ কেউ প্রায় উঠে এসেছেন, কেউ-বা এখনও সিঁড়ি পর্যন্তই পৌঁছতে পারেন নি। তাহলেও জানি তাঁরা আসবেন এই পুণ্যতীর্থে। স্পর্শ করবেন ঐ চরণ-চিহ্নকে—প্রণাম করবেন মানুষের ভগবানকে।

চারিদিকে তাকাই। দূরে সেই মাটির গড়টিকে এখন ধূসর একটি প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও'টি যেন মাটির জগতের সীমারেখা। আর সে জগৎটিকে এখান থেকে বড় বেশি সবুজ সমতল ও সুন্দর দেখাচ্ছে। সেখানে যে কোথাও ফসল, কোথাও ঘাস, আর কোথাও কাঁটাবন—এখান থেকে তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সবই সমান সবুজ, সমান সমতল ও সমান সুন্দর। যেমন মনে হচ্ছে আমার ঐ অগ্রসরমান সহযাত্রীদের। মনে হচ্ছে

* লেখকের 'পঞ্চ-প্রয়াগ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তাঁরা সবাই সমান। তাঁদের ভেতরে যে কোন ভেদাভেদ আছে, কিছুই বোঝার উপায় নেই এই চরণ-পাহাড়ী থেকে।

আচ্ছা, ওঁরাও তো আসছেন এখানে। ওঁরাও তো আমারই মতো শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নকে স্পর্শ করবেন, প্রণাম করবেন, প্রদক্ষিণ করবেন। তখন কি ওঁদেরও এমনি মনে হবে নিচের ঐ জগৎটাকে? আর সেই মনে হওয়া কি ওঁদের মনেও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে?

ওঁরা এলেন। একে একে সবাই এলেন। একসময় স্পর্শ, প্রণাম ও প্রদক্ষিণের পালা শেষ হল। আর তারপরেই মথুরা মহারাজ ইশারা করলেন।

আমরা কয়েকজন মথুরা মহারাজের সঙ্গে পাহাড়ের অপরদিকে আসি। এদিকেও দেখছি একসারি সিঁড়ি রয়েছে। তবে এদিকের সিঁড়িগুলি ছোট এবং একটু বেশি খাড়া। আর এদিকে কোন জনপদ কিংবা জনপথ নেই। কেবল খানিকটা দূরে মাঠের মধ্যে ছোট একটি জলাশয়।

সেই জলাশয়টি দেখিয়েই মথুরা মহারাজ বলেন, "ঐ হচ্ছে লুকোলুকি কুণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুণ্ডে সখীদের সঙ্গে লুকোলুকি, মানে ডুবোডুবি-খেলা খেলেছিলেন।"

"ভাল করে বলুন না মহারাজ!" জানকী যথারীতি অনুরোধ করে।

মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন, "একবার সখীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এলেন ঐ কুণ্ডের তীরে। কুণ্ডের নির্মল জল দেখে তাঁরা প্রলুব্ধ হলেন। জলে নামলেন—জলকেলি শুরু হল।

"জলক্রীড়া করতে করতে কৃষ্ণ একসময় প্রস্তাব করলেন—আচ্ছা, দেখা যাক্ একসঙ্গে ডুব দিয়ে, কে কতক্ষণ জলের নিচে থাকতে পারি?

'সখীরা সম্মত হলেন। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। সবাই একসঙ্গে জলে ডুব দিলেন।

"চতুর কৃষ্ণ কিন্তু একটু বাদেই ভেসে উঠলেন। দেখলেন— সখীরা সবাই জলে ডুবে রয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি তীরে উঠে চলে এলেন এখানে—দাঁড়িয়ে রইলেন ঐ পাথরখানির ওপরে। পাথরের বুকে তাঁর চরণ-চিহ্ন অঙ্কিত হল। আর সেই থেকেই এই পুণ্যভূমি চরণ-পাহাড়ী নামে পরিচিত।

"এদিকে সখীরা একে একে ভেসে উঠছেন। কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে তাঁরা আবার ডুব দিচ্ছেন। আবার ভাসছেন, আবার ডুবছেন। এইভাবে কৃষ্ণ-প্রেমে ভেসে ওঠা এবং ডুবে যাবার পালা চলল।

"একসময় সখীরা শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা উঠে এলেন তীরে। সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন কুণ্ডের জলে।

"কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? দিন ফুরিয়ে এল, অথচ কৃষ্ণের দেখা নেই। তাহলে কি রাধারমণ জলে ডুবে গেলেন? বৃন্দাবনচন্দ্র কি চিরদিনের তরে বিদায় নিলেন মধু-বৃন্দাবন থেকে?

"গোপীরা আর ভাবতে পারলেন না। তাঁরা 'হা-কৃষ্ণ' বলে কান্না জুড়ে দিলেন। ভক্তবৎসল গোপীনাথ সে কান্না সইতে পারলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেণুতে তান তুললেন।

"বেণুগীতি শুনে রাধারাণী সখীদের নিয়ে ছুটে এলেন এখানে— চরণ-পাহাড়ীতে। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হল এই মধুর-তীর্থে।"

মিলন-তীর্থ চরণ-পাহাড়ী থেকে নেমে এলাম নিচে। সবার আগে ওপরে উঠেছিলাম। এবারে সবার শেষে নিচে নামলাম আমি। আর নেমেই বুঝতে পারলাম—বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আমারই পথ চেয়ে বসে ছিলেন। কাছে আসতেই কেঁদে ফেললেন দিদিমা। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বুকটা যে আমার ফাইট্টা গ্যালো রে মণি! এট্টু জল না পাইলে আমি আর এ্যাক্ পাও আউগাইতে পারমু না।"

গম্ভীরস্বরে বলি, "কিন্তু ও তো নিচুজাতের মানুষের কুয়ো। ও কুয়োর জল খেলে যে জাত যাবে আপনাদের।"

একটু ম্লান হেসে জানকীর মা বলেন, "না বাবা, ওদের কুয়োর জল খেলে জাত যাবে কেন? আমরা ভক্তি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলছেন, তুমি কিংবা দলের অন্য কেউ জল তুলে দিলে আমাদের জল খেতে কোন বাধা নেই।"

"তাহলে কুয়োটার কোন দোষ নেই?" হাসি চেপে প্রশ্ন করি।

"না, না। কুয়ার দোষ হইব ক্যান?" দিদিমা পাল্টা-প্রশ্ন করেন। নিজেই উত্তর দেন, "জলের আবার জাত আছে নাকি—সব জলই যে গঙ্গাজল।"

এ কি বার্তা শুনি আজি দিদিমার মুখে! এ কি কৃষ্ণের কৃপা? না চরণ-পাহাড়ীর প্রভাব?

একটু হেসে বলি, "দড়ি-বালতি কোথায় পাব?"

"কেন? ওদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে।" জনৈক বৃদ্ধ পরামর্শ দেন।

"কাদের কাছ থেকে? ঐ ছোট জাতের মানুষগুলোর কাছ থেকে? কিন্তু ওদের দড়ি-বালতি দিয়ে জল তুললে আপনারা সে জল খেতে পারবেন কি? বিশেষ করে আজ আবার একাদশী!"

জানকীর মা বলেন, "তাতে কি হয়েছে? দড়ি-বালতির কি আবার জাত আছে নাকি?" একটু হাসেন তিনি। বোধ হয় আমার অজ্ঞতার জন্যই হাসি পেয়েছে তাঁর।

আমি অজ্ঞ, সত্যিই অজ্ঞ। কুয়োর জাত নেই, দড়ি-বালতির জাত নেই, জলেরও জাত নেই—কিন্তু মানুষের জাত আছে। আর তাই সব দোষ মানুষের।

সেই কথাই বলেন ভক্তি মহারাজ। বলেন, "ওদের কুয়োর জল খেতে তো আপত্তি নেই। কেবল দেখতে হবে, ওরা যেন সে জল ছুঁয়ে না দেয়।"

বুঝতে পারছি মহারাজেরও খুবই পিপাসা পেয়েছে। তাই তিনি সন্ন্যাসীদের দল ছেড়ে একেবারে শিষ্য-শিষ্যাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন। তবু কোন মন্তব্য করি না। কেবল মনে মনে ভাবি স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তিনি যে আবার বলতেন– নরনারায়ণ।

বেলা বাড়ছে, আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। সহযাত্রীদের তৃষ্ণা মিটিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। তাই বলি, "বেশ তো, আপনারা কুয়োর কাছে চলুন, আমি আপনাদের জল তুলে দিচ্ছি।"

সবাই সানন্দে সঙ্গী হয় আমার। কেবল শিষ্য-শিষ্যারা নয়, সেবক ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরাও। তেষ্টার জ্বালা যে বড়ই কঠিন জ্বালা। এবং তেষ্টার জাতও নেই।

॥ পাঁচ ॥

আজ একাদশী। বনযাত্রা শুরু করার পরে প্রথম একাদশী। সকাল থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম। জীবনে কখনও একাদশী করি নি। কিন্তু আজ করতে হবে। আমি যে ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমা করছি।

চরণ-পাহাড়ী আসা-যাওয়ার পথে এই একাদশীর ভাবনাটা মাঝে মাঝেই মনকে নাড়া দিয়েছে। কারণ, আমার ধারণা ছিল একাদশী মানে উপবাস। বিশেষ করে বৈষ্ণবদের আশ্রমে। সুতরাং ভয়ে ভয়ে ছিলাম। এই প্রচণ্ড পথশ্রমের পরেও যদি উপবাসী থাকতে হয় ··· ?

গতকাল কামাঁ বাজারে বসে চক্রবর্তী অবশ্য বলেছিল, আমার ধারণাটা নির্ভুল নয়। একাদশী করেও আমরা আজ মোটামুটি পেট-ভরা খাবার পাব এবং খাওয়াটা ভালই হবে—মুখ বদলানো যাবে।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করি নি। করার কোন কারণও ছিল না। একটু আগেই বলেছি, আমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই ভক্ত-বৈষ্ণব। এই কার্তিকমাস হল তাঁদের দামোদর-ব্রতের মাস। এ-মাসে তাঁরা চুল-দাঁড়ি কাটেন না এবং তেলের ব্যবহার করেন না। সুতরাং যাত্রার শুরু থেকেই তেলহীন রান্না খেতে হচ্ছে। দুপুরে আধসেদ্ধ ভাত (অন্ন) ও রাতে আধপোড়া রুটি, সঙ্গে খেসারী অথবা মটর ডাল, আলু-কপি কিংবা আলু-কুমড়ার সঝোল-তরকারী (রসা) এবং তেঁতুলের টক (অম্বল)। কোনদিন বা স্রেফ আলু-কপির খিচুরি। এই খেয়েই আমরা বিগত বারোদিন ব্রজ-পরিক্রমা করছি। প্রথম-দিকে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল। এখন মোটামুটি অভ্যেস হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই গতকাল চক্রবর্তীর কথাটা বিশ্বাস করি নি। এমনিতেই যেখানকার এই 'মেনু' সেখানে একাদশীতে ভরপেট খাবার জুটবে এমন ধারণা করা কোনমতেই সমীচীন নয়।

কিন্তু চরণ-পাহাড়ী থেকে ফিরে এসে কাম্যবনের ধর্মশালায় দুপুরের প্রসাদ পেয়ে সেই ধারণাতীত ব্যাপারটাই বিশ্বাস করতে হল। জীবনের প্রথম একাদশী করতে বসে বুঝতে পারলাম, একাদশী জিনিসটা মোটেই মন্দ নয়। সত্যি বলতে কি, এ যাত্রায় এসে এমন উপাদেয় প্রসাদ আর কখনও জোটে নি। আজ আমরা অন্ন, ডাল, রসা ও অম্বল পাই নি বটে, কিন্তু যা পেয়েছি তা আশাতীত।

চক্রবর্তী দীক্ষা নিচ্ছে বলে আজ বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রসাদ পেতে বসে আমরা প্রথমেই ফল এবং প্যারা পেলাম। তারপরে এলো আলুসিদ্ধ —অনেকখানি করে। তারপরে দুধ চিনি ও পানিফলের আটা দিয়ে তৈরি বরফি। খেতে খুবই সুস্বাদু। পরিমাণেও নেহাৎ কম ছিল না। অবশেষে রাবড়ি। ব্রজমণ্ডলের রাবড়ি বিখ্যাত। যাত্রাপথে সুযোগ পেলেই আমরা রাবড়ি কিনে খাই। কিন্তু আশ্রমের তরফ থেকে রাবড়ি পরিবেশন আজই প্রথম। সুতরাং চক্রবর্তীর জন্য দুঃখ হচ্ছে—বেচারী খেতে এত ভালোবাসে, অথচ এমন প্রসাদের ভাগ পেল না। কি করবে, আজ যে ওর দীক্ষা।

শুধু তাই নয়, ধর্মশালায় ফিরে এসেও চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হল না। সে এখনও গুরুমহারাজের বন্ধ-ঘরে বন্দী রয়েছে। তার ফরমাস মতো আমি চরণ-পাহাড়ী থেকে নতুন কাপড়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন নিয়ে এসেছি। ছাপ দু'টি তার বিছানার ওপর রেখে দিলাম। দীক্ষাগ্রহণ শেষ হলেই চক্রবর্তী ফিরে আসবে ঘরে—কৃষ্ণ-ভগবানের পদ-চিহ্ন পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠবে।

প্রসাদ উপাদেয় হলেও প্রসাদের পরে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। পাবার কথাও নয়, পাঁচ সপ্তাহের যাত্রাকে পঁচিশ দিনে

পূর্ণ করতে হবে আমাদের। ব্রজযাত্রার নিয়ম অনুযায়ী কাম্যবনে তিনদিন থাকবার কথা। তাছাড়া শুধু কাম্যবন-পরিক্রমার প্রচলন আছে ভক্ত-বৈষ্ণব সমাজে। সেই পরিক্রমাকে বলে 'পঞ্চ-দিবস কাম্যবন-পরিক্রমা।' ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত সেই পরিক্রমার শ্রেষ্ঠ সময়। ভক্তরা প্রতিদিন সকালে গোবিন্দমন্দিরে গিয়ে বৃন্দাদেবীকে দর্শন করে পরিক্রমায় বের হন। অসংখ্য দর্শন আছে কাম্যবনে। আমরা কেবল প্রধান প্রধান তীর্থ কয়টি দর্শন করতে পারব। কারণ, আমরা এখানে মাত্র দু'দিন থাকছি। সুতরাং 'আরাম হারাম হ্যায়'। প্রসাদের পরেই পরিক্রমার ঘণ্টা পড়ল। আমরা তৈরি হয়ে বেরিয়ে এলাম সদর দরজায়।

প্রায় সকলেই এসে গেছেন। অনেকেই একটু বিরক্ত। তবে কেউই সেকথা প্রকাশ করছেন না।

কিন্তু দিদিমা স্পষ্টবক্তা। তিনি আমার কাছে এসে বলে বসলেন, "তোমারে তো আগেই কইছি নাতি, এ্যারা দর্শন করাইতে আয় নাই, গরু খেদাইতে আইছে।"

আমি চুপ করে থাকি। কি বলব? জানকী হেসে ওঠে। আর তার হাসিটা বৌদি সেনবাবু ও বোসবাবুর মধ্যেও সংক্রামকের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

দিদিমা বিরক্ত হন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে জানকীকে প্রশ্ন করেন, "তোমরা হাসতে আছো ক্যান? আমি কি কিছু মিছাকথা কইলাম নাকি?"

"না, দিদিমা!" জানকী উত্তর দেয়। বলে, "আমরা আপনার কথা শুনে হাসছি না তো!"

"তয়?" দিদিমা অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে প্রশ্ন করেন।

"আমরা হাসছি ঐ বণিকপ্রভুর অবস্থা দেখে।"

জানকীর কথা শুনে ভেতরে তাকাই। সত্যি তাই। মাথায় চাদর জড়িয়ে লাঠিহাতে বণিকপ্রভু এদিকে আসছেন। চেহারাটা

দেখে হাসি পাওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং জানকীর বুদ্ধির তারিফ না করে পারি না।

কিন্তু আমরা কেউ কোন মন্তব্য করার আগেই গম্ভীরকণ্ঠে জানকী আবার দিদিমাকে বলে, "আর আপনার কথা শুনে আমরা হাসবই বা কেন? আপনি তো সত্যি কথাই বলেছেন। এত তাড়াহুড়ো করে কি দর্শন হয়? এ তো দর্শনের নামে গরু-খেদানোই হচ্ছে।"

না, আর বোধহয় হাসি চেপে রাখা সম্ভব হল না। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ, মারে কে? ঠিক কৃষ্ণ নয়, কেষ্টপ্রভু। জানকীর কথা শেষ হতেই শুরু হল কীর্তন। সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল, কাঁসর-ঘণ্টা উঠল বেজে। দিদিমা কীর্তনে মনোনিবেশ করলেন। আমরা প্রাণ খুলে হেসে নিলাম।

সংকীর্তন শোভাযাত্রা নেমে এলো পথে—কাম্যবনের পথে। এখন আমরা চলেছি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজন-কুটিরে। প্রবোধানন্দ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু। সেখান থেকে সোজা চলে যাব ব্যোমাসুরের গুহা দেখতে। ফেরার পথে দর্শন করব ভোজন-থালি—সখাসহায় শ্রীকৃষ্ণ যে পুণ্যভূমিতে বসে সখাদের সঙ্গে বন-ভোজন লীলা সুসম্পন্ন করেছিলেন।

মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। ব্রজমণ্ডলে মেঠোপথ মানেই কণ্টক-পথ। আমাদের সকলেরই খালি-পা। কিন্তু গত বারোদিন ক্রমাগত কাঁটার খোঁচা খেয়ে এখন কাঁটার ভয় কেটে গিয়েছে। সুতরাং কীর্তন করতে করতে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছি।

কিছুদূর হেঁটে একটু উঁচুতে উঠে হনুমানমন্দির। রামভক্ত মহাবীরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কি সম্পর্ক, জানা নেই আমার। কিন্তু কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করতে এসে মাঝে মাঝেই শ্রীহনুমানকে দর্শন করছি। মনে হয়, কৃষ্ণভক্তগণ ভক্ত-শিরোমণি মহাবীরকে ভুলতে পারেন নি বলেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেছেন।

সুতরাং সশ্রদ্ধচিত্তে মন্দিরে উঠে আসি। ছোট মন্দির, কোন মূর্তি নেই। ভেতরে একখানি সিঁদুরমাখানো শিলা—সম্ভবত শ্রীহনুমানের প্রতীক।

প্রণামী দিয়ে প্রণাম করি। তারপর আবার নেমে আসি মাঠে। সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে।

মাঠে কাঁটা আছে, কিন্তু রোদ নেই। এখানে প্রচুর গাছ পালা। ছায়াশীতল পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা।

চমৎকার একটি শান্ত-সুন্দর স্থানে এসে শোভাযাত্রা থামল।

সাধন-ভজন করার আদর্শ স্থানই বটে। সমস্ত অঞ্চলটি গাছে-ছাওয়া—যেন কুঞ্জবন। সামনে সুন্দর একটি সরোবর, তারই তীরে সেই রসিকানন্দ মহাপুরুষ শ্রীপ্রবোধানন্দ পদরেণু রঞ্জিত মহাতীর্থ। আমরা দর্শন ও দণ্ডবৎ করি।

সরোবরটির নাম শ্রীকুণ্ড, অনেকে বলেন সূর্যকুণ্ড। বাঁধানো ঘাটের একপাশে গিরিধারীর মন্দির। মন্দিরের গায়ে ছোট একটি ঘরে একজন সাধু বাস করেন।

কেন? কেন এই সন্ন্যাসী লোকালয় থেকে বহুদূরে, এই জনহীন বনে একাকী বাস করছেন? শুনেছি তিনি নাকি কদাচিৎ এ বনের বাইরে বের হন। কেউ এসে কিছু দিয়ে গেলে খাওয়া জোটে, নইলে উপবাসী থাকেন। কেন? কি করেন তিনি এখানে?

প্রবোধানন্দ যা করেছেন, সাধন-ভজন করেন। কিন্তু আজকের যুগেও তার কোন প্রয়োজন আছে কি?

আছে, নিশ্চয় আছে। আর যতদিন মনুষ্য-সভ্যতা থাকবে, ততদিন এ প্রয়োজন ফুরোবে না—এমনকি গ্রহ-গ্রহান্তরে মানুষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবার পরেও।

দূর গাঁয়ের মেয়েরা ঝুড়িতে করে আটা নিয়ে মন্দিরের সামনে বসে আছে। ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে করে আটা বিক্রি করছে।

এক ভাঁড় আটার দাম দশ পয়সা। দর্শনার্থীরা ঐ আটা কিনে সাধুজীকে সিধা দিয়ে যান। আমরাও দিলাম।

সাধুজীকে প্রণাম করে ঘাটে এসে বসি। কিছুক্ষণ কীর্তনের পরে সভা শান্ত হল। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী হলেন মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-রসে আপ্লুত হয়েছিলেন। সাধন-ভজনের অবসরে তিনি নয়খানি অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দ ব্যাখ্যান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজেই সেই মহাপুরুষের সাধনভূমিতে পদার্পণ করতে পেরে আজ আমরা ধন্য হলাম।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাধা দিলেন ভক্তি মহারাজ। মথুরা মহারাজের মতো তিনিও আমাদের গুরুমহারাজের গুরুভাই এবং সুপণ্ডিত। সুতরাং আবার বসে পড়ি।

দণ্ড হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভক্তি মহারাজ। কোনরকম প্রস্তাবনা না করেই বলতে আরম্ভ করলেন—

"শ্রীপ্রবোধানন্দ হলেন রাধারস-দীপ-প্রণেতা। রাধা-তত্ত্বের এমন সরস বর্ণনা আজ পর্যন্ত আর কেউ দিতে পারেন নি। আর এই বর্ণনায় তিনি তাঁর সাধনা ও পাণ্ডিত্যের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর 'শ্রীনবদ্বীপ শতক-'ও অপূর্ব। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

'বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শতকেও ভাষা লিখি একরূপ'॥"

একবার থামলেন ভক্তি মহারাজ। তারপরে শ্রীকুণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বলতে থাকলেন—

"এই শ্রীকুণ্ড হল শ্রীরাধিকার রসকুণ্ড। প্রবোধানন্দ জগতের

যাবতীয় রস এবং সকল সুধা রাধারাণীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়েছেন এবং সেই রসরাশি দিয়েই পূর্ণ করেছেন এই কুণ্ড। আজ সেই কুণ্ডবারি স্পর্শ করে আমাদের ইহকাল ও পরকাল ধন্য হল।”

‘প্রণমহ নারায়ণ অনাদি নিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ॥
একভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ॥…’

চলতে চলতে চমকে উঠি। কীর্তনের জন্য নয়। কীর্তন তো সর্বদাই চলেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাঁদের সাধন-ভজন, পূজা-পার্বণ, প্রসাদ-পরিক্রমা—সবকিছুই কীর্তনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করে থাকেন। কাজেই পরিক্রমাকালে কীর্তন তো চলবেই।

চমকে উঠেছি কীর্তনের পদ শুনে। পরিক্রমা শুরু হবার পর থেকে আমরা বহু বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ ও পদাবলী থেকে কীর্তন করেছি, কিন্তু কীর্তনীয়াদের কখনই শ্রীমালাধর বসুর কথা মনে পড়ে নি। কেষ্টপ্রভুকে ধন্যবাদ, তিনি আজ ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ থেকে কীর্তন ধরেছেন! গাইছেন—

‘আকাশের তারা যদি একে একে গুণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ …’

অনেকের মতে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম কাব্য শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। তাঁদের সে ধারণা সত্য না হলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় বাংলা ভাষার একখানি সুপ্রাচীন কাব্য এবং ভাগবতের প্রথম বঙ্গানুবাদ।* শ্রীমালাধর বসুকে কোন্ গৌড়েশ্বর ‘গুণরাজ খাঁন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, সঠিক জানা যায় না। তবে হুসেন

শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসার আগেই শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় রচনা শেষ হয়। সম্রাট আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ থেকে যে কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বাংলায় আসেন, মালাধর বসুর পূর্বপুরুষ দশরথ বসু তাঁদের অন্যতম। মালাধর দশরথের ত্রয়োদশ অধস্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতা ইন্দুমতী।

মালাধরের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীলক্ষ্মীনাথ বসু ওরফে সত্যরাজ খাঁন এবং তাঁর পুত্র শ্রীরামানন্দ বসু মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। মহাপ্রভু নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় পাঠ করতেন। প্রকৃতপক্ষে মহাকবি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের মতই বাংলা সাহিত্যে মালাধরের অবদানও অসামান্য। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম যেমন রামায়ণ ও মহাভারতকে সাধারণ বাঙালীর বোধগম্য করে তুলেছিলেন, তেমনি মালাধরও শ্রীমদ্ভাগবতকে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদে পরিণত করে-ছিলেন। সম্ভবত ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি এই অমরকাব্য রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় তৎকালীন সহজ ও সরল ভাষায় 'পয়ার' ও 'ত্রিপদী' ছন্দে লিখিত ভক্তিবাক্য। এই কাব্যে ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের প্রধান কাহিনীগুলি বর্ণিত হয়েছে। মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত ও ভবিষ্যপুরাণের কিছু কিছু কাহিনীও সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মালাধর নিজেই বলেছেন—

'ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥'

শ্রীমালাধর বলেছেন যে, স্বয়ং ব্যাসদেব এই গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে স্বপ্নাদেশ করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—

'কায়স্থ-কুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥'

তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্বজন॥'

কেবল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নয়, মালাধর বসুর জন্মস্থান কুলীনগ্রাম সম্পর্কেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা॥
গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাহাঁ এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত॥
তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন বহুদূর॥'

স্বাভাবিকভাবেই কুলীনগ্রাম দর্শনের একটা প্রবল বাসনা দেখা দিয়েছিল আমার মনে। ভাদ্রের এক বর্ষণমুখর দিনে গিয়েছিলাম সেই পুণ্যতীর্থে। কিন্তু গভীর হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছি। মালাধর বসুর বসতবাটি প্রায় ভগ্নস্তূপে পরিণত। তাঁর বংশধররা কেউ আর বাস করেন না সেখানে। দৌহিত্র-বংশধর একজন আছেন বটে, কিন্তু তিনি মালাধর সম্পর্কে তেমন কোন আলোকপাত করতে পারলেন না।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা, ভক্ত-বৈষ্ণবরা এবং আমাদের জাতীয় সরকার এই সুমহান সাধক-কবির স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেন নি। প্রবল বৃষ্টির ভেতরে পাঁচ-ছ' মাইল কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে পুনরায় জেনে এসেছি—বাঙালী বড়ই আত্মবিস্মৃত এবং অকৃতজ্ঞ জাতি।

তাহলেও আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করব, সুযোগ-সুবিধে হলে আপনারা অবশ্যই একবার ঘুরে আসবেন এই

সুপ্রাচীন গ্রামটি। যাবার রাস্তা মোটেই কঠিন নয়। মেমারি থেকে বাসে চড়ে রাণাপাড়া মোড়ে নেমে মাত্র মাইল দু'য়েক হেঁটে পৌঁছন যায় কুলীনগ্রামে। যাওয়া যায় জৌগ্রাম স্টেশন থেকে। এপথে তিন মাইলের মতো হাঁটতে হয়।

যেতে বলছি কারণ, কুলীনগ্রামে মালাধর বসুর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করা হলেও সেখানে রয়েছে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাট। কথিত আছে নামাচার্য শ্রীহরিদাস চারমাস কুলীনগ্রামে বাস করে পরমানন্দে হরিভজন করেছিলেন। স্থানীয় ডাক্তার ত্রিগুণেন্দ্রনাথ মিত্র ও তাঁর ছোটভাই ভূতেন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই পুণ্যস্থান এখন একটি পরম রমণীয় আশ্রমে পরিণত।

সহসা কীর্তন থেমে যায়। বাস্তবে ফিরে আসি—কুলীনগ্রাম থেকে মধু-বৃন্দাবনে।

তাকিয়ে দেখি কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া একটা মাঠের মাঝে থেমে গেছে আমাদের শোভাযাত্রা। সামনেই শ'দু'য়েক ফুট উঁচু একটি পাথুরে টিলা।

মথুরা মহারাজ পাহাড়টির দিকে ইশারায় করে বলেন, "এরই ওপরে রয়েছে সেই ব্যোমাসুরের গুহা।"

বুঝতে পারছি তিনি এবারে গল্প বলবেন। তাই তাড়াতাড়ি আমরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াই। মথুরা মহারাজ শুরু করেন—

"শ্রীকৃষ্ণ এখানেই বালকরূপী ব্যোমাসুরকে বধ করেছিলেন। ভাগবতকার দশম স্কন্ধের সাঁইত্রিশ অধ্যায়ে সে লীলাকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঐ অধ্যায়েই তিনি কেশীদৈত্য বধের কথা বলেছেন। বৃন্দাবনের কেশীঘাটে বসে আমি সে কাহিনী বলেছি।* কাজেই সে-কথা থাক্, এখন ব্যোমাসুরের কথাই বলা যাক্।

"ব্যোমাসুর হল ময়দানবের ছেলে। কেশীবধের পরে একদিন কানাই যখন সখাদের সঙ্গে খেলা করছেন, তখন ব্যোমাসুর গোপ-

*'ব্রজপর্ব' দ্রষ্টব্য।

বালকের রূপ নিয়ে এখানে এলো। তাঁরা তখন 'নিলায়ন' খেলা খেলছিলেন। নিলায়ন অর্থ চোর্যবস্তুকে গোপন করে রাখা। সখারা কেউ সেজেছেন মেষ, কেউ মেষপালক, আবার কেউ বা মেষচোর। ঠিক হয়েছে চোরেরা চুরি করে মেষ লুকিয়ে রাখবে। আর মেষপালকরা চোরাই মেষ খুঁজে আনবে।

"বালকরূপী ব্যোমাসুরও চোর সাজল। সে একটি একটি করে মেষরূপী সখাদের নিয়ে যেতে থাকল ঐ গুহায়। প্রত্যেকবারই সে একখানা পাথর দিয়ে গুহার মুখটা বন্ধ করে রেখে আসে। ফলে মেষপালকরা তাদের মেষরূপী সখাদের খুঁজে পান না।

"এইভাবে যখন মাত্র চার-পাঁচটি বালক বাকি রয়েছে, তখন কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। চিনতে পারলেন ব্যোমাসুরকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে আক্রমণ করলেন। ব্যোমাসুর তার স্বরূপ প্রকাশ করল। বিশাল এক দানবের রূপ নিয়ে সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমরে লিপ্ত হল। কিন্তু পেরে উঠল না। কৃষ্ণ কিছুক্ষণের মধ্যেই মেরে ফেললেন তাকে। তারপরে তিনি ঐ গুহার মুখ থেকে পাথর সরিয়ে সখাদের উদ্ধার করলেন। সখাসহায় শ্রীকৃষ্ণ সদলবলে ব্রজে ফিরে গেলেন।"

মথুরা মহারাজ থামতেই জানকী বলে ওঠে, "আমরা একবার ওপরে গিয়ে গুহাটা দর্শন করে আসব না মহারাজ?"

"না, মা! দরকার নেই। পাহাড়টা বড্ড খাড়া। পড়ে গেলে বিপদ হবে। তার চাইতে এখান থেকেই প্রণাম কর।"

জানকী কোন প্রতিবাদ করে না। অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে সে-ও প্রণাম করে পাহাড়টিকে।

প্রস্তাবটা ভাল লাগে না আমার। যে গুহাটিকে কেন্দ্র করে এমন একটি জনপ্রিয় কাহিনী যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে, তার এত কাছে এসেও একবার ভেতরে ঢুকব না!

তাই সবিনয়ে মথুরা মহারাজকে বলি, "আমি একবার ওপর থেকে ঘুরে আসি।"

"না মশায়!" মথুরা মহারাজ আপত্তি করেন। বলেন, "পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবেন।"

হেসে উত্তর দিই, "মহারাজ, আমি নিয়মিত হিমালয়ে যাই। আমার পাহাড়ে চড়া অভ্যেস আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

মহারাজ আর আপত্তি করেন না। আর আশ্চর্য, আমার দেখাদেখি আরও কয়েকজন বলে ওঠেন,—"আমরাও একবার চেষ্টা করি মহারাজ!" এবং তাদের মধ্যে বৌদি ও জানকী রয়েছে। এমন কি সেই দক্ষিণ-ভারতীয় ভদ্রলোক তাঁর ছ'বছরের ছেলেটিকে পর্যন্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন।

মথুরা মহারাজ বুঝতে পারলেন আর বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। তাই তিনি শুধু বললেন, "দেখবেন, পাহাড়টা কিন্তু যেমন খাড়া, তেমনি পিচ্ছিল। খুব সাবধানে উঠবেন।"

সহযাত্রীরা সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমাকে অনুসরণ করেন।

বাধ্য হয়ে আমাকে সবার শেষে থাকতে হয়। পথ দেখিয়ে ও হাত ধরে একসময় সবাইকে নিয়ে উঠে এলাম গুহাটির সামনে—ব্যোমাসুরের গুহা।

দেখবার তেমন কিছুই নেই। ছোট একটি সাধারণ গুহা। তাহলেও শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। ভেতরে ঢুকে দণ্ডবৎ করি।

তারপরে বসে পড়ি গুহার মেঝেয়। একদিন হয়তো কৃষ্ণের সখারাও এইভাবে এখানে বসে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করেছিলেন। ভাবছিলেন দুষ্ট-দমন কৃষ্ণ কখন এসে দুষ্ট ব্যোমাসুরের কবল থেকে উদ্ধার করবেন তাঁদের?

পাহাড় থেকে নেমে এসে দেখি কেষ্টপ্রভু ভক্তিরত্নাকর থেকে কীর্তন ধরেছেন—

'চন্দ্রসেন পর্বতে এ পিছলিনী শিলা।
এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা॥

ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব পর্বত উপরে।
পিছলি নামএ ঐছে পুনঃ পুনঃ করে॥'

জনৈক ব্রহ্মচারী জানালেন, "এই পাহাড়টার ওপাশেই পিছল-পাহাড়ী। শ্রীকৃষ্ণ সখীদের সঙ্গে সেখানে পিছল-খেলা খেলেছিলেন। সবাই দর্শন করে এসেছে, আপনারাও ঘুরে আসুন। তাড়াতাড়ি যান। বেলা পড়ে এলো। এবারে ফিরতে হবে।"

"পিছল-খেলা কি প্রভু?" জানকী সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে।

"কীর্তন শুনলে না?"

"শুনলাম, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।" জানকী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

ব্রহ্মচারী বলেন, "পিছল-খেলা জান না, ইংরেজীতে যাকে বলে স্লিপ্—স্লিপ্ খাওয়া। ছোটবেলায় কলকাতার পার্কে স্লিপ্ খাওনি!"

"খেয়েছি বৈকি। ও, কৃষ্ণ বুঝি সখীদের সঙ্গে সেই রকম স্লিপ্ খেয়েছিলেন ওখানে!"

"হ্যাঁ। তবে সেটা টিন কিংবা সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি নয়, একখানি মসৃণ রঙীন পাথর।"

"ভারী মজার তো!"

"হ্যাঁ, যাও! তাড়াতাড়ি গিয়ে দর্শন করে এসো।

ব্রহ্মচারীর নির্দেশিত পথে আমরা হেঁটে চলি। বেশিদূর হাঁটতে হয় না। একটু বাদেই উপস্থিত হলাম পিছল-পাহাড়ীতে।

পনেরো-বিশ ফুট লম্বা একখানি মসৃণ রঙীন পাথর। আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। তার ওপরে একদিকে খাঁজ-কাটা। সেই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উঠে এলাম ওপরে। আমার দেখা-দেখি বৌদি, তারপরে জানকী এবং আরও কয়েকজন। একে একে স্লিপ্-খেয়ে নিচে নেমে এলাম। ভালই লাগল।

কিন্তু একবারে মন ভরল না। অতএব আর একবার। তারপরে আবার। কেবল আমি একা নই, আমরা সকলেই। কৃষ্ণের

কৃপায় আমাদের বয়সটা বোধহয় কমে গিয়েছে। আমরা শৈশবের সেই স্বপ্ন-মধুর দিনগুলি ফিরে পেয়েছি। ছেলেমানুষের মতো মেতে উঠেছি।

কতক্ষণ ধরে এই মাতন চলত কে জানে। হঠাৎ কানে এলো নরেনপ্রভুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, "আরে মশয়, ঘোষবাবু, আপনেও কি পোলাপান হইয়া গেলেন নাকি?"

নরেনপ্রভু শুধু আশ্রমের ক্যাশিয়ার-কাম্-মার্কেটিং ম্যানেজার নন, তিনি গুরুমহারাজের বাল্যবন্ধু। সুতরাং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

অন্যান্য যাত্রীরা বোধহয় আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বিরক্ত হয়ে নরেনপ্রভু নিজেই আমাদের ডাকতে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি নেমে আসি নিচে। বলাবাহুল্য হেঁটে নয়, স্লিপ-খেয়ে। আর তাই বোধকরি নরেনপ্রভু আরও ক্ষেপে গেলেন। কাছে আসতেই বললেন, "আপনার কি মশয়, কোনকালে কাণ্ডজ্ঞান হইব না! আপনে কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ভোগ করলেন!"

"ভোগ! ভোগ করলাম কখন!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

"ভোগ ছাড়া কি? কৃষ্ণ যেখানে সখীগো লগে পিছল খাই-ছিলেন, আপনারাও সেইখানে পিছলাইয়া পড়লেন। এয়ারে ভোগ ছাড়া আর কি কমু?"

অবশেষে আমরা ভোজন-থালিতে এলাম। এটি আজকের শেষ দর্শন। শুধু আজকের নয়, কাম্যবনেরও বটে। আমরা এখান থেকে সোজা ধর্মশালায় ফিরে যাব। সন্ধ্যারতি ও পাঠ-কীর্তনের পরে প্রসাদ। তারপরে বিশ্রাম। ভাবতেও ভাল লাগছে।

কাল সকালেই আমরা বর্ষাণা রওনা হব। সুতরাং কাম্যবনের পাট প্রায় শেষ হয়ে এলো।

পিছল-পাহাড়ী থেকে ভোজন-থালি অনেকটা পথ। একটানা হাঁটতে হয়েছে। আমার সহযাত্রীরা অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। মাঠ

ভেঙে পথ—কোথাও জলাশয় নেই। সকলেই শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত। ক্ষুধার্তও বটে। স্বাভাবিকভাবেই একাদশীর সুস্বাদু প্রসাদ বহুক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছে। ফলে অনেকের অবস্থাই রীতিমত শোচনীয়।

কেউ কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করছেন না। পাছে গুরুমহারাজের কাছে রিপোর্ট চলে যায় এবং তিনি 'আন্‌ফিট্' করে দেন। তাহলে যে পরিক্রমা বন্ধ—পুণ্যার্জনের পালা শেষ।

সুতরাং শ্রান্ত সহযাত্রীরা মরীয়া হয়ে পথ চলছেন। এমন কি তাঁদের অনেকে কীর্তন পর্যন্ত করছেন। বলাবাহুল্য শুধু মুখই নড়ছে, শব্দ বের হয় নি।

যা-ই হোক আমরা নির্বিঘ্নে ভোজন-থালিতে পৌঁছে গিয়েছি। প্রথমেই দর্শন করেছি ব্রহ্মাকুণ্ড। চারিদিক বাঁধানো একটি ছোট জলাশয়। তারই তীরে খানিকটা উঁচুতে মন্দির—ছোট মন্দির।

মন্দির-তোরণের চৌকাঠটি পাথরের। তার মধ্যস্থলে রয়েছে একটি ছোট গর্ত। রাখালরাজা কানাই নাকি এই গর্তের ভেতরেই খাবার রেখে সখাদের সঙ্গে ভোজনলীলা করেছিলেন।

আমাদের সঙ্গেও দেখছি কিছু ফল ও মিষ্টি আনা হয়েছে। এবং তা দিয়ে পূজার আয়োজন চলেছে। অর্থাৎ প্রসাদ পাওয়া যাবে। কৃষ্ণ করুণাময়।

মথুরা মহারাজ বলেন, "পুজো হতে একটু সময় নেবে। চলুন, আমরা ওদিকটায় গিয়ে বসি। ভগবানের সেই অপরূপ লীলার কথা আলোচনা করি।"

নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে পড়লাম সকলে। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"আপনারা জানেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের বনক্রীড়া ও অঘাসুরবধ লীলার কথা কীর্তন করেছেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। মহারাজ বলতে থাকেন, "সেই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পূতনা ও বকাসুরের ছোটভাই অঘাসুরকে বধ করেছিলেন। কংসের পরামর্শে ভীষণ অজগরের চেহারা নিয়ে অঘাসুর এসেছিল এখানে। বিরাট একটা গুহার মত হাঁ করে সে পথের ওপর শুয়ে ছিল। সখারা ভুল করে ভেবেছিলেন, সেটা বৃন্দাবনেরই কোন অপরূপ শোভা। তাঁরা নির্ভয়ে অঘাসুরের মুখের ভেতর ঢুকে পড়েছিলেন। অঘাসুর তবু তাঁদের গ্রাস করে নি। কারণ কৃষ্ণ তখনও তার উদরে প্রবেশ করেন নি।

"কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ এলেন সেখানে। দেখলেন, বৎস ও বয়স্যগণ অঘাসুরের উদরে। তখন তিনিও তার মুখের ভেতর প্রবেশ করলেন। এবং অঘাসুর মুখ বন্ধ করে ফেলবার আগেই তিনি নিজের দেহকে বিরাট থেকে বিরাটতর করে তুললেন। অঘাসুরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। তার ইন্দ্রিয়শক্তি নাশ হল।

"শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজের অমৃতবর্ষী দৃষ্টির দ্বারা বয়স্য ও বৎসগণের জীবনদান করলেন। তাঁদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন অঘাসুরের উদর থেকে। আর তখুনি মৃত অঘাসুরের শরীর থেকে একটা অপূর্ব জ্যোতি বেরিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে মিশে গেল। মুক্তিদাতা শ্রীহরি তাঁর শত্রুকেও মুক্তিদান করলেন।"

একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে বললেন, "বৃন্দাবনে বসে এ কাহিনী আমি বলেছি।* আপনাদের শুধু মনে করিয়ে দেবার জন্যই সংক্ষেপে একটু বলে নিলাম। এবারে আমি শ্রীকৃষ্ণের ভোজন-লীলা অর্থাৎ এই ভোজন-থালির কাহিনী বলছি।"

মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের ভোজনলীলার কাহিনী বলেছেন।

---

* 'ব্রজপর্ব' দ্রষ্টব্য।

"অঘাসুরকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বয়স্যদের নিয়ে এখানে এলেন। তাঁরা এই ব্রহ্মাকুণ্ডে স্নান করলেন। তারপরে কৃষ্ণ বললেন—এসো, গোবৎসদের জল খাইয়ে মাঠে ছেড়ে দিই। তারা ঘাস খেতে থাকুক্ আর আমরা সেই অবসরে এখানে বসে সঙ্গের খাবার খেয়ে নিই।

"সখারা সম্মত হলেন, তাঁরা যে তখন বড়ই ক্ষুধার্ত। তাঁরা বৃত্তাকারে কৃষ্ণের চারিপাশে পংক্তিতে পংক্তিতে আহারে বসে গেলেন।

"প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে খাবার এনেছেন। কিন্তু কেউই থালা নিয়ে আসেন নি। তাই তাঁরা কেউ পাতা, কেউ গাছের ছাল, কেউ বা যে পাত্রে খাবার এনেছেন, সেই পাত্রেই খেতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ ঐ পাথরখানির ওপরে খাবার রেখে খেতে থাকলেন।

"সে এক চমৎকার দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণ বসেছেন মাঝখানে, হাঁটু জোড়া করে। তাঁর কোমরে বেণু, বগলে শিঙ্গা ও পাঁচনি আর হাতে দই-মাখা অন্নের গ্রাস।

"এমন সময় সহসা সখারা দেখতে পেলেন, বাছুরগুলো মাঠে নেই। তাঁরা কৃষ্ণকে খবরটা জানালেন। কৃষ্ণ তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন—ভয় পেয়ো না, খাওয়া থামিও না। তোমরা খেতে থাকো, আমি বাছুরদের নিয়ে আসছি।

"দই-মাখা অন্ন হাতে নিয়েই কৃষ্ণ ছুটলেন বাছুরদের খোঁজে। কি করবেন। ভক্তদের দেওয়া প্রসাদ তো ভগবান ফেলে দিতে পারেন না।"

"অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কৃষ্ণ বাছুরদের সন্ধান পেলেন না। তিনি ফিরে এলেন এখানে। দেখলেন সখারাও নেই। বহু ডাকা-ডাকি করেও কৃষ্ণ সখাদের সাড়া পেলেন না।

"ভক্তদের বিরহে ভক্তবৎসল ভগবান আকুল হলেন। তিনি তখন শুধু সঙ্গীহীন নন, তিনি ভক্তহারা।

"এদিকে মধু-বৃন্দাবনের পথে ও প্রান্তরে গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। গোষ্ঠবিহারীর গোষ্ঠ থেকে ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। কিন্তু তিনি একা কেমন করে ঘরে ফিরে যাবেন? ব্রজবধূরা যে ব্রজবালকদের পথ চেয়ে বসে আছেন! গাভীরা গোবৎসদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে! একা ফিরে গেলে যে আজ ব্রজপুরীর ঘরে-বাইরে কান্নার রোল উঠবে। কিন্তু সখারা কোথায় গেল?

"পরক্ষণেই বিশ্ববিদ জানতে পারলেন, এ সবই ব্রহ্মা ঠাকুরের কাণ্ড। বটে—ভগবান ভাবলেন—আমি আজ এমন লীলা করব যে, ব্রজ-জননীরাও আনন্দিতা হবেন, আবার ব্রহ্মারও উচিত শিক্ষা হবে।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজেকে বৎস ও বৎসপালক এই দ্বিবিধ-রূপে রচনা করলেন। বৎস ও বয়স্যদের যার যেমন রূপ, যার যেমন পাঁচনি শিঙ্গা ও বেণু, যার যেমন চরিত্র গুণ আকার ও বয়স, সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তেমনি রূপ ধারণ করলেন।

"কৃষ্ণ একটি বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে একজন সখাকে বলছেন —এই বাছুরটাকে দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চল্।

"কি চমৎকার লীলা!" মথুরা মহারাজ মন্তব্য করেন, "বাছুরও কৃষ্ণ, দড়িও কৃষ্ণ, আবার সখাও কৃষ্ণ। যিনি বলছেন তিনিও কৃষ্ণ, যাঁকে বলছেন তিনিও কৃষ্ণ, আবার যাঁর সম্পর্কে বলছেন তিনিও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সেদিন নিজেই বৎস, নিজেই পালক, নিজেই কর্তা। আবার তিনি নিজেই ক্রীড়া—আত্মক্রীড়। নিজের আত্মার সঙ্গে নিজেই ক্রীড়া করছেন—'বাসুদেবঃ সর্বম্'।

"ব্রজবধূরা বেণুগীতি শুনে ছুটে এলেন। তাঁরা আপন আপন পুত্রদের কোলে তুলে নিলেন। অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ের মাঝে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন্য পান করাবার সাধ সুপ্ত ছিল সকল ব্রজ-জননীর অন্তরে। তাঁদের সে সাধ পূর্ণ হল। গাভীরাও বৎসরূপী কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে পুলকিতা হয়ে উঠল।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা শব্দহীন। শুধু তাঁর মুখের দিকে রয়েছি তাকিয়ে। মহারাজ একটু নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসে নিলেন। তারপরে আবার বলতে থাকলেন—

"একবছর ধরে কৃষ্ণ এই অপরূপ লীলা করলেন। একবছর বাদে ব্রহ্মা আবার এলেন মর্ত্যলোকে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন—বৎস ও বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। অথচ তিনি যাঁদের অপহরণ করেছিলেন, তাঁরা তেমনই মায়াশয়ানেই রয়েছেন। তিনি তখন বৎস ও বয়স্যদের দু'টি দল দেখতে পেলেন—একটি তিনি নিজে লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন, আরেকটি কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। দু'টি দলের কোন্‌টি কৃত্রিম, আর কোন্‌টি প্রকৃত, ব্রহ্মা তা বুঝতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করতে এসে ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হয়ে গেলেন।..."

"বা! ভারী মজা তো!" মাঝখান থেকে জানকী বলে ওঠে।

মথুরা মহারাজ জানকীর দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসেন। বলেন, "হ্যাঁ, মা! কৃষ্ণলীলা এমনি মজার।"

একটু থেমে তিনি আবার বলতে থাকেন, "যাক্‌ গে, যে কথা বলছিলাম। মোহিত ব্রহ্মা দেখলেন—বৎস ও বয়স্যগণ প্রত্যেকেই এক-একজন নারায়ণ। অগণিত নারায়ণ দর্শন করে ব্রহ্মা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এবং তারপরেই তিনি দেখতে পেলেন—বালকরূপী কৃষ্ণের কোমল অঙ্গে সমস্ত নারায়ণ বিলীন হয়ে গেল। আবার দেখলেন—কৃষ্ণের হাতে গোপবালকদের উচ্ছিষ্ট। তিনি বৎস ও বয়স্যদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

"পিতামহ ব্রহ্মার সহ্যশক্তি শেষ হয়ে গেল। তিনি আর সামলাতে পারলেন না। তাই ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন,

"—হে স্তবনীয়, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার এই মধুর মূর্তিটি আমার অন্তরের অন্তরলোকে চিরবিরাজ করুক।

"—আমার প্রতি অনুগ্রহ করেই তুমি এই অপরূপ লীলা করছো, তোমার বৎস ও বয়স্যদের রূপ ধারণ করেছো। কিন্তু তোমার অন্যান্য রূপের মতো এ-রূপও দুর্জ্ঞেয়। নিখিল বিশ্ব তোমার অধীন, অথচ তুমি ভক্তের অধীন। কারণ ভক্তি পরম কল্যাণের পথ। যে ভক্ত ভক্তিপ্লুত অন্তরে তোমার ভজনা করে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই তোমাকে জয় করা সম্ভব।

"—আমি মূঢ়, আমি অন্ধ, আমি অভিমানী। তুমি প্রভু, আমি দাস। রজঃ ও তমো গুণের জন্য আমি দাস্য থেকে বিচ্যুত। কিন্তু তুমি তো সর্বদাই প্রভুস্বরূপে স্থিত। অপরাধ করাই আমার স্বভাব, আর ক্ষমা করাই তোমার প্রকৃতি। অতএব আমাকে তোমার ক্ষমা করতেই হবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

"—গর্ভস্থ সন্তান মাতৃ-উদরে পদাঘাত করে বলে কি জননী তাকে ক্ষমা করেন না? আমিও তো তোমারই সন্তান। প্রলয়-পয়োধিজলে ত্রিভুবন যখন ডুবে গিয়েছিল, তখনই তো নারায়ণের নাভিকমলে আমার জন্ম হয়েছে। তুমি নন্দনন্দন হলেও নারায়ণ। কারণ 'নার' শব্দের অর্থ নরসমূহ, আর 'অয়ণ' মানে আশ্রয়। আত্মারূপে তুমি প্রত্যেক প্রাণীর আশ্রয়, তুমিই তো নারায়ণ। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

"হয়ে গেল!" মথুরা মহারাজ থামতেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানকী বলে ওঠে।

মথুরা মহারাজ মৃদু হাসেন। বলেন, "নারে না, আরও আছে।"

"বলুন তাহলে।" জানকী আবদার করে।

মথুরা মহারাজ আরম্ভ করেন, "এইভাবে ব্রহ্মা বহুক্ষণ ধরে বহু কথা বলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন। অবশেষে তিনি করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন—

'শ্রীকৃষ্ণ! বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-জোষদায়িন্!
ক্ষ্মা-নির্জর-দ্বিজ-পশূদধি-বৃদ্ধি-কারিন্!
উদ্ধর্ম-শার্বর-হর! ক্ষিতি-রাক্ষস-ধ্রুগাকল্পমার্কমর্হন্!
ভগবন্! নমস্তে॥'

"—হে কৃষ্ণ! তুমি সূর্যের মতো বৃষ্ণিবংশরূপ পদ্মের সুখদাতা, তুমি চন্দ্রের মতো দেবতা, তুমি ব্রাহ্মণ পশু ও পৃথিবীরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিকারক। তুমি পাষণ্ড-ধর্মরূপ অন্ধকারের বিনাশকারী, তুমি ক্ষিতি রাক্ষস ও কংস প্রভৃতির শাসক। বৈকুণ্ঠ থেকে সূর্য পর্যন্ত তুমি সকলেরই পূজনীয়। হে ভগবান! আমি আকল্পকাল তোমাকে নমস্কার করি।"

"তারপরে ব্রহ্মা তিনবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন। এবং প্রণাম করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন অপহৃত বৎস ও বয়স্যদের নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন। মায়াবদ্ধ ব্রজবালকগণ জানতেই পারলেন না যে, ইতিমধ্যে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাঁরা ঘরে ফিরে বলতে থাকলেন—কৃষ্ণ আজ অঘাসুরকে বধ করে···"

থামতে হল মথুরা মহারাজকে। কারণ ইতিমধ্যে পুজো শেষ হয়ে গেছে। কেষ্টপ্রভু প্রসাদ নিয়ে এসেছেন· পানিফল কলা আপেল ও সন্দেশ।

মনে মনে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিই। বলি—তুমি এখানে ভোজন-লীলা করেছিলে বলেই তো এই খিদের পেটে আমরা এমন সব উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজন করতে পারছি। তুমি পরম-পূজনীয়। আমি তোমাকে নমস্কার করি।

প্রসাদ হাতে নিলাম। কিন্তু মুখে দিতে পারলাম না। তার আগেই ভক্তি মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন—

"এই ভোজন-থালিতে কৃষ্ণ ভোজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ভোজন নিজের জন্য নয়। তিনি তো সর্বশক্তিমান ভগবান, তাঁর আবার ভোজনের প্রয়োজন কি?"

একবার থামেন ভক্তি মহারাজ। না, কেউ কোন উত্তর দেন না।

কারণ ভক্তি মহারাজ কেবল গুরুমহারাজের গুরুভাই এবং প্রবীণ সন্ন্যাসীই নন, তিনি পণ্ডিত এবং তেজী মানুষ, একটুতেই রেগে যান। সুতরাং নির্ভুল উত্তর না হলে রক্ষে রাখবেন না। তাই সবাই নিরুত্তর।

একটু বাদে ভক্তি মহারাজ নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন, "ভক্তদের কৃপা করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ভোজনলীলা করেছিলেন।"

ঠিকই বলেছেন ভক্তি মহারাজ। আমি ভক্তিহীন অবৈষ্ণব হলেও ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছি। তাই তো ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আমাকেও কৃপা করলেন। খিদের সময় প্রসাদ পেয়ে গেলাম। অতএব প্রসাদে মনঃসংযোগ করি।

॥ ছয় ॥

রাধারাণীর পিত্রালয় বর্ষাণা। অনেকের মতে বর্ষাণা শব্দটি বৃষভানু-পুর নামটির অপভ্রংশ। শ্রীরাধার যখন জন্ম হয়, তখন রাজা বৃষভানু মথুরার কাছে অবস্থিত রাবেল নগরীর নরপতি ছিলেন। এই পরিক্রমার শেষদিকে আমরা রাবেল দর্শন করব।

কথিত আছে কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মহারাজা নন্দ যখন গোকুল থেকে নন্দগ্রামে চলে যান, তখন রাজা বৃষভানুও রাবেল থেকে এখানে এসে এক নতুন জনপদের পত্তন করেন! নাম রাখেন বৃষভানুপুর।

আবার কারও মতে বর্ষাণা ব্রহ্মা-সানু শব্দটির অপভ্রংশ। ব্রহ্মা-সানু বা ব্রহ্মাচল মানে ব্রহ্মার পর্বত। ব্রজমণ্ডলে তিনটি পাহাড় আছে—বিষ্ণুলোক পর্বত অর্থাৎ গিরিরাজ-গোবর্ধন, নন্দগ্রামের নন্দীশ্বর পর্বত আর বর্ষাণার এই ব্রহ্মাচল।

যে শব্দ থেকেই নামটি এসে থাকুক, বর্তমানে এই রমণীয় জনপদ বর্ষাণা নামেই পরিচিত। বর্ষাণা এখন মথুরা জেলার একটি মফঃস্বল শহর। ২৭°৩৯′ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭°২৩′ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহরের বর্তমান জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো।

মথুরা থেকে মোটরপথে বর্ষাণার দূরত্ব ৩২ মাইল। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

আমরা এসেছি পায়ে হেঁটে। গতকাল আমরা ছিলাম কাম্যবনে। আজ খুব সকালে সেখান থেকে রওনা হয়ে সাড়ে আট মাইল হেঁটে এই মাত্র বর্ষাণায় পৌঁছলাম। আসার পথে আমরা বেশ কয়েকটি পুণ্যস্থান দর্শন করেছি। তার মধ্যে কদমখণ্ডী, আলতাপাহাড়ী ও দেহকুণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কদমখণ্ডী একটি কেলিকদম্ব শোভিত সুরম্য বন। শ্রীকৃষ্ণ নাকি সেই বনে বসে রাধারাণী ও সখীদের সঙ্গে পাশা খেলতেন। বনভূমিটি পাশা খেলবার মতো শান্ত এবং সুন্দরই বটে।

আলতাপাহাড়ীতে বসে রাধা আলতা পরেছিলেন। সেই রঙীন পাহাড়টি দর্শনের সময় স্থানীয় পাণ্ডারা কয়েকখানি লাল পাথর দেখিয়ে বলেছেন—এই হল রাধারাণীর আলতা পরার চিহ্ন। আমরা সবাই নীরব রয়েছি, কিন্তু জানকী একটু মুচকি না হেসে পারে নি। ভাগ্যিস পাণ্ডারা দেখতে পান নি!

দেহকুণ্ড একটি ছোট জলাশয়। একদিন রাধা যখন ঐ কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর কাছে দান চাইলেন। রাধার হাতে তখন কিছুই ছিল না। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণপ্রার্থীকে তো শুধুহাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। তাই তিনি তখন নিজেকেই দান করলেন।

অন্তর্যামী কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন ঘটনাটা। তিনি ছুটে এলেন কুণ্ডের তীরে। ব্রাহ্মণকে শ্রীমতীর দেহ-পরিমিত স্বর্ণ দান করে তিনি রাধার দেহদান ফিরিয়ে নিলেন।

অতএব ঐ কুণ্ডের তীরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আমাদের সোনা দান করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য আমরা তাঁদের সে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি নি।

বর্ষাণায় পৌঁছেই আমরা প্রথম এলাম ভানুখোর বা বৃষভানুকুণ্ডের তীরে। বেশ বড় কুণ্ড—বাঁধানো ঘাট। রাধারাণী নাকি নিয়মিত স্নান করতেন এই কুণ্ডে।

কুণ্ডের পুণ্যবারি স্পর্শ করে আমরা উঠে এলাম তীরে। তারপরে বড় রাস্তা ধরে চললাম এগিয়ে। সামনেই দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মাচল পর্বত। আমরা সেদিকেই চলেছি।

ব্রহ্মাচলের চারটি শিখর। চার শিখরে চারটি মন্দির—দানগড় মানগড় বিলাসগড় ও ময়ূরকণ্ঠী। স্থানীয় ভাষায়—লাড়লিজী, মান-

মন্দির, দরগেহ ও মোর-কুঠি। লাড়লিজী হল শ্রীরাধিকার স্থানীয় নাম।

পথের দু'পাশেই উঁচু দেয়াল। মাঝে মাঝে নিমগাছ। একটু বাদেই কিন্তু বাঁদিকের দেয়ালটা শেষ হয়ে গেল, ডানদিকেরটি কেবল সঙ্গী হয়ে রইল আমাদের।

অবশেষে বুঝতে পারলাম সেটি শুধু দেয়াল নয়, একটা সুবিরাট বাড়িও বটে। পাণ্ডা বললেন—কাট্‌রা।

না, বাজার নয়, বস্তি। বহুলোক বাস করেন। এটি বর্ষাণার বৃহত্তম ফ্ল্যাট-বাড়ি।

কাট্‌রার সামনেই পথের পাশে ডুলি ভাড়া পাওয়া গেল। ভালই হল, অশক্ত সহযাত্রীরা আজ আর আমার গলগ্রহ হবেন না।

সেদিন গিরি-গোবর্ধন পরিক্রমার সময় বড়ই ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। সেদিন সকালে আমরা রাধাকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে দুপুরের আগে গোবর্ধন শহরে পৌঁছলাম। দর্শন ও প্রসাদের পরে শুরু হল গিরিরাজ-গোবর্ধন পরিক্রমা। পথে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আর তখুনি গুরুমহারাজের খেয়াল হল, কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পেছনে পড়ে গেছেন। যেহেতু একমাত্র আমার কাছেই টর্চ ছিল, সেইহেতু পিছিয়ে-পড়া যাত্রীদের নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়ল আমারই ওপরে।

তখন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং সংকীর্তন শোভাযাত্রা দুর্বার বেগে এগিয়ে গেল। সেই অচেনা বিজন বনে আমি একাকী অপেক্ষা করতে থাকলাম—পিছিয়ে-পড়া সহযাত্রীদের পথ চেয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ বাদে সহসা জানকী উপস্থিত হল সেখানে। অবাক্ হলাম –সে তো শোভাযাত্রার সঙ্গে ছিল! হঠাৎ এভাবে একা একা পিছিয়ে এলো কেন?

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—সেকি! তুমি কোথায় চলেছো?

জানকী উত্তর দিল—এখানে। আপনার কাছে।

—কেন ?

—মথুরা মহারাজ যে বললেন, এদিকটায় ডাকাত আছে।

ওর উত্তর শুনে হাসি পেল আমার। বললাম—এদিকটায় ডাকাত আছে বলে, তুমি এই অন্ধকার বিজন বনে একা ছুটে এসেছো আমাকে সাহায্য করতে! একবারও ভেবে দেখলে না, কত বড় দুঃসাহসের কাজ হচ্ছে!

—ভেবেছি। জানকী উত্তর দিয়েছিল।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম,—তবু এলে ?

—হ্যাঁ, না—মানে এই ভয়ঙ্কর বনে আপনাকে একা পেছনে ফেলে আমি কিছুতেই এগিয়ে যেতে পারলাম না।…আমি জানি, এই আসার জন্য আপনাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। এমন কি যাদের সাহায্য করবার জন্য আপনি এত কষ্ট করছেন, তারাও ধর্মশালায় ফিরে গিয়েই আমাদের দু'জনের নামে দুর্নাম রটাবে। আমি দুর্নামকে ভয় করি না। কিন্তু আমার জন্য আপনাকেও অপদস্থ হতে হবে। তবু আমি না এসে পারলাম না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আমরা দু'জনে পিছিয়ে-পড়া সঙ্গীদের নিয়ে নির্বিঘ্নেই মিলিত হয়েছিলাম সবার সঙ্গে। তবে বলাই বাহুল্য জানকী সঙ্গে না থাকলে সেদিন আমাকে খুবই বিপদে পড়তে হত। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, সেদিন রাতেই ফেরার পথে রাধাকুণ্ডের তীরে এসে মানসীকে দেখে জানকী রাগ করে সহযাত্রীদের সঙ্গে চলে গেল। কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে রাধাকুণ্ডে স্নান করবার জন্য যার এত আগ্রহ, সে স্নান না করেই ফিরে গেল গোবর্ধন। আর তারপর থেকে দিন-দুয়েক জানকী কথা বলে নি আমার সঙ্গে। ভরসার কথা, আজ সকাল থেকে যেন তার সেই অভিমান একটু একটু করে গলতে শুরু করেছে।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। তাই আমার অশক্ত সহযাত্রীদের

ডুলি ভাড়া করতে দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছি। আজ আর গিরিরাজ-পরিক্রমার মতো কোন ঝামেলায় পড়তে হবে না। সেদিন তবু ছিল প্রায় সমতল পথ, আজ শুনেছি ক্রমাগত চড়াই-উৎরাই করতে হবে।

আমরা বাজারে এলাম -বর্ষাণার বাজার। বেশ জনবহুল। দুগ্ধজাত দ্রব্যের দোকানই বেশি। তাই তো হবে, রাধারাণী যে ব্রজগোপী।

সহযাত্রীরা সকলেই ক্ষুধার্ত। তার ওপরে একটু বাদেই আবার পাহাড়ে চড়তে হবে। ছোট হলেও পাহাড় তো বটে।

সুতরাং অনেকেই সংকীর্তন শোভাযাত্রা থেকে কেটে পড়লেন— মিষ্টির দোকানে খদ্দের হলেন। বাধ্য হয়ে গুরুমহারাজ পনেরো মিনিট ছুটি মঞ্জুর করলেন।

পেট পুরে রাবড়ি খেয়ে আমরা আবার রওনা হয়েছি ব্রহ্মাচলের দিকে। পথটি আস্তে আস্তে চড়াই হচ্ছে। পথের দু'দিকেই বাড়ি-ঘর। বাঁদিকের ছোট-ছোট বাড়ি—কোনটি একতলা, কোনটি বা দোতলা। আর ডানদিকে সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা। পাণ্ডাজী বলছেন - ব্রহ্মানন্দের বাড়ি। কিন্তু তিনি ব্রহ্মানন্দের কোন পরিচয় দিলেন না।

চার-পাঁচশ' বছর আগেও বর্ষাণা ছিল একটি নেহাৎই গণ্ডগ্রাম। তারপরে রূপ রাম নামে জনৈক ধার্মিক ধনী এখানে লাড়লিজীর মন্দির নির্মাণ করেন। বৃষভানুকুণ্ড-তীরের ভগ্নপ্রায় ছত্রীটিও তাঁরই নির্মিত। ছত্রীটির নাম ছিল জাল-মহল। তিনিই এই বাজারের প্রতিষ্ঠাতা।

রূপ রামের আরও অনেক মহৎ কীর্তি আছে বর্ষাণায়। তার মধ্যে কীরতকুণ্ড ও প্রিয়াকুণ্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীরতকুণ্ড রাধারাণীর মা কীর্তিদাদেবী ও প্রিয়াকুণ্ড বা পিরিপুকুর স্বয়ং রাধারাণীর পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। রূপ রামের এই সব পুণ্যকীর্তি ১৭৭৩-৭৪

খ্রীষ্টাব্দের মুসলমান আক্রমণের সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায়। মানসপটে ভেসে ওঠে মধু-বৃন্দাবনের সেই সকরুণ ইতিহাস। ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি—

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের পরে বহু মারাঠী সর্দার তাঁদের অনুচরদের নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে ব্রজ-মণ্ডলে বাস করতে থাকেন। বর্ষাণা তখন ভরতপুরের জাটরাজা সুরজমলের অধীনে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলারা সুরজমলকে হত্যা করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জওয়াহর জাটরাজ্যের রাজা হলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করবার পরে এক বিশ্বাসঘাতক অনুচর তাঁকে হত্যা করল। মেজভাই রতন সিং তখন জাটরাজ্যের রাজা হলেন।

রতন ছিলেন একেবারেই অপদার্থ। কিছুদিনের মধ্যেই রূপানন্দ নামে জনৈক গোস্বামী বৃন্দাবনে তাঁকে হত্যা করল। সেজভাই নওয়াল সিং রাজা হলেন। কিন্তু ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে গোবর্ধনের যুদ্ধে ছোটভাই রণজিৎ সিংহের কাছে তিনি পরাজিত হলেন।

জাট রাজবংশের পারিবারিক কলহের সুযোগ নিয়ে মারাঠী সর্দাররা মথুরা দখল করে নিলেন। রোহিলা সর্দার নাজিব খান তাঁদের সাহায্য করতে থাকলেন। মারাঠারা যমুনা পেরিয়ে পুবদিকে এগোতে আরম্ভ করলেন। বাধ্য হয়ে নওয়াল সিং ভাই রণজিতের সঙ্গে সন্ধি করলেন। অবশিষ্ট জাটরাজ্যে মোটামুটি একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

নওয়াল কিন্তু বেশিদিন শান্তিতে রাজত্ব করতে পারলেন না। ভ্রাতৃকলহ বন্ধ হওয়ায় মারাঠা ও রোহিলারা আর হামলা করতে সাহসী হলেন না সত্য, কিন্তু দিল্লীর সম্রাটের উজির নজাফ খাঁ বিরাট এক বাহিনী নিয়ে জাটরাজ্য আক্রমণ করলেন। নওয়াল সিং সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দিলেন, কিন্তু সম্রাটের বাহিনীকে প্রতিহত করতে পারলেন

না। জাটবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। নজাফ তহশিল-সদর ছাতা দখল করে সাহারে পৌঁছলেন।

নওয়াল তখন কোটবনে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন নজাফকে আর এগোতে দিলে কোটবন রক্ষা সম্ভব হবে না। তিনি সসৈন্যে এগিয়ে এলেন। পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে বর্ষাণায় এসে শিবির স্থাপন করলেন—নজাফের বিরুদ্ধে শেষ প্রতিরক্ষা-ব্যূহ গড়ে তুললেন। এটি ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

বর্ষাণায় দু'পক্ষে প্রবল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। নওয়াল কয়েক দিন নজাফের অগ্রগতি রোধ করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না। সৈন্য সংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে নজাফ ছিলেন অনেক বেশি শক্তিশালী। সুতরাং বর্ষাণার যুদ্ধে তাঁরই জয় হল। জাটবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। নওয়াল হাতীতে চড়ে পালিয়ে গেলেন ডিগ্—তৎকালীন জাটরাজ্যের রাজধানী।

এবং রাজা পালিয়ে যাবার পরেই বর্ষাণার সেই সকরুণ ইতিহাস শুরু হল। নিরপরাধ ও অসহায় নরনারীর কান্নায় শ্রীমতী-তীর্থ বর্ষাণার আকাশ-বাতাস ব্যাপ্ত হল।

কেবল কাফের হত্যা ও নারীর ইজ্জত নিয়ে ক্ষান্ত হলেন না নজাফ খাঁ। তিনি শুনেছিলেন, বর্ষাণার কোন এক মন্দিরের নিচে কুবেরের ধনভাণ্ডার লুকানো আছে। তাই ধনলোভী নজাফ গুপ্তধনের খোঁজে বর্ষাণার প্রায় সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে ফেললেন।

সেই ধ্বংসলীলার কিছু কিছু চিহ্ন আমরা আজও দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘ দু-শ' বছরের ব্যবধানেও মহাকাল সেই লোভী উজিরের কুকীর্তির কলঙ্ক মুছে ফেলতে পারে নি।

"আহা! মা-রাধারাণীর বর্ষাণার কি মনোহর শোভা! চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। দেখো দেখো, তোমরা সবাই দেখো—প্রাণভরে দর্শন করো।"

জানকীর মা-র কথায় অতীতের বর্ষাণা থেকে বর্তমানের বর্ষাণায় ফিরে আসি। ফিরে আসি ইতিহাসের বর্ষাণা থেকে ধর্মীয় বর্ষাণায়।

না, ধর্মান্ধ আক্রমণকারীরা বর্ষাণাকে ধ্বংস করতে পারে নি—শ্রীমতী-তীর্থ বর্ষাণা মুছে যায় নি মানুষের মন থেকে। মনুষ্যত্বের কাছে পশুত্ব হয়েছে পরাজিত।

ধর্মপ্রাণ ধনীদের সহায়তায় ভক্তরা আবার গড়ে তুলেছেন বর্ষাণাকে। যে রমণীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁদের এই গঠনযজ্ঞে প্রেরণা জুগিয়েছে, বৃদ্ধা সহযাত্রী সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিতা হয়েছেন—সবাইকে দেখতে বলেছেন।

ঠিকই বলেছেন—বর্ষাণার প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতই সুন্দর। আমি দেখি—প্রাণভরে দর্শন করি।

আমরা এখন ব্রহ্মাচলের পাদদেশে এসেছি। ঘাস গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া সবুজ পাহাড়। পাহাড়তলীও সবুজ। যে পায়ে-চলা মাটির পথটি বেয়ে আমরা ব্রহ্মাচলের পাদদেশে পৌঁছেছি, সেটিও সবুজ। তার দু'দিকেই শিরীষ, কেলিকদম্ব আর তমালের বিস্তার।

পাহাড় কেটে পথ। মাটি আর বালির বনপথ বেয়ে আমরা সারি বেঁধে ওপরে উঠছি। কিছুদূর চলার পরে মাটি ফুরিয়ে গেল, শুরু হল পাথর—পাথুরে পথ। আমাদের সবারই খালি পা। কাজেই পাথরকুচি পায়ে বিঁধছে—পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু পথের প্রকৃতি পায়ের কষ্ট দূর করে দিচ্ছে। যত ওপরে উঠছি, ব্রহ্মাচল তত বেশি সুন্দর হচ্ছে।

গাছে ছাওয়া রঙীন পাথুরে পথ বেয়ে মিনিট দশেক বাদে আমরা একটি সংকীর্ণ গিরিখাতের মতো জায়গায় উপস্থিত হলাম।

পাণ্ডাজীর নির্দেশে শোভাযাত্রা থেমে গেল—কীর্তন বন্ধ হল। গুরুমহারাজের আদেশে যে যেখানে পারলাম, বসে পড়লাম।

পথের ওপরেই পাশাপাশি আট-দশ ফুট উঁচু দু'টি পাথরের স্তূপ।

দুয়ের মাঝে ফুট দু'য়েক চওড়া একটি গলি। গলি বলতে আমরা যেমন বুঝি, তেমন নয় কিন্তু। তার চেয়ে ফাটল বললে বোধকরি ঠিক বলা হয়। মানে পর্বতারোহণের ভাষায় যাকে বলে 'চিম্‌নি'। ভাগ্যিস আমার পর্বতারোহী বন্ধুরা সঙ্গে আসে নি, তারা তাহলে এখন ব্রজ-পরিক্রমা ছেড়ে 'চিম্‌নি ক্লাইম্বিং' শুরু করে দিত।

বুঝতে পারছি এবার আমাদের একজন একজন করে ঐ ফাটলের ভেতর দিয়ে গলে যেতে হবে। কিন্তু যাব কেমন করে? কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে যে ফাটলের মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হাত বাড়িয়ে বলছে - মহারাজ, দান দেও।

পাণ্ডাজী বলেন, "এই জায়গাটার নামই দানগড়। কৃষ্ণ-ভগবান এখানে দাঁড়িয়েই সখীদের কাছ থেকে দান গ্রহণ করেছিলেন। ঐ তো দানবিহারীর ছোট মন্দির।" তিনি হাত দিয়ে পথের পাশে একটু উঁচুতে অবস্থিত মন্দিরটি দেখিয়ে দেন। বলেন, "আপনারাও প্রথমে ঐ মন্দির দর্শন করুন, তারপরে এই ব্রজবাসী কিশোর-কিশোরীদের দান দিয়ে দানগড় পেরিয়ে ওপারে চলুন।"

ব্যস, সহযাত্রীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। উদ্দেশ্য কে আগে গিয়ে দানবিহারীকে প্রণাম জানাবেন। পড়ি কি মরি করে সবাই ওপরে ছুটলেন।

তাড়াতাড়ি সরে আসি একপাশে। একটি কেলিকদম্ব গাছের ছায়ায় এসে বসি। অনায়াসে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাবে। এরপরে শতাধিক সহযাত্রী একে একে এই গলি পেরোবে। পুণ্যার্জনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হোক্, তারপরে আমি দর্শন করব দানবিহারীজীকে। ততক্ষণে বরং মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের সেই অপূর্ব লীলাটির কথা একবার স্মরণ করা যাক্। ভেবে চলি—

সখীদের সঙ্গে দুধ ঘি ও ননী নিয়ে শ্রীরাধিকা মথুরার হাটে চলেছেন। লীলারসময় শ্রীকৃষ্ণ সহসা এখানে এসে তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন।

রাধা বললেন—পথ ছাড়ো।

কৃষ্ণ বললেন—না।

রাধা জিজ্ঞেস করলেন…কেন ?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—কংসরাজ যে দুধ ঘি ও ননীর ওপর কর ধার্য করেছেন।

—তাতে তোমার কি ? তুমি কেন পথ আগলে দাঁড়িয়েছো ?

—বারে, রাজা কংস যে আমাকেই এ পথের দানী নিযুক্ত করেছেন।

—তা বটে, যেমন রাজা তার তো তেমনি দানী হবে। বুঝতে পারছি, রাজপথে রাহাজানি করার জন্যই কংস তোমায় নিযুক্ত করেছে। কিন্তু আমাদের কাছে দানযোগ্য বস্তু যেমন নেই, তেমনি আমরা তোমাকে মানি না। তুমি পথ ছাড়ো, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণ বললেন—কি, এত গর্ব! তোমরা দানীকে মানছো না! ঠিক আছে, আমিও দান না পেলে তোমাদের পথ ছাড়ব না।

রাধা-কৃষ্ণের কলহ দেখে সখীদের হাসি পায়। তাঁরা সহাস্যে কৃষ্ণকে বলেন—আচ্ছা ঠিক আছে। বল, তুমি কি দান চাও ?

কৃষ্ণ বললেন—যা চাই, তা তো তোমরা দিতে পারবে না। তবে তোমাদের সঙ্গে অনেক দিনের জানা-শোনা। আমি তোমাদের মতো নই, আমার চক্ষুলজ্জা আছে। আমি শুধু তোমাদের কাছে এক লক্ষ দামের গজমোতি হার, দু'লক্ষ 'সঁীথায় সিন্দূর', তিন লক্ষ 'কেশপাশ', চার লক্ষ পায়ের 'নূপুর' আর—

'কুসুম-কবরী ঝুরি পাঁচ লক্ষ দান তারি
নহে কহ যে হয় উচিত।
মোরে কঁরো রাজসেবা কাঁচুলিতে লুকা কিবা
দেখাইয়া করাও পরতীত ॥'*

* কবি অনন্ত

মনের অবস্থা যা-ই হোক্, কৃষ্ণের কথায় রাধা রাগের ভান করে বললেন—নির্লজ্জ ! আর কেনই বা হবে না, গোরু নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে লজ্জা-সরম তো সব ধুয়ে ফেলেছো, এখন আবার দানী সেজে আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছো।

কৃষ্ণও কপট রোষে জবাব দিলেন—ওহে জটিলার বধু ! তোমাকেও সবাই জানে। বড় বেশি গর্ব হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। পসরা নিয়ে যাচ্ছো, অথচ দানীকে ভয় করছো না। বেশ, আমিও বলছি···

'এ রূপ-যৌবনে নানা আভরণে
যাইছ মথুরা বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে ॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রাখ্যাছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে ॥'*

রাধা বুঝতে পারলেন এর সঙ্গে বিবাদ করা বৃথা। তাই তিনি শান্ত স্বরে বললেন—

'সীঁথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
রঙ্গণ আলতা পায়।
(ই কি) বিকি কিনির ধন নারীর যৌবন
ইথে কার কিবা দায় ॥'*

কৃষ্ণ বললেন—সে দায় তোমার।

রাধা বললেন—আমার দায় ! হায় হায় ! ঘরে আমার বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী, আর দেহের বৈরি হল যৌবন। এ ছার জীবন রেখে কি লাভ ? তার চেয়ে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মনের তাপ মেটাই।

---

* কবি জ্ঞানদাস

কৃষ্ণ তখন হেসে বললেন—রাই, তার চেয়ে এক কাজ করো।

—কি ? রাধা চোখ মেলে কৃষ্ণের দিকে তাকালেন। দু'জনের শুভদৃষ্টি হল।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—যমুনা শ্যামাঙ্গিনী, আমি শ্যামাঙ্গ। কাজেই তুমি যমুনায় ঝাঁপ না দিয়ে তোমার অপরূপ রূপ-যৌবন আমাকে সমর্পণ করো। তাতে যেমন তোমার মনের তাপ মিটবে, তেমনি আমার জীবনও ধন্য হবে।

রাধারাণী তখন রাধারমণের বুকে মুখ লুকিয়ে মধুর কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

'শুন হে নাগর দয়ার সাগর
দয়া না ছাড়িহ তুমি।
সকল ছাড়িয়া তোমার লাগিয়া
দধির পসারিণী আমি॥'

দানগড় পেরিয়ে বেশ কিছুক্ষণ একটানা উৎরাই ভেঙে আমরা পাহাড়টির অপর পাশে নেমে এলাম। তেমনি বনময় পথে চললাম এগিয়ে।

কিছুক্ষণ পরেই ছোট একটি গ্রাম - ছবির মতো সুন্দর। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকখানি মাটির ঘর। পাহাড় সবুজ, সমতল সবুজ, এমনকি ঘরের চালেও সবুজের ছড়াছড়ি। তাই তো হবে, এ যে রাধারাণীর বর্ষাণা—অনন্ত যৌবনের পরমতীর্থ। সবুজ যৌবনের প্রতীক।

পায়ে-চলা মাটির পথ পেরিয়ে পৌঁছলাম গ্রামের প্রান্তে—গোপালজীর মন্দিরে। পথের পাশে একটু উঁচুতে মাঝারী মন্দির।

দর্শন করে বনপথ বেয়ে আবার এগিয়ে চলল সংকীর্তন শোভা-যাত্রা—শতাধিক নারী-পুরুষের মিলিত পুণ্য-পরিক্রমা।

গোপালজী মন্দিরের পেছনে বনের সৌন্দর্য আরও রমণীয়। এ তো বন নয়, কুঞ্জবন—রাধাকৃষ্ণের রাসস্থলী।

পাণ্ডাজী বললেন, "এ বনের নাম গহ্বরবন। এটি একটি উপবন।"

নাম যা-ই হোক্, আমি ভাবি—এমন রমণীয় স্থান খুব কমই দেখেছি। জানা-অজানা গাছগুলি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে। আমরা তারই তলা দিয়ে পথ চলছি। দুর্বাছাওয়া শ্যামল কোমল ঝক্ঝকে পথ—মনে হচ্ছে সবুজ গালিচা।

ফুলের গন্ধ, ময়ূরের নাচ ও পাখির গান—সব মিলিয়ে স্বর্গীয় পরিবেশ। একটা অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয় ভরে উঠেছে। উৎফুল্ল অন্তরে চলেছি এগিয়ে—চলেছি মধু-বৃন্দাবনের পথে!

হঠাৎ পাণ্ডাজী বলে ওঠেন, "এই হচ্ছে কৃষ্ণকুণ্ড।"

থেমে গেল শোভাযাত্রা, থেমে গেল সংকীর্তন। সহযাত্রীরা ছুটলেন ঘাটে—কৃষ্ণকুণ্ডের জলস্পর্শ করতে, পুণ্য সঞ্চয় করতে। ওঁরা তো আমার মতো ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব নন।

কিন্তু জানকী কেন ছুটল ওঁদের সঙ্গে?

একটি তমালের তলে এসে বসে পড়ি। বনের ভিতরে ছোট জলাশয়—কৃষ্ণকুণ্ড। কুণ্ডের অপর পাড়ে একটা গাছের ডালে দু'টি বানর বসে রয়েছে। একমনে ভক্তদের জলস্পর্শ করা দেখছে। ভক্ত-বানর বলতে হবে।

পুণ্যার্থীরা ঘাট থেকে উঠে আসছেন। ছোট একটি ঘটিতে করে কুণ্ডবারি নিয়ে এসেছে জানকী। কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই সে খানিকটা জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দেয়।

পাণ্ডাজী পাশে এসে বসেন। কথায় কথায় বলেন, "শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠলীলার সময় গোধন নিয়ে এই বনে আসতেন। রাধারাণীও সে সময়ে আসতেন এখানে। এই পুণ্যকুণ্ডের তীরে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হত।"

বোধহয় মিথ্যে বলছেন না পাণ্ডাজী। জায়গাটি সত্যই রাসলীলার আদর্শ-স্থান।

কৃষ্ণকুণ্ডের তীর থেকে আবার যাত্রা হল শুরু, আরম্ভ হল কীর্তন। আমরা বনময় চড়াই পথে চললাম এগিয়ে।

খোল-করতাল থামাতে হল, থেমে গেল কীর্তন। না, কোন দর্শনের জন্য নয়, পথের জন্য। পথটি এখন বড়ই সংকীর্ণ। তার ওপরে পথের ছ'পাশে কাঁটাবন। কাঁটার খোঁচা থেকে গা বাঁচাতে হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। কোনমতে এক সারিতে ওপরে উঠছি— 'ক্লাইম্ব' করছি। মথুরা মহারাজ 'লীড্' করছেন।

সহসা থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি। থামতে হল আমাদেরও। ডান-দিকের একটি সরু উৎরাই পথ দেখিয়ে মথুরা মহারাজ বলেন, "এই পথে সামান্য কিছুটা নিচে নেমে শ্রীকুণ্ড—রাধাকৃষ্ণের রাসস্থলী।..."

শেষ করতে পারেন না তিনি। তার আগেই আরম্ভ হয় দৌড়। আগে কেবা নয়ন করিবেক ধন্য, তারই লাগি ঠেলাঠেলি।

কোনকালেই 'স্পোর্টসম্যান' ছিলাম না। সুতরাং সসম্মানে সরে দাঁড়াই। আরও একজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় না—জানকী।

একটু ওপরে এসে দেখি বাঁদিকে একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে। আমরা ছ'জনে তারই একখানি ধাপের ওপর এসে বসি।

"কি হে ঘোষ, ওখানে বসে পড়লে কেন?"

তাকিয়ে দেখি চক্রবর্তী নিচের থেকে প্রশ্ন করছে।

উত্তর দিই, "তোমরা দর্শন করে এসো, আমরা ততক্ষণে একটু জিরিয়ে নিই। বড় টায়ার্ড লাগছে।"

চক্রবর্তী একটু হাসে। কেন জানি না। হয়তো এইটুকু পাহাড় চড়েই শ্রান্ত হয়ে পড়েছি ভেবে, কিংবা জানকীর সঙ্গে একা বসে আছি বলে।

তবে সে আর কিছু বলে না। রাসস্থলী দর্শনের জন্য সহযাত্রীদের সঙ্গে ঠেলা-ঠেলি শুরু করে দেয়।

নীরবে বসে থাকি। জানকীও কথা বলছে না। মনে মনে কি যেন ভেবে চলেছে। কি ভাবছে জানকী?

আমি ভাবি চক্রবর্তীর কথা—পুণ্যলোভী চক্রবর্তী। গতকাল তার দীক্ষা গ্রহণ সুসম্পন্ন হয়েছে। কাল রাতেই চিঠি লিখে সেকথা স্ত্রী ও ছেলেকে জানিয়ে দিয়েছে। তার ধারণা সংবাদটা আকস্মিক হলেও মিসেস চক্রবর্তী খুশি হবেন।

আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে। হিন্দুঘরের সধবা--মাছ-মাংসের প্রতি আকর্ষণ সহজাত। অথচ পতির পুণ্যের প্রয়োজনে সেই নিরপরাধ সতী শেষ পর্যন্ত নিরামিষভোজী হতে বাধ্য হবেন।

অতএব স্বামীর দীক্ষা গ্রহণের সংবাদটি স্ত্রীর কাছে সুখকর সংবাদ না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

তার ওপরে রয়েছে সেই কিশোর ছেলেটির সমস্যা। বাপ-মা নিরামিষভোজী, তার পক্ষে আমিষাশী হওয়া মুশকিল। অথচ সে নিরামিষ আহার পছন্দ না করতেও পারে।

আচ্ছা, চক্রবর্তী কি এই সব সমস্যার কথা ভেবে দেখেছে কখনও?

কাঁধে কাপড়ের পুঁটলি জনৈক বৃদ্ধ ব্রজবাসী সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। লোকটি কাছে আসে। জিজ্ঞেস করে, "মহারাজ, যাত্রায় এসেছেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"শ্রীকুণ্ডে গেলেন না?"

"না। বড্ড সরু পথ, ভীষণ ভিড়।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, এই সিঁড়ি কোথায় গিয়েছে?"

"মানগড়ে—মানবিহারীজীর মন্দিরে।"

"মন্দির ছাড়া আর কি আছে সেখানে?" মাঝখান থেকে জানকী প্রশ্ন রাখে।

"মন্দির ছাড়া তেমন আর কিছু নেই।" লোকটি উত্তর দেয়।

জানকী আবার প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, মানবিহারী নামটি হল কেন?"

লোকটি পুঁটলি নামিয়ে রেখে জানকীর পাশে বসে। বলতে থাকে, "ঐ যে, আপনাদের দলের সবাই যেখানে গিয়েছেন, সেই শ্রীকুণ্ডের তীরে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণী ও সখীদের সঙ্গে রাসলীলা করছিলেন। অন্য সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণ একই ভাবে রাস করছেন দেখে রাধার অভিমান হল। তিনি রাসস্থলী থেকে বেরিয়ে এলেন! একা একা চলে গেলেন ঐ পাহাড়ের ওপর।"

মানভঞ্জনের মূল-কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীর কোন মিল নেই। বুঝতে পারছি পথচারী যে কাহিনী বলছে, সেটি নেহাতই স্থানীয় জনশ্রুতি। তবু চুপ করে থাকি।

লোকটি বলে চলেছে, "সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ জানতে পারলেন সব। তিনি সখীদের ফেলে চলে গেলেন রাধারাণীর কাছে। কৃষ্ণ রাধার মান-ভঞ্জন করলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন হল।

"তাই ঐ জায়গাটির নাম মানগড়। আর রাধারাণীর মানভঞ্জন করেছিলেন বলে কৃষ্ণ সেখানে মানবিহারীরূপে পূজিত হচ্ছেন।"

॥ সাত ॥

শ্রীকুণ্ড থেকে পুণ্যার্থীরা পুণ্যার্জন করে ফিরে এলেন মূল-পথে। মথুরা মহারাজ জানালেন—শোভাযাত্রা মানগড়ে যাচ্ছে না, কারণ সেখানে তেমন কোন দর্শন নেই। সুতরাং আমি ও জানকী সিঁড়ির ওপর থেকে নেমে আসি পথে। সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি ডানদিকের চড়াই পথে।

পথ আবার প্রশস্ত হয়েছে। পাশাপাশি জনচারেক চলা যাচ্ছে। তবে পাথুরে এবং চড়াই পথ। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে চলেছে।

আমরা অনেক ওপরে উঠে এসেছি—ঘাসে ঢাকা প্রায় সমতল একটি প্রান্তর। বেশ প্রশস্ত—অনেকটা ময়দানের মতো। এখানে-ওখানে বড় বড় গাছ রয়েছে। আর বাঁ দিকে ছোট একটি বাড়ি, সামনে কুয়ো।

জায়গাটি আস্তে আস্তে সামনের দিকে উঁচু হয়ে গেছে। সেখানেই রয়েছে ময়ূরকণ্ঠী বা মোরকুঠি। শুনেছি রাধারাণীর জন্মতিথিতে বিরাট মেলা বসে সেই কুঠির সামনে। তখন বর্ষাণায় লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়।

আমরা কিন্তু যাব না সেখানে। এখন সেখানে নাকি দেখবার মতো কিছুই নেই। আমরা তাই এগিয়ে চলেছি ডানদিকে। চলেছি বিলাসগড়ে—শ্রীজীর মন্দিরে।

আরও ওপরে উঠে এসেছি। নিচে বর্ষাণা শহরকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে পথ চলছি। শুধু সমতলের নয়, পাহাড়ের দৃশ্যও রমণীয়। বর্ষাণা সত্যিই সুন্দর। তাই তো হবে—শ্রীরাধিকা যে চিরসুন্দরের শাশ্বতী বিগ্রহ।

পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে পথ। আমরা সেই পথ বেয়ে ওপরে উঠছি।

একসময় পাহাড়টির শিখরে উঠে এলাম। এখানটাও আগের সেই ময়দানের মতই সমতল। আয়তনে অবশ্য ছোট। কিন্তু বেশ জম-জমাট।

প্রথমেই পথের ডানদিকে একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। পাণ্ডাজী জানান, "এটি জয়পুরের মহারাজার বাড়ি। বাড়ির ভেতরে রয়েছে শ্রীরাধাগোপালজীর মন্দির।"

কিন্তু আমরা সে মন্দির পরে দর্শন করব। এখন এগিয়ে চলি বাঁদিকে। নেমে আসি একটু নিচে।

একটি পাথর-বাঁধানো উঠোন। তারই কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পাথরের তৈরি সুবিশাল ও সুউচ্চ ঝুলনমঞ্চ। এত বড় ঝুলনমঞ্চ আমি কখনও দেখি নি। আর মঞ্চটি কেবল বড় নয়, ভারী সুন্দর। তবে অযত্নের আভাষ তার সারা অঙ্গে।

ঝুলনমঞ্চের হাত দশেক দূরে একটি মাঝারী আকারের মন্দির। তার পাশেই লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছোট কুণ্ড।

পাণ্ডাজী মন্দিরটি দেখিয়ে বলেন, "এটি দানবিহারীজীর বড় মন্দির। ঐ জলাশয়টি দানকুণ্ড।"

বিস্মিত হই। দানবিহারীজী দানগড় ছেড়ে আবার বিলাসগড়ে এসে ঠাঁই নিলেন কেন?

কিন্তু সেকথা জিজ্ঞেস করা যাবে না। আমি ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা করছি। আমার সহযাত্রীরা এ ধরনের হাসি-ঠাট্টা বরদাস্ত করেন না।

পাণ্ডাজী তাগিদ দেন, "যান, মন্দিরে গিয়ে দানবিহারীজীকে দর্শন করে দানকুণ্ডে দান করুন—অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে।"

সুতরাং সহযাত্রীদের সঙ্গে আমিও এসে দাঁড়াই সেই মন্দিরতলে —রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন করি।

তারপরে আসি দানকুণ্ডের তীরে। সহযাত্রীদের মতো আমিও কয়েকটি পয়সা ছুঁড়ে দিই কুণ্ডের জলে, তারপর এগিয়ে চলি জয়পুরের মন্দিরে।

বেশ বড় মন্দির—সুন্দর তো বটেই। গর্ভ-মন্দিরে শ্রীরাধা-গোপালের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। কালো পাথরের গোপালদেব আর শ্বেতপাথরের রাধারাণী। মন্দিরের দেয়ালে চোখ-জুড়ানো খোদাই কাজ।

কিন্তু চোখ তৃপ্ত হয় না। তার আগেই জনৈক সেবক তাড়া লাগান, "দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? চলুন, এখনও যে আসল দর্শনই বাকি।"

"আসল দর্শন কোন্‌টি প্রভু?" প্রশ্নটা বেরিয়ে যায় মুখ থেকে।

সেবক উত্তর দেন, "শ্রীজীর মন্দির।"

"আমরা তাহলে ময়ূরকণ্ঠীতে সত্যই যাচ্ছি না?"

"না। তখন বললাম যে, সেখানে দেখার কিছুই নেই। চলুন, তাড়াতাড়ি পা চালান।"

সেবক আমাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে যান।

ময়ূরকণ্ঠীর ভাবনাটাই কিন্তু পেয়ে বসে আমাকে। শুধু কি সময়াভাবের জন্যই এঁরা সেখানে গেলেন না? না, অন্য কোন কারণে? বৈষ্ণবদের ভেতরেও বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সাধারণত এক সম্প্রদায়ের মন্দির বা মঠে অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবরা পদধূলি দেন না।

নইলে আমি যে শুনেছি ময়ূরকণ্ঠী জায়গাটি সত্যই দর্শনীয়। তিন শ' বছরের প্রাচীন মন্দির ও কুণ্ড আছে সেখানে। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে মহাসমারোহে রাধারাণীর জন্মোৎসব পালিত হয় সে মন্দিরে।

কথিত আছে একদিন রাধারাণী যখন সখীদের সঙ্গে সেখানে

বসেছিলেন, কৃষ্ণ তখন ময়ূরের রূপ নিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন। সখীরা বুঝতে পারলেন না, কিন্তু শ্রীরাধা ঠিক চিনতে পারলেন তাঁকে। তাই তিনি ময়ূররূপী কৃষ্ণকে লাড্ডু খেতে দিলেন। এবং রাধাবল্লভ পরমানন্দে সেই লাড্ডু খেয়ে নিলেন। সেই থেকেই ঐ পুণ্যভূমির নাম হল ময়ূরকণ্ঠী।

এখনও রাধারাণীর পুণ্য-জন্মতিথিতে মেয়েরা ঐ কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে জলে লাড্ডু ছুঁড়ে দেয়। তাঁদের বিশ্বাস ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই লাড্ডু খেয়ে নেন।

কুণ্ডটি নাকি বড়ই সুন্দর। তার একদিকে গাছে ছাওয়া পাহাড়। স্থানীয়রা কখনও সে-সব গাছ কাটেন না। জায়গাটিও মনোরম। তাই কয়েকজন সর্বত্যাগী সাধু সেখানে বাস করছেন। কেউ তাঁদের সাধন-ভজনে বিঘ্ন ঘটায় না।

আমরা ব্রহ্মাচল শিখরের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। একটি তৃণাচ্ছাদিত প্রায় সমতল প্রান্তরের ওপর এগিয়ে চলেছি। এখানে গাছপালা কম। তাহলেও গরম লাগছে না—বেশ বাতাস বইছে। নিচে বর্ষাণা শহরকে আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে। ভারী ভাল লাগছে পথ চলতে।

অবশেষে বর্তমান ব্রজ-মণ্ডলের সুন্দরতম মন্দিরের তোরণে পৌঁছনো গেল। যেমন অবস্থান, তেমনি কারুকার্য ও গঠন-নৈপুণ্য।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে পথ থেকে খানিকটা উঁচুতে উঠে মন্দির-তোরণ। তারপরেই শ্বেত ও কৃষ্ণপাথরের চৌকোণা অঙ্গন। ছ'দিকে গম্বুজময় দেওয়ালহীন অলিন্দ। আঙ্গিনার মাঝখানে পাথর-বাঁধানো তুলসীমঞ্চ।

অঙ্গনের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখী মন্দির—শ্রীজীর মন্দির। তার সারা অঙ্গে রঙীন পাথরের অপূর্ব-সুন্দর স্থাপত্যকলা।

চারধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা নাট-মন্দিরে উঠে আসি। আয়তনে খুব বড় নয়। কিন্তু চারিদিকেই সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি।

সোনালী ও রুপোলী রঙের ধাতু-নির্মিত একটি দোলমঞ্চ পড়ে আছে একপাশে। চমৎকার তার কারুকার্য—দেখবার মতো।

বড় বড় অনেকগুলো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে এখানে-ওখানে। মথুরা ছাড়ার পরে আমরা আর এতগুলো ঝাড়লণ্ঠন একসঙ্গে দেখি নি।

নাট-মন্দিরটি দু'টি অংশে বিভক্ত। দ্বিতীয় অংশ পেরিয়ে গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে আসি। সুগন্ধি ধূপ ও ফুলের গন্ধে আমোদিত মন্দির—স্বর্গীয় সুষমায় আচ্ছাদিত মন্দির।

সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের মনোহর মূর্তি। শ্বেতপাথরের রাধারাণী ও কৃষ্ণপাথরের শ্রীকৃষ্ণ।

আশ্চর্য সুন্দর ও প্রাণময় মূর্তি। দর্শন মাত্র মন-প্রাণ পরমানন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সার্থক হল সকল শ্রম।

দণ্ডবৎ করে নেমে আসি মন্দির থেকে। সবার সঙ্গে বসে পড়ি মন্দির-চত্বরে। সহযাত্রীরা রাধারাণীর গুণকীর্তন করছেন। আমিও ভেবে চলি শ্রীরাধিকার কথা—

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীরাধিকার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কেবল এক প্রধানা-গোপীর নির্দেশ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকেই রাধারাণীরূপে ধরে নিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত, দেবীভাগবত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে রাধিকার কথা বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে—রাধারাণী বৈশ্যরাজ বৃষভানুর কন্যা। বারো বছর বয়সে বৈশ্য রায়াণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রায়াণ যশোদার ভাই। সুতরাং রাধা সম্পর্কে কৃষ্ণের মামী।

রাধারাণীর বয়স যখন চোদ্দ বছর, তখন বসুদেব নবজাত কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে আসেন। অতএব কৃষ্ণ রাধার চেয়ে চোদ্দ বছরের ছোট।

কিন্তু ভক্ত-বৈষ্ণবদের মতে—রায়াণ নাকি শ্রীরাধার ছায়াকে বিয়ে করেছিলেন এবং রাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ। কাজেই রাধা-কৃষ্ণের অপার্থিব প্রেমলীলায় সম্পর্ক বা বয়সের বিচার অর্থহীন।

বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণ কখনও দ্বিভুজ কখনও চতুর্ভুজ। লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তুলসীও হলেন চতুর্ভুজ কৃষ্ণের পত্নী। কিন্তু শ্রীরাধিকাই দ্বিভুজ-কৃষ্ণের একমাত্র প্রিয়তমা।

আগে রাধা পরে কৃষ্ণ। কারণ কৃষ্ণবল্লভা রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। তিনি কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী। রাধা সর্বদাই কৃষ্ণের রাসেশ্বরী। কৃষ্ণ কখনই রাধাকে পরিত্যাগ করেন নি—তিনি চির-কালের রাধাগোবিন্দ।

যিনি ত্রিসন্ধ্যা শ্রীরাধিকার নাম জপ করেন, তিনি রাধামাধবের পাদপদ্মে ঠাঁই পান। কারণ 'রা' শব্দের অর্থ দান এবং 'ধা' শব্দের অর্থ নির্বাণ-মুক্তি। রাধা তাঁর ভক্তবৃন্দকে নির্বাণ-মুক্তি দান করেন।

আমার ভাবনা থেমে যায়। কীর্তন শেষ হয়ে গেছে। মথুরা মহারাজ লাঠিহাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলছেন, "মাড়ওয়ারের শেঠ হরগুলাল এই মনোমুগ্ধকর মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। তাঁর আরও অনেক কীর্তি রয়েছে ব্রজ-মণ্ডলে। কিন্তু এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমরা এই মন্দিরকে বলি শ্রীজী বা রাধারাণীর মন্দির আর স্থানীয়রা বলেন লাড়লিজীর মন্দির। যে পাহাড়ের ওপরে এই মন্দিরটি অবস্থিত, সেটির নাম হল বিলাসগড়।"

সত্যাই তাই। এমন বিলাসবহুল মন্দির খুব বেশি নেই এদেশে। ইচ্ছে হচ্ছে নজাফ খাঁর আত্মাকে একবার 'হাবিয়া দোজখ' থেকে ডেকে এনে দেখাই এই মন্দির। বলি—হে ধনলোভী ও ধর্মান্ধ উজির, দেখে যাও, তোমার অত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্ষাণা ধ্বংস হয় নি। আজও দূর-দূরান্তের ভক্তদের ভিড়ে সে সদাই মুখরিত। অথচ তোমার আজ ঠাঁই হয়েছে নিকৃষ্টতম নরকে।

না, বর্ষাণার মানুষ তোমাকে ক্ষমা করেন নি। কিন্তু মহাভাবময়ী রাধারাণী ক্ষমা করেছেন তোমাকে। কারণ পাপীর পরিত্রাণের প্রয়োজনেই তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন এই ধূলার ধরণীতে। আর তাই তুমিও আজ প্রণাম জানাও তাঁকে।

আবার শুরু হয়েছে কীর্তন। নীরবে কীর্তন শুনছি। হঠাৎ আমার কানের কাছে মুখ এনে জানকী ফিস্ ফিস্ করে বলে, "কীর্তন শেষ হলেই তো নিচে নামার জন্য তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে। চলুন না, একটু ওপরে যাই!"

"ওপরে?" বুঝতে পারি না!

"হ্যাঁ, এই ফাঁকে একবার মন্দিরের ছাদ থেকে ঘুরে আসা যাক্। দেখছেন না, কি চমৎকার সিঁড়ি রয়েছে!"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আস্তে আস্তে আসর ছেড়ে উঠে আসি। শুধু আমি আর জানকী নই, বৌদি সেনবাবু এবং বোসবাবুও আমাদের সঙ্গী হন।

আমরা ছাদে আসি। জানকীর অনুমান মিথ্যে নয়, সত্যি ছাদটা বড় সুন্দর। আমরা বসে পড়ি। চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। এটি বর্ষাণার উচ্চতম স্থান। সারা অঞ্চলটিকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

শ্রীজীর মন্দির থেকে একসারি সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে শহরের জনবহুল অঞ্চলে। আমরাও ঐ পথে নামব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব ধর্মশালায়।

পথে অবশ্য দু'টি দর্শন আছে—শ্রীরাধার পিতামহ মহীভানু এবং পিতা বৃষভানুর আদিবাড়ি। এজন্য আমাদের কোন অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে না। সিঁড়ি দিয়ে নামার পথেই মহীভানুর মন্দির, আর নিচে নেমে বড় রাস্তা দিয়ে কয়েক পা এগিয়েই রাজা বৃষভানুর আদিবাড়ি। সেখানে শুনেছি বৃষভানু কীর্তিদা ও শ্রীদামের দণ্ডায়মান মূর্তি আছে। আর রয়েছে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি।

আরও অনেক দর্শন আছে বর্ষাণায়। তাদের মধ্যে কীর্তিদা বৃষভানু ও অষ্টসখীর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম। এখান থেকে মানে বিলাসগড়ে

অবস্থিত এই শ্রীজীর মন্দিরের ছাদ থেকে দূরে নন্দগ্রামের নন্দীশ্বর পাহাড়কে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বর্ষাণার দানগড় ময়ূরকণ্ঠী ও মানগড়।

সহসা জানকীর প্রশ্নে আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। জানকী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, তখন লোকটি মানগড়ের যে কাহিনী বলল, সেটি বোধহয় স্থানীয় জনশ্রুতি ?"

"হ্যাঁ।" মাথা নাড়ি।

"মূল-কাহিনীটা বলুন না একবার !"

বোসবাবুর দিকে তাকাই। হেসে বলি, "বোসবাবু থাকতে আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ?"

"বলুন না বোসদা !" জানকী সঙ্গে সঙ্গে ফরমাশ করে।

বোসবাবু ধার্মিক মানুষ, প্রবীণ ও শান্ত স্বভাব। বিয়ে করেন নি। বৃদ্ধা মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই তাঁর। তিনি এ আশ্রমের শিষ্য নন, আনন্দময়ী মায়ের শিষ্য। আমারই মতো টাকা দিয়ে যাত্রায় এসেছেন। কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন কাহিনী তাঁর কণ্ঠস্থ।

সুতরাং বোসবাবু জানকীর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি শুরু করেন—

"পূর্ণিমার চাঁদ অস্তাচলগামী। বন-বৃন্দাবনের নিকুঞ্জে রাধারাণী সারারাত ধরে বৃথাই প্রতীক্ষা করেছেন। বৃন্দাবনচন্দ্র তাঁর কুঞ্জে আসেন নি। অভিসার-রজনী বিফল হয়েছে। বিরহতাপে তাঁর বুকের বনমালা গেছে শুকিয়ে। আঁখিজলে নয়নের কাজল গেছে মুছে। নিষ্ফল বাসর-জাগরণে চোখ দু'টি শ্রান্ত। তিনি ক্লান্ত-কণ্ঠে বৃন্দাকে বললেন—যার জন্য গুরুজনের গঞ্জনা সয়ে, কুলে কালি দিয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় নিয়েছি, তাঁর এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা কেমন করে সহ্য করি বল।

"ক্ষোভে রোষে ও অভিমানে রাধারাণীর হৃদয় দুলে উঠল। সখীদের কাছে অপমানে ও লজ্জায় তিনি আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

"এদিকে কৃষ্ণ তখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। চন্দ্রাবলীর আমন্ত্রণে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভাবতেই পারেন নি সেই কুঞ্জে তাঁকে সারারাত অতিবাহিত করতে হবে।

"চন্দ্রাবলীর কিন্তু তখনও তৃষ্ণা মেটে নি। তাই তিনি কৃষ্ণকে বিদায় দিতে চাইলেন না। অতৃপ্ত কণ্ঠে বললেন—এই তো এলে, এখুনি চলে যাবে!

"কৃষ্ণ তবু মিলন-শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। চন্দ্রাবলী বুঝতে পারলেন, এবারে প্রাণপ্রিয়কে বিদায় দিতেই হবে। তাই তিনি গোপীনাথের ওষ্ঠাধরে বার বার বিদায়-চুম্বন এঁকে দিলেন। তাঁর চোখদু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

"কিন্তু রাধারমণ আর অপেক্ষা করতে পারেন না। একরকম জোর করেই তিনি চন্দ্রাবলীর আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে তাঁর কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসেন। আর আশাহতা চন্দ্রাবলী শূন্য শয্যায় লুটিয়ে পড়েন।

"অলস ও মন্থর পদক্ষেপে রাধাবল্লভ রাধারাণীর কুঞ্জের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন কুঞ্জভবন অন্ধকার। ফুলশয্যা শ্রীহীন। মিলনমালা মাটিতে পড়ে আছে। আর শ্রীরাধিকা নীলাম্বরীর আঁচলে মুখ ঢেকে বসে রয়েছেন। তাঁর চারপাশে সখীবৃন্দ বৃন্তচ্যুত কুসুমরাশির মতো ধরাসনে ম্রিয়মাণ।

"সজল চোখে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে প্রবেশ করলেন, গদগদ কণ্ঠে বার বার রাধাকে ডাকলেন।

"কিন্তু রাধা সাড়া দিলেন না।

"আকুল কণ্ঠে কৃষ্ণ তখন বললেন -

'এ কি দেখি বিনোদিনী, আমোদিনী—বিষাদিনী
ভাবান্তর কেন লো এমন?
আঁখিনীরে ধরা ভাসে, পূর্ণ শশী রাহুগ্রাসে
নীলাঞ্চলে ঢেকেছ বদন॥

হেরি নিশি অবসান করেছ কি অভিমান ?
তোল মুখ, হেসে ফিরে চাও।
কিঙ্করে করুণা করি রাখ প্রাণ, প্রাণেশ্বরি,
পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও ॥'

"পা-য়ে পড়েও কোন ফলই হল না। রাধা তেমনি মুখ ঢেকে রইলেন। ব্যাকুল কৃষ্ণও তখন কাঁদতে কাঁদতে বৃন্দাকে বললেন--সখী ! তুমি তো জানো, রাধা আমার জীবনের আলো এবং আমার প্রেমে কোন ছলনা নেই। সেই রাধারাণী দেখো, মুখ ঢেকে রয়েছে—আমার দিকে একবার ফিরে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। সখী, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও, বল আমি এখন কি করব ?

"বৃন্দা কিন্তু কৃষ্ণকে কোনই সহানুভূতি দেখালেন না, বরং পাল্টা-প্রশ্ন করলেন--কার কুঞ্জে রাত কাটিয়ে, এমন আলুথালু বেশে এখানে এসেছো ?

"কৃষ্ণ খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন, তবু তিনি বললেন—

'সত্য কই, প্রাণ-সই, জানি নাক' রাধা বই—
একেশ্বরী অন্তরে আমার।
রাধা নাম গায় বাঁশী, শুনে প্রেমনীরে ভাসি
তাই বাঁশী ভালবাসি--সুধার আঁধার ॥
রাধা-প্রেম অভিলাষ রাধার বরণাভাস
পীতবাস করি পরিধান।
কিশোরীর প্রেম আশে আসিয়ে বিপিনবাসে
শক্তি-অর্চনায় হ'ল নিশি অবসান ॥'

"বৃন্দা কিন্তু কৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি পরিহাসের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—তা তুমি কার পূজা করলে, দ্বিভুজা কি দশ-ভুজা, বিদ্যা কি অবিদ্যা ? বললেন—

'সর্বাঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন, কেশ-বেশ ছিন্নভিন্ন,
অঙ্গ জরজর খর নখর আঘাতে।

সারানিশি রতি-রণে, আঁখি দু'টি জাগরণে—
যুগল অরুণ যেন উদয় প্রভাতে ॥'

"কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, ধরা পড়ে গিয়েছেন। তবু তিনি কোন-মতে উত্তর দিলেন—ছি-ছি, এ তুমি কি বলছো? আমি কুসুমচয়ন করতে বনে গিয়েছিলাম, তাই কণ্টকের আলিঙ্গনে আমার সর্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়েছে।

"হে লম্পট-শিরোমণি, তোমাকে ধিক্। যাক্গে, কি মতলবে এখন এখানে এসেছো? এবারে যাও দেখি এখান থেকে, রাইকে একটু একা থাকতে দাও।

"বৃন্দার কথা শেষ হতেই বিশাখা যোগ করলেন—

'জানি ভালো তব রীতি দয়া মায়া প্রেম প্রীতি
আশা দিয়ে ভাসাও অকূলে।
করিয়ে দুকূল-হারা নয়নে বহাও ধারা
ফিরে আর নাহি চাহ ভুলে' ॥"

"হয়ে গেল?" বোসবাবু থামতেই জানকী প্রশ্ন করে।

"না।" বোসবাবু মৃদু হাসেন।

"তাহলে বলুন।" জানকী তাগিদ দেয়।

বোসবাবু বলতে থাকেন—

"কৃষ্ণ স্বপক্ষে বহু যুক্তির অবতারণা করলেন, কিন্তু বিশাখা ললিতা চিত্রা ও বৃন্দা কেউই তাঁর সে-সব কথা বিশ্বাস করলেন না। বৃন্দা আবার বললেন—

'মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ।
তুয়া অভিসারে অবশ নব নাগরী
জীবই বহু পুণভাগ ॥
যো পদতল থল-কমল-সুকোমল
ধরণি পরশে উপচঙ্ক।

অব কণ্টকময় সঙ্কট বাটহি
আয়ত যায়ত নিশঙ্ক ॥'*

"বহু অনুনয়-বিনয় ও সাধ্য-সাধনা করেও যখন সখীদের রোষ প্রশমিত হল না এবং শ্রীরাধিকার মান-ভঙ্গ হল না, তখন চতুর-চূড়ামণি কেশব এক অভিনব অভিনয় করলেন। কবির ভাষায়—

'তবহুঁ রসিকরাজে সিরজিয়া মন-মাঝে
গদ্‌গদ কহে আধ বাত।
পাঁচ-বদন অহি মঝু পদে দংশল
জরজর ভেল সবগাত ॥
এত কহি নাগর কাঁপই থর থর
মূরছি পড়ল সোই ঠাম।
কি ভেল কি ভেল বলি রাই ধাই চলি
কোরে কয়ল ঘনশ্যাম ॥'

"সরল রাধা কপট কৃষ্ণের ছলনা বুঝতে পারলেন না। তিনি সমস্ত অভিমান বিসর্জন দিয়ে মদনমোহনের মাথাটি নিজের কোলে তুলে নিলেন। সখীরা গোপীনাথের শিরে শীতল সলিল সিঞ্চন করতে শুরু করলেন। রাধারাণী তাঁর নীলশাড়ির আঁচল দিয়ে কৃষ্ণের মাথায় বাতাস দিতে থাকলেন।

"সহসা কৃষ্ণের কপটমূর্চ্ছা ভঙ্গ হল। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের চাতুরি বুঝতে পারলেন।

"কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মান-ভঞ্জন হয়েছে। তাই তিনি রাধা-বিনোদের অধরে মিলনের মধুর তিলক এঁকে দিলেন। রাধাকৃষ্ণের শুভমিলনে মধু-বৃন্দাবনের আকাশ-বাতাস আনন্দময় হয়ে উঠল। রাধারাণী তাঁর কোমল বাহুলতায় রাধাবল্লভকে বেষ্টন করে আত্মহারা কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

---

* কবি গোবিন্দদাস

'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥'*"

* কবি চণ্ডীদাস

॥ আট ॥

সকালে বর্ষাণা থেকে বেরিয়ে মাইল ছু'য়েক হেঁটে এইমাত্র প্রেম-সরোবরের তীরে এলাম। চারিদিক বাঁধানো বিশাল জলাশয়। রাধিকা ও তাঁর অষ্টসখীর নামে ন'টি ঘাট। প্রধান ঘাট অর্থাৎ রাধাঘাটের তীরে বড় একটি নিমগাছ। সামনেই প্রেম-বিহারীজীর মন্দির। ভেতর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। ভাদ্র শুক্লা-দ্বাদশীতে এখানে শ্রীকৃষ্ণলীলা অভিনয় হয়।

দর্শন শেষে ঘাটে এসে বসি। যথারীতি পুণ্যার্থীরা ঘাটে নেমে জলস্পর্শ করছেন। কিন্তু আজ আর জানকী জল আনল না। জানকীর ঘটিতে জল নিয়ে এলেন বৌদি এবং তিনি আমার মাথায় জল ছিটিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ জানকী এমন পুণ্যকর্মের দায়িত্বটা বৌদিকে দিয়ে দিল কেন?

আবাব এগিয়ে চলল সংকীর্তন শোভাযাত্রা। কয়েক পা চলার পরেই জানকীকে পাশে পেলাম। সুযোগ পেয়ে প্রশ্নটা করে ফেলি। বলি, "তুমি ঘাটে নেমে প্রেম-সরোবরের জলস্পর্শ করলে না যে?"

"ভয়ে।" গম্ভীর স্বরে জানকী উত্তর দেয়।

বিস্মিত হই। আবার প্রশ্ন করি, "কিসের ভয়?"

"প্রেমে পড়ার।" একটু থামে সে। তারপরে বলে, "প্রেম-সরোবরে জলস্পর্শ করলে নাকি অক্ষয়-প্রেম লাভ হয়। আর প্রেমে পড়তে চাই না বলেই ঘাটে নামলাম না।"

জানকী চুপ করে, কিন্তু আমি কোন কথা বলতে পারি না।

আমাকে নীরব দেখে জানকী এগিয়ে যায়। আমি নীরবে পথ চলি। মনে পড়ে সেই করুণ কাহিনী—সেদিন শান্তনুকুণ্ড থেকে

বহুলাবনে যাবার পথে জানকী যে কাহিনী বলেছে আমাকে।* মনে মনে ভেবে চলি—

পায়ের ব্যথার জন্য সেদিন জানকী ভাল হাঁটতে পারছিল না। সে ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছিল। বাধ্য হয়ে আমিও তার সঙ্গে ধীরে ধীরে পথ চলছিলাম।

এক সময় দেখলাম, সংকীর্তন শোভাযাত্রা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। জানকীকে বললাম—আর একটু জোরে পা চালাও, নইলে আমরা যে পেছনে পড়ে থাকব।

—থাকলে ক্ষতি কি? জানকী আচমকা প্রশ্ন করেছে।

কোনমতে জবাব দিয়েছি—না, মানে অচেনা পথ তো, ওরা বেশি এগিয়ে গেলে আমরা যদি পথ হারিয়ে ফেলি?

—ভালই হয়। আমরা দু'জনে তখন পথহারা পথিকের মতো বৃন্দাবনের বনে বনে ঘুরে বেড়াতে পারব।

—সেটা কি খুব ভাল হবে?

—খুব খারাপই বা কি হতে পারে?

একটু হেসে পরিবেশটাকে হাল্কা করতে চেয়েছি, তারপরে জানকীর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি—সহযাত্রীদের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মেয়ে হারিয়ে যাবার শোকে তোমার মা যে অন্ন-জল ত্যাগ করবেন। হয়তো বা হারিয়ে যাবার নেশা কেটে গেলে, তুমি নিজেও আপনজনের জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দেবে।

—আপনজন! একবার হেসেছে জানকী। তারপরে বলেছে—এ সংসারে আমার তেমন আপন কেউ আছে বলে জানি না তো! একজনকে ভেবেছিলাম সে আমার আপন। কিন্তু ভুল····· ভুল ভেবেছি।

চুপ করে রয়েছি। জানকী আবার বলেছে—পরশু মথুরার

---

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য

সেই চায়ের দোকানে বসে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কলেজে-পড়া মেয়ে হয়ে এবং দীক্ষা না নিয়ে এ বয়সে আমি কেন ব্রজ-পরিক্রমায় এলাম? সেদিন আপনাকে সে প্রশ্নের উত্তর দিই নি, কিন্তু আজ না দিয়ে পারছি না। কেন জানেন?

—কেন?

—আজ আমার জন্মদিন। বহু বছর বাদে এই প্রথম আজকের দিনে ওর সঙ্গে দেখা হল না।

—তাতে কি হয়েছে? হেসে বলেছি, আবার আগামী জন্মদিনে দেখা হবে।

—না! জানকী যেন কেঁদে উঠেছে। বলেছে, আর সে আসবে না আমার কাছে।

—কেন?

—আমি যে বামুনের মেয়ে।

—আর সে?

—কায়স্থ।

—আপত্তিটা নিশ্চয়ই তোমাদের তরফের?

—না। অবশ্য প্রথম দিকে দাদাদের ঠিক মত ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা মত দিয়েছিল। অথচ ওর বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না।

—আর তাই সে শুনল? আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছি।

জানকী উত্তর দিয়েছে, কেন শুনবে না বলুন, ওর বাবার যে অনেক টাকা।

—সে কি বিয়ে করেছে?

—হ্যাঁ। শুনেছি বড়লোকের মেয়ে। আমার মতো কালো-কুৎসিত নয়, সুন্দরী। জানকী উত্তর দিয়েছে। তারপরে আমাকে পাল্টা-প্রশ্ন করেছে—কেন সে বাবার কথা শুনবে না বলুন?

সেদিন জানকীর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। কেবল

মনে মনে ভেবেছি—সত্যই তো, কেন সে ছেলেটি জানকীর মতো একটি কালো মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের জন্য বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করবে না? তার ধনী পিতার আদেশ অমান্য করে পৈতৃক-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে?

ভালোবাসা? প্রেম? ওগুলো তো গল্প-উপন্যাসে লেখা থাকে। বাস্তব জীবনে যারা ঐ-সব দুর্বল মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তারা আজকের সমাজে অচল। পৃথিবীতে এসেছো ভোগ করতে। নির্বিচারে ভোগ করে যাও। তাতে যদি দু'চারটে জীবন নষ্ট হয়ে হয়ে যায়, যাক্ না।

সেদিন জানকীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী শুনে আমার মনে পড়েছে মানসীর কথা। সে-ও যে সারা জীবন ধরে ভালোবাসার মূল্য দিয়ে চলেছে। যাকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল, সে তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর যাকে সে নতুন করে ভালোবেসেছে, তাকেও সে কাছে রাখতে পারছে না। আর তাই হয়তো মানসী আজ বৃন্দাবনে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করছে।

তবে মানসী নাকি বৃন্দাবনে এসে তার জীবনের শান্তিকে খুঁজে পেয়েছে। আমি তাই বৃন্দাবনচন্দ্রকে বলি, তুমি মানসীর মতো জানকীকেও শান্তি দান কর। তোমার মধু-বৃন্দাবনের বনপথে সে যেন তার ভাবী জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে।

সহসা কীর্তন থেমে গেল, শোভাযাত্রা নিশ্চল হল। আমার ভাবনা হারিয়ে যায়—বাস্তবে ফিরে আসি।

পথের পাশে বড় বড় গাছে ছাওয়া একটি সবুজ প্রান্তর। সহ-যাত্রীরা অনেকেই বসে পড়েছেন সেখানে—একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

কয়েক মিনিট বাদেই আবার খোল-করতাল বেজে উঠল, আরম্ভ হল কীর্তন—শুরু হল পথ চলা।

আমরা যে পথে এগিয়ে চলেছি, সেটি মোটর চলাচলের পথ।

মাঝে মাঝে বাস কিংবা গাড়ি যাচ্ছে। প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে—ধূলি-ধূসরিত পথ। সহযাত্রীরা কিন্তু কীর্তন থামাচ্ছেন না।

অবশেষে সংকেত পৌঁছন গেল। আমরা বর্ষাণা থেকে মাত্র মাইল চারেক হেঁটেছি। প্রেম-সরোবর দর্শন করে এলাম বলে চার মাইল। নইলে সংকেত বর্ষাণা থেকে মাইল দু'য়েকের মতো।

কথিত আছে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম মিলন হয় এখানে। পৌর্ণমাসী এখান থেকে সংকেত করে রাধাকে জানাতেন, কৃষ্ণ এসে গিয়েছেন। রাধা তখন ছুটে আসতেন কৃষ্ণের কাছে। কৃষ্ণ এখানে সংকেত-বিহারীরূপে পূজিত। ভাদ্র শুক্লা-দশমীতে এখানে রাধা-কৃষ্ণের মিলনোৎসব পালিত হয়।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলায় যোগমায়া বা পৌর্ণমাসীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। বয়সে প্রবীণা হয়েও তিনি ছিলেন তাঁদের প্রধান পরামর্শদাত্রী। তাঁরই পরামর্শে সখীদের নিয়ে শ্রীরাধিকা কাত্যায়নী-ব্রত পালন করেছিলেন। যে ব্রতকে অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা সম্পন্ন করেন।

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, সংকেত জায়গাটির অবস্থান দেখে কিন্তু পৌর্ণমাসীর সংকেত করার কাহিনীটিকে মোটেই কল্পনা বলে মনে হচ্ছে না। জায়গাটি ঠিক বর্ষাণা ও নন্দগ্রামের মাঝখানে অবস্থিত। এবং মাঠের ভেতর দিয়ে সোজা পথে এলে বর্ষাণা ও নন্দগ্রাম থেকে এখানকার দূরত্ব মাত্র মাইলখানেক। সুতরাং রাধা ও কৃষ্ণের পক্ষে এখানে এসে মিলিত হওয়া মোটেই অসম্ভব ছিল না।

সংকেত শুধু রাধাকৃষ্ণের মিলনস্থলী নয়, আরও একটি কারণে এটি ভক্ত-বৈষ্ণবদের পরমতীর্থে পরিণত। এখানে রয়েছে মহাপ্রভুর বৈঠক ও গোপালভট্টের ভজনস্থলী। প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামী এই পুণ্যস্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করেছিলেন। তাঁর পদরেণু-রঞ্জিত সেই ভজন কুটিরটি আজও কোনমতে টিকে

আছে। আমরা মহাপ্রভুর বৈঠকে প্রণাম জানিয়ে সেই পরমতীর্থে আসি। ভেবে চলি সেই বৈষ্ণবাচার্যের কথা—

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়-পার্ষদ ষড়-গোস্বামীর অন্যতম, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৫০৩ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন। গোপালের পৈতৃক নিবাস দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর জেলার শ্রীরঙ্গক্ষেত্র।

সন্ন্যাস গ্রহণের এক বছর পরে অর্থাৎ ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে দক্ষিণদেশে যাত্রা করেন। পরিক্রমাকালে তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গিয়ে রঙ্গনাথজীকে দর্শন করেন। গোপালের পিতা শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান এবং সবংশে প্রভুর পাদোদক পান করেন। তখন গোপালের বয়স এগারো বছর। পরিবারের সকলের সঙ্গে গোপালও প্রভুর পাদোদক পান করে প্রেমাপ্লুত হলেন।

ব্যেঙ্কটের অনুরোধে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবারে চারমাস তাঁর বাড়িতে অবস্থান করেন। গোপাল তখন প্রাণভরে প্রভুর সেবা করার সুযোগ পেলেন।

মহাপ্রভুও গোপালের সেবায় সন্তুষ্ট হলেন। তাই বিদায় নেবার সময় তিনি ব্যেঙ্কটকে আদেশ করলেন—তোমার এই বৈষ্ণবপুত্র গোপালের প্রতি আমার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি রইল। তুমি গোপালকে সুপণ্ডিত করে তুলবে, তার বিয়ে দেবে না এবং তাকে একবার বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেবে।

যথাসময়ে গোপাল তাঁর পিতৃব্য শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিই গোপালকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে তোলেন। তিরিশ বছর বয়সে গোপাল বৃন্দাবনে আসেন।

বৃন্দাবনে এসে তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। এই সংবাদ নীলাচলে পৌঁছলে মহাপ্রভু খুবই খুশি হলেন। তিনি জনৈক পত্রবাহকের সঙ্গে স্নেহাশীর্বাদ-স্বরূপ গোপালকে 'ডোর-

কৌপীন-বহির্বাস' পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে রূপ-সনাতনকে জানালেন—তোমরা গোপালকে সহোদর ভাই বলে মনে করো।

বৃন্দাবনে এসে গোপাল রূপ-সনাতনকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে সাহায্য করতে থাকেন। কথিত আছে এই সময় একদিন ধর্মপ্রচার করে ফেরার পথে গোপাল গণ্ডকী নদী থেকে দ্বাদশটি শালগ্রাম শিলা নিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে আসেন। তিনি সেই শালগ্রাম শিলাসমূহকেই কৃষ্ণরূপে পূজা করতে থাকেন।

একদিন কয়েকজন শ্রেষ্ঠী তাঁকে বিগ্রহের উপযোগী কিছু বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়ে যান। গোপাল ভাবলেন—আমার যদি একটি ছোট বিগ্রহ থাকত, আমি তাঁকে এগুলি পরাতে পারতাম।

পরদিন সকালে উঠে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, দ্বাদশটি শালগ্রামের একটি 'ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, দ্বিভুজ-মুরলীধর, মধুর ব্রজকিশোর শ্যামরূপে' প্রকটিত।

আনন্দিত গোপাল অন্যান্য গোস্বামীদের ডেকে আনলেন। তাঁদের উপস্থিতিতে শ্রীবিগ্রহের অভিষেক সুসম্পন্ন হল। সেদিনটি ছিল বৈশাখী-পূর্ণিমার (১৫৪২ খ্রীঃ) পুণ্যতিথি। গোস্বামিগণ বিগ্রহের নাম রাখলেন রাধারমণ। বৃন্দাবনে থাকাকালে আমরা সে বিগ্রহ দর্শন করেছি।*

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময়ে অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্যগণের সঙ্গে গোপালভট্টের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গোপাল সানন্দে তাঁকে আশীর্বাদ করেন কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তিনি নিজের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করে দেন। কারণ গোপাল আত্ম-প্রচারে বিমুখ ছিলেন।

আমরা তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গোপালভট্ট সম্পর্কে খুব সামান্য কথাই জানতে পারি। তিনি ছিলেন শুদ্ধ বৈষ্ণব। বৈষ্ণবরা

---

* 'ব্রজপর্ব' দ্রষ্টব্য

কোন কালেই ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। সুতরাং তিনিও যথা-সম্ভব নিজের পরিচয় গোপন করে গিয়েছেন। তাহলেও কবি শ্রীনরহরি চক্রবর্তী বিরচিত ভক্তিরত্নাকরে আমরা শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর মর্ত্যলীলার সামান্য কিছু পরিচয় পেয়ে থাকি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন গোপালের শিষ্য শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর ছিলেন নরহরির দীক্ষাগুরু। গোপালের অপর চারজন শিষ্য হলেন--- হরিবংশ, গোপীনাথ, শম্ভুরাম ও মকরন্দ।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর বিখ্যাত 'জৈবধর্ম' গ্রন্থে লিখে গেছেন, 'শুদ্ধ শৃঙ্গার-রসকে বিকৃত করিতে না পারে এবং বৈধী ভক্তির প্রতি কেহ অযথা অশ্রদ্ধা না করে, ইহার যে ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তাহা করার ভার শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর প্রতি ছিল।...তিনি শ্রীরূপাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও ভক্তিস্মৃতি প্রভৃতি অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।'*

গোপালের গ্রন্থাবলীর মধ্যে—'হরিভক্তিবিলাস,' 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁর ভাগবত-সন্দর্ভ গ্রন্থে লিখেছেন—গোপালভট্ট প্রাচীন বৈষ্ণবদের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তত্ত্ব নিয়ে একখানি তত্ত্বগ্রন্থ সংকলিত করেছিলেন। কিন্তু তাতে তত্ত্বাদি ক্রমভঙ্গ ও বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাই শ্রীজীব পর্যালোচনা করার পরে সেই সব তত্ত্বকে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করে তাঁর ভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ রচনা করেন।

গোপাল পঞ্চান্ন বছর ব্রজমণ্ডলে বাস করেন। পঁচাশি বছর বয়সে এক আষাঢ়ী শুক্লা-পঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে (১৫৮৫ খ্রীঃ) তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। অনেকের মতে তাঁর মর্ত্যলীলার কাল পঁচাত্তর বছর এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বছর ব্রজমণ্ডলে বাস করে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহ-রক্ষা করেন।

---

* শ্রীসজ্জনতোষিণী ২/৭

সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর অমর আত্মার উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে, বেরিয়ে আসি সেই জীর্ণ ভজন-কুটির থেকে। যত্নের অভাবে ভজন-কুটিরটি ভগ্নপ্রায়।

আমরা কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি। কেষ্টপ্রভু ভক্তি-রত্নাকর থেকে গোপালভট্টের জীবনী কীর্তন করছেন। আমি সহ-যাত্রীদের সঙ্গে গলা মেলাই—

'চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ।
চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন ॥
গোপাল-ভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়।
বোঙ্কট-ভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায় ॥
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কটতনয়।
প্রভু-পাদোদক-পানে হৈল প্রেমোদয় ॥
করয়ে যতন কত স্থির হইতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে ॥
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥'

একটি ছোট দরজা পেরিয়ে আমরা সংকেত-বিহারীর মন্দিরে এলাম। পাথরের প্রাচীন মন্দির। ভেতরে সংকেত-বিহারী ও সংকেতদেবীর দণ্ডায়মান মূর্তি। দু'পাশে একটু নিচে গৌর-নিতাই। আমরা দর্শন ও দণ্ডবৎ করি। তারপরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

পাশেই আর একটি মন্দির—তুলনায় বিশালতর। তাহলেও দরজা বন্ধ। দর্শন হল না।

মথুরা মহারাজ বলেন, "এটিই সংকেতদেবীর আদি-মন্দির। কিন্তু এখন ভেতরে কিছুই নেই।"

"কেন মহারাজ?" চক্রবর্তীর কণ্ঠে ব্যথার পরশ।

মহারাজ বলেন, "কিছুকাল থেকে এই মন্দিরের সেবাইতদের ভেতর পারিবারিক কলহ চলছিল। বলা বাহুল্য সেবাইতরা বাঙালী। যেমন-তেমন কলহ নয়, একেবারে মামলা-মোকদ্দমা। এই মন্দির তখন যে সরিকের দখলে ছিল, তাঁরা সেই মামলায় শেষ পর্যন্ত হেরে যান। প্রতিপক্ষ মন্দিরের দখল নিতে আসার আগেই আশাহত সেবাইত মূল-বিগ্রহ ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সংকেতদেবীর সেই সুপ্রাচীন বিগ্রহটিকে উদ্ধার করা যায় নি। আর সেই থেকেই এ মন্দির বিগ্রহশূন্য।"

চমৎকার! যে বাঙালীর ত্যাগ ও সাধনার ফলে লুপ্ত ব্রজমণ্ডল প্রকট হয়েছে, তাঁদের উপযুক্ত কাজই বটে! প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ব্রজমণ্ডল বাঙালীর অবদান। অথচ আজ এখানে বাঙালী লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এখানকার বাঙালীরা অবশ্য অভিযোগ করেন স্থানীয় জনসাধারণের প্রাদেশিক মনোভাবের জন্যই নাকি তাঁদের এ দুর্দশা। কিন্তু এ ঘটনা শোনার পরেও কি তাঁদের এই বক্তব্য মেনে নেওয়া সম্ভব? আর এমন ঘটনা তো শুধু এখানেই ঘটে নি, এমন ঘটনা ঘটেছে ব্রজমণ্ডলের বহু বাঙালী-মন্দিরে। আমার বিশ্বাস স্বার্থপরতা ও আত্মকলহের জন্যই বাঙালী আজ ব্রজমণ্ডলে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত। আর এই লাঞ্ছনা ও অপমানের উপশমের জন্য তাঁদের প্রথম প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার।

যাক্‌গে সে ভাবনা, সময় কম। এখানকার দর্শন সেরে যেতে হবে নন্দগ্রাম—এখনও মাইল দু'য়েক পথ। সেখানেও শুনেছি অনেক দর্শন আছে। অতএব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

আমরা প্রাচীন মন্দিরের পেছনদিকে আসি। মথুরা মহারাজ বললেন, "এটিও একটি রাসস্থলী।"

তা তো হবেই। সংকেত শুনে রাধা ছুটে আসতেন কৃষ্ণের কাছে। এখানে মিলন হত তাঁদের। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের সেই মিলন-

তীর্থের বর্তমান দুরবস্থা দেখে ব্যথিত না হয়ে পারছি না। চারদিকে কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়ে ছেয়ে গেছে। সাপ-কোপ থাকাও বিচিত্র নয় কিছু।

তবু সেই জঙ্গল ডিঙিয়ে পথ চলতে হচ্ছে আমাদের। একটু বাদে পৌঁছই একটি ছোট্ট মন্দিরের সামনে। এখানে দাঁড়িয়েই নাকি পৌর্ণমাসী সংকেত করতেন।

মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। তবুও সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি সেই শূন্য মন্দিরে।

মথুরা মহারাজ বললেন, "কয়েক বছর আগেও আমি কিন্তু এখানে যোগমায়াদেবীর মূর্তি দেখেছি। মাত্র বছর দু'য়েক হল চুরি হয়ে গেছে। তার পর থেকে এ মন্দিরটিও বিগ্রহহীন।"

জানকী মন্তব্য করে, "কিউরিও হান্টারদের কাজ মহারাজ। এখন সংকেতদেবীর সে বিগ্রহ হয়তো আমেরিকার কোন মিউজিয়ামের শোভা বর্ধন করছে।"

সংকেতের পশ্চিমে কয়েকটি কৃষ্ণলীলাস্থল আছে। এদের মধ্যে রিঠোর, ভড়খোরক্‌, মেহেরবান, সাঁতোয়া, পাইগাঁও, তিলোয়ার, শিঙ্গারবট, বিছোর, অন্ধোপ, সোন্দ, বোনছারী, হুড়েল, দইগাঁও লালপুর, হারোয়ান, সাঁচুলী ও গেঁড়ো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সময়াভাবের জন্য আমরা এগুলি দর্শন করতে পারব না। আমরা তাই পশ্চিমে না গিয়ে চলেছি উত্তরে—নন্দগ্রামের পথে।

সংকেত থেকে একটানা মাইল তিনেক হেঁটে পাবণ-সরোবরের তীরে পৌঁছলাম। এখান থেকেই নন্দগ্রাম বা নন্দগাঁওয়ের জনপদ শুরু হয়েছে। পাবণ-সরোবরকে নিয়ে নন্দগ্রাম অঞ্চলে ছাপ্পান্নটি কুণ্ড আছে।

বড় রাস্তা থেকে কয়েক পা এগিয়েই পাবণ-সরোবর—সুবিরাট জলাশয়। স্থানীয়রা বলেন পান-সরোবর। অনেকটা জাহাজের মতো আকৃতি। চারদিকেই বাঁধানো ঘাট। মথুরা জেলার বিখ্যাত

চারটি সরোবরের অন্যতম। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২৬৮ ও ১২৫ গজ। সরোবরের চারদিকে বেশ বড় বড় গাছ আছে। ছায়া-শীতল সুন্দর স্থান। কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না।

সরোবরের দক্ষিণতীরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটির। আমরা সেখানে এলাম। ছোট উঠোনের একদিকে ভজনস্থলী আর দু'দিকে কয়েকখানি ঘর—সেবাইতদের বাসগৃহ। চারদিক ঝক্‌ঝকে সাজানো-গোছানো—ভারী সুন্দর। মনটা আপনা থেকে ভক্তিতে ভরে উঠল।

দণ্ডবৎ করে আমরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়াই। গুরুমহারাজ নিজেই কীর্তন শুরু করলেন। তিনি শ্রীমনোহর দাস রচিত পদাবলী থেকে কীর্তন করছেন—

'জয় জয় পহুঁ "শ্রীল সনাতন" নাম।
সকল ভুবন মাহা যছু গুণ গ্রাম॥
তেজল সকল সুখ-সম্পদ অপার।
শ্রীচৈতন্যচরণযুগল করু সার॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ॥…'

শ্রীসনাতনকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে বেরিয়ে আসি তাঁর স্মৃতিধন্য ভজনস্থলী থেকে। এসে দাঁড়াই পাবণ-সরোবরের তীরে।

কথিত আছে, বিশাখার পিতা পাবণ এই সরোবর খনন করিয়েছেন। কৃষ্ণ এখানে গোচারণ করতে আসতেন। এটি রাধা-কৃষ্ণের একটি রাসস্থলী। শ্রীসনাতন যখন এসেছিলেন, তখন এখানে গভীর বন। সেই বনের ভেতরেই তিনি তিনদিন অনাহারী থেকে অহোরাত্র কৃষ্ণনাম জপ করেছিলেন। চতুর্থ দিন সকালে ব্রজ-শিশুর রূপ নিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একঘটি দুধ নিয়ে আসেন এবং তাঁকে এখানেই সাধন-ভজন করবার আদেশ দিয়ে যান।

শুধু সরোবর বা তীরভূমি নয়, ঘাটগুলিও ভারী সুন্দর। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের মহারাণী এই ঘাটগুলি তৈরি করে দিয়েছেন। এখনও কীর্তন চলেছে। সহযাত্রীদের বেরিয়ে আসতে দেরি আছে। কাজেই ঘাটের ওপরে একটু বসা যাক্।

দক্ষিণ-ঘাটের একদিকে শ্রীসনাতনের ভজন-কুটির আরেক-দিকে শ্রীবন মহারাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বেশ বড় কলেজ। শ্রীসনাতনের স্মৃতিধন্য পাবণ-সরোবরের প্রতি তিনিই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। রূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামিগণ তো শুধু ধর্মগুরু ছিলেন না, তাঁরা শিক্ষাগুরুও বটে। শিক্ষাব্রতী বন মহারাজ তাই মঠ কিংবা মন্দির নির্মাণ না করে, কলেজ তৈরি করেছেন। কৃষ্ণালয় নন্দগ্রামে তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর এ মহৎ প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

॥ নয় ॥

মহারাজ কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গোপরাজ নন্দ গোকুল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি গোপ-গোপীদের নিয়ে যেখানে এসে নতুন বসতি স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে সেই জনপদই নন্দগ্রাম নামে পরিচিত হয়। সুতরাং নন্দগ্রাম ভারতের প্রাচীনতম জনপদগুলির অন্যতম।

তাহলেও আজকের নন্দগ্রাম কোন্ বড় শহর নয়। মথুরা জেলার ছাতা তহশিলের অন্তর্গত ছোট একটি মফঃস্বল শহর। জনসংখ্যা ছ'হাজারের মতো। হাজারখানেক বাড়ি আছে। আয়তন ২,১২১'৩ হেক্টর। নন্দীশ্বর নামে ছোট একটি পাহাড়ের পাদদেশে ২৭°৪৩´ উঃ অক্ষাংশ ও ৭৭°২৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় গড়ে উঠেছে এই জনপদ। নন্দীশ্বরের স্থানীয় নাম ব্রহ্মা-কা পাহাড়। ৮৭৪ গজ দীর্ঘ এই পাহাড়টি বৈষ্ণবদের পরম-তীর্থ। বহু মন্দির রয়েছে সেখানে— নন্দরায়, নৃসিংহ, গোপীনাথ, নিত্যগোপাল, গিরিধারী, নন্দ-নন্দন, রাধামোহন, মনসাদেবী এবং যশোদানন্দজী বা নন্দরায় মন্দির।

জেলা-সদর মথুরা থেকে নন্দগ্রামের দূরত্ব ৩৫ মাইল এবং মহকুমা-সদর ছাতা এখান থেকে মাত্র ৮'৫ মাইল। রাধারাণীর পিত্রালয় বর্ষাণা নন্দগ্রামের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নন্দগ্রামের নিকটতম রেলস্টেশন কোশী-কালান, দূরত্ব ৭'৫ মাইল। তবে বাস কিংবা টাঙ্গায় সব সময়েই মথুরা যাওয়া যায়।

একটু আগেই বলেছি যে, বছর দু'য়েক হল বৃন্দাবন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সন্ন্যাসী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের চেষ্টায় পাবণ-সরোবরের তীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইণ্টার কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া নন্দগ্রামে রয়েছে কয়েকটি হাই স্কুল ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল।

জন্মাষ্টমীর সময় বড় মেলা হয় নন্দগ্রামে। তিন-চার হাজার দর্শনার্থী সেদিন এখানে আসেন। দোলের সময়ও খুব আনন্দ হয় নন্দগ্রামে। বর্ষাণার মানুষরা হোলি খেলতে এখানে আসেন। আবার নন্দগ্রামের মানুষরাও বর্ষাণায় যান। অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণের দেশের মানুষরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে হোলি খেলেন। খেলবেনই তো—রাধা-কৃষ্ণের দোললীলা যে আজও চলেছে, চিরকাল চলবে।

ভাবনায় ছেদ পড়ে। আমরা নন্দগ্রাম শহরে প্রবেশ করেছি। পথের দু'দিকেই দোকান। তবে মূল-শহর বাঁদিকে—নন্দীশ্বর পর্বতের ওপরে। কুড়েঘর থেকে দোতলা বাড়ি পর্যন্ত সবই রয়েছে নন্দগ্রামে। বাড়ি-ঘরের মাঝখানে, সবচেয়ে উঁচুতে মন্দির—নন্দরায় মন্দির, যেন হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছে আমাদের।

আমরা তাঁর কাছেই চলেছি। মূল-পথ থেকে বাঁদিকের নাতি-প্রশস্ত পথ ধরেছি। এ-পথেরও দু'দিকে সারি সারি দোকান—মুদি মনোহারী ও মিঠাইয়ের দোকান। পথটি আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে।

জনপথ হলেও রাজপথ নয়। বাস চলতে পারে না। টাঙ্গাও খুব কমই দেখতে পাচ্ছি। তবে মাঝে মাঝেই গরুর গাড়ি যাতায়াত করছে। আর দেখছি ঘাগরা পরা মেয়েদের। তারা কলসী কাঁখে জল আনতে যাচ্ছে। বিগত তিনহাজার বছরে জগতের এত পরিবর্তন হল, অথচ এই দৃশ্যটি একই রয়ে গেল। আর তাই বোধহয় দলের কীর্তনীয়ারা চণ্ডীদাসের গান ধরেছেন—

'সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে
ঝঙ্কার করয়ে ফেরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী
সদাই মনেতে জাগে॥...'

একালের ব্রজবালারা এখন কিন্তু পথ-চলা থামিয়েছেন। পথ-চারীদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছেন। দেখবেনই তো, আমরা যে যাত্রায় এসেছি—আমরা আজ নন্দগ্রামের ভি. আই. পি.।

আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা নন্দীশ্বর পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছল। শুরু হল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য ভরতপুর থেকে পাথর এনে এই সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। ধাপগুলো কিন্তু খুবই খাড়া। আমার সহ-যাত্রীরা অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সুতরাং আস্তে আস্তে উঠতে হচ্ছে।

অনেকটা উঠে নৃসিংহজীর মন্দির। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করি।

ছোট মন্দির। ভেতরটা অন্ধকার। প্রদীপের মৃদু আলোয় বিগ্রহকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করি। তারপরে বেরিয়ে আসি উঠোনে। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একটি বাঁধানো উঠোন। এখন নিচের থেকে নন্দগ্রামকে ভারী ভালো লাগছে।

আবার শুরু হল সিঁড়ি ভাঙা। খানিকক্ষণ পরে পৌঁছলাম যশোদা-নন্দজী মন্দিরে—নন্দগ্রামের মূল-মন্দিরে।

মাঝারী আকারের কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির। তোরণ পেরিয়েই প্রশস্ত অঙ্গন। মধ্যস্থলে মন্দির। দু'টি অংশে বিভক্ত—নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির। নাট-মন্দিরের চারদিক খোলা। চার-সারি সুদৃশ্য শ্বেত-পাথরের স্তম্ভের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে ছাদটি। মন্দিরের মেঝে ও সিঁড়ি শ্বেত-পাথরের। ভেতরের সিলিং-য়ে সর্বত্র রঙিন পাথরের কারুকার্য।

মধু-বৃন্দাবনে পথ-পরিক্রমায় বেরুলেই ব্রজবাসীদের দান করতে হয়। তাই প্রতিদিন যাত্রা শুরু করার আগে আমরা ভাঙানি যোগাড় করে নিই। কিন্তু এতদিন দেখেছি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই পয়সা চান। আজ কিন্তু মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই একজন স্বাস্থ্যবান যুবক সামনে এসে হাত বাড়ালো। কাতরকণ্ঠে বলল, "মহারাজ, দান দেও।"

পকেটে হাত দিই।

"আরে ঘোষবাবু, আপনার কি মশয় কোনকালে বুদ্ধি-টুদ্ধি হইব না?"

নরেনপ্রভুর আচমকা প্রশ্নে ভড়কে যাই। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে হাত বের করে আনি। পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা নরেনপ্রভুর দিকে তাকাই। সভয়ে জিজ্ঞেস করি, "হঠাৎ একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন প্রভু?"

"উল্টা আবার ঠ্যাডা তক্ক করতে আছেন? না মশয়, আপনার কিছুই হইব না। আপনি অযথাই কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করতে আইছেন। কৃষ্ণ-ভগবান আপনারে কৃপা করব না।"

অপরাধ না জেনেও চুপ করে থাকি। আগেই বলেছি, নরেনপ্রভু শুধু আশ্রমের ক্যাশিয়ার-কাম্-মার্কেটিং ম্যানেজার নন, তিনি গুরু-মহারাজের বাল্যবন্ধু।

আমাকে নীরব থাকতে দেখে বোধকরি নরেনপ্রভুর কিঞ্চিৎ করুণার উদ্রেক হয়। তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলেন, "আরে মশয়, বুড়া-গুড়ারে পয়সা দ্যান্, ঠিক করেন। পরিক্রমায় আইছেন, দান তো করবেনই—করতেই হইব। কিন্তু এই জুয়ান ব্যাডারে পয়সা দিতে আছিলেন ক্যান?"

জানকী পাশে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে। কিন্তু আমাকে নীরব থাকতে হয়। আর তাতেই কাজ হয়ে যায়। নরেনপ্রভু আমার হয়ে ওকালতি শুরু করেন। সেই প্রার্থীটিকে বলেন, "আরে বাপু, তোম্ ভিক্ষা মাংতা হায় কাহে? জুয়ান আদমী হায়, গতর খাটাইয়া কাম করতে নাহি পারতা?" একবার থামেন তিনি। তারপরে আমাদের সকলের তরফ থেকে ঘোষণা করেন, "হামলোক ছোটা-ছোটা লেড়কা-লেড়কী আর বড়া-বড়া বুড্ঢা-বুড্ঢী ছোড়্কে আর কাউরে দান নাহি করতা হায়।"

লোকটি নরেনপ্রভুর হিন্দী কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল জানি

না, কিন্তু নরেনপ্রভুর উদ্দেশ্য সফল হল। লোকটি নিঃশব্দে সরে পড়ল।

নরেনপ্রভু একটু সরে যেতেই সস্ত্রীক খাণ্ডাপ্রভু আমার সামনে হাজির হন। তাঁরা মেদিনীপুরের লোক এবং গুরুমহারাজের প্রৌঢ় শিষ্য-শিষ্যা।

মিসেস খাণ্ডাই প্রথম কথা বলেন, "দণ্ডবৎ প্রভু!"

"দণ্ডবৎ!" আমি প্রতি-নমস্কার করি।

মিসেস বলেন, "বৃন্দাবনের চা-য়ের দোকানে বসে সেদিন আপনার কৃপাভিক্ষা করেছিলাম!"

ঠিক মনে পড়ছে না। তাই নীরবে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি।

এবারে খাণ্ডা কথা বলেন, "আপনার বোধ করি স্মরণ নেই··· সেদিন উনি আপনাকে বলেছিলেন, পরিক্রমার সময়ে আমাদের তু'জনের একখানি ছবি তুলে দিতে।"

হ্যাঁ, কথাটা মনে পড়েছে। বলেছিলেন বটে, ছিঃ ছিঃ, আমি যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই তাড়াতাড়ি বলি, "ও, সেই কথা! বেশ তো, অসুবিধে না হলে, আজই তুলে দিচ্ছি।"

"আমাদের আর অসুবিধে কি?" খাণ্ডাপ্রভু মিসেসের দিকে তাকান।

মিসেস বলেন, "না, আমাদের কোন আপত্তি নেই, আপনার কৃপা হলে এখানেই তুলতে পারি।"

কৃপা শব্দটা প্রত্যেকবারেই আমার কানে বাজছে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারি না। শব্দটা যে বৈষ্ণব-বিনয়ের অঙ্গীভূত। এঁরা সবাই ভক্ত-বৈষ্ণব। সুতরাং সে প্রসঙ্গ না তুলে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় বসে তুলবেন?"

"আপনি যেখানে বলবেন!"

একবার চারদিক দেখে নিয়ে বলি, "ওপাশে দেখছি ছাদে যাবার সিঁড়ি রয়েছে, চলুন না ছাদে গিয়ে দেখা যাক্ একবার।"

"বেশ, চলুন।" ওঁরা আমাকে অনুসরণ করেন।

আমরা ছাদে আসি। আমার অনুমান মিথ্যে নয়। ছবি নেবার ভাল জায়গা রয়েছে। খাণ্ডা-দম্পতিকে বসতে বলি সেখানে। ক্যামেরা ঠিক করে নিয়ে, শাটার টিপি।

"দারুণ ছবি হবে দিদি! বাড়ি ফিরে ছেলে-মেয়ে ও পাড়া-পড়শীদের দেখাতে পারবেন। শত্রুদেরও স্বীকার করতে হবে, আপনারা বন-পরিক্রমা করেছেন।"

জানকী কখন আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে টের পাই নি। তার কথা শুনে মিসেস খুশি হন। তাঁর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি। হাসি পাচ্ছে আমারও, কিন্তু কষ্ট করে হাসি চেপে রাখতে হয়।

মিস্টারও খুশি হয়েছেন। তিনি জানকীকে বলেন, "তুমিও তুলবে নাকি একটা?"

"না।" সঙ্গে সঙ্গে জানকী জবাব দেয়।

"কেন?" মিসেস বিস্মিতা।

"আমি যে বন-পরিক্রমা করছি, এটা কলকাতায় গিয়ে প্রমাণ করবার দরকার নেই বলে।"

মিস্টার ও মিসেস গম্ভীর হয়ে যান। বাস্তবিক, কথাটা বলা উচিত হয় নি জানকীর। আমি বলি, "ওনারা সেজন্য ছবি তুললেন, একথা কে বলল তোমাকে?"

"তাহলে কি জন্য তুললেন?" জানকী আমাকে পাল্টা-প্রশ্ন করে।

"বন-পরিক্রমার স্মৃতি রক্ষার জন্য।"

"ঠিকই বলেছেন প্রভু!" খাণ্ডাপ্রভু প্রায় লাফিয়ে ওঠেন। আমি যে তাঁর মনের কথাটি বলে দিয়েছি।

তবে জানকী এত সহজে হার মানার মেয়ে নয়। সে জবাব দেয়, "তাহলে বলব, তেমন করে আমি এ পরিক্রমার স্মৃতি রক্ষা করতে চাই না।"

"সে কি!" মিসেস খাণ্ডা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "তুমি কি এ পরিক্রমার স্মৃতি রক্ষা করতে চাও না?"

"চাই বৈকি!" জানকী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "কিন্তু তা ফটোর মতো স্থূল পদার্থের মধ্যে নয়, আমি এ পরিক্রমার স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করব আমার মনের মুকুরে।"

একথার জবাব জানা নেই খাণ্ডা-দম্পতির। সুতরাং তাঁরা একটু হেসে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান। আমি তাঁদের অনুসরণ করি। জানকী আমার সঙ্গী হয়।

নিচে নেমে এসে দেখি নরেনপ্রভু সম্পূর্ণ পরাজিত। তিনি যাকে তাঁর অপরূপ হিন্দীর সাহায্যে বিতাড়িত করেছিলেন, সে আবার ফিরে এসেছে। এবং এখন সে আর একা নয়, তার কোলে একটি বছর তিনেকের ফুটফুটে মেয়ে। ঘরে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এসেছে।

আমাকে দেখতে পেয়েই লোকটি ছুটে আসে কাছে। বলে, "মহারাজ! ইয়ে ছোটি রাধারাণী, দান দেও।"

শ্রীরাধিকা ব্রজেশ্বরী। তিনিই শ্রীকৃষ্ণকে দান দিয়েছিলেন। তাঁর কোনদিন কারও দান গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়েছিল বলে জানা নেই আমার। তাহলেও পকেটে হাত দিতে হয়। 'ছোটি রাধারাণী'র হাতে দশটি পয়সা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে আসি নন্দরায় মন্দির থেকে। সংকীর্তন শোভাযাত্রার সামিল হই। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করি।

আসার সময় সুদীর্ঘ একসারি সিঁড়ি বেয়ে যশোদা-নন্দজী মন্দিরে এসেছিলাম। নামার সময় কিন্তু আর শেষ পর্যন্ত নামতে হল না। খানিকটা নেমেই ডানদিকে একটি মেঠোপথ পাওয়া গেল। পথটি সামান্য চড়াই। আমরা সেই পথে এগিয়ে চললাম।

মনে মনে নন্দরায় মন্দিরের কথাই ভেবে চলি—নন্দীশ্বর শিখরে অবস্থিত এই মন্দিরটি নন্দগ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় মন্দির, পুণ্যতম

তো বটেই। তবে বর্তমান মন্দিরটি মোটেই প্রাচীন নয়। জাটরাজা রূপ সিং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। পাণ্ডারা বলেছেন—এখানেই ছিল গোপরাজ নন্দের প্রাসাদ। সুতরাং এটি মধু-বৃন্দাবনের একটি পবিত্রতম তীর্থ।

কয়েক পা এগিয়েই নন্দীশ্বর মহাদেব। কথিত আছে, রাজা মহীভানু বহুকাল অপুত্রক থাকার পরে নন্দীশ্বরের কাছে পুত্র কামনা করলে বৃষভানুর জন্ম হয়। এখনও নাকি নন্দীশ্বরের কাছে কোন কামনা করলে তিনি সে প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না।

দর্শন শেষে আমরা ফিরে চলেছি রাতের আশ্রয়ে। কেষ্টপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নন্দগ্রাম দর্শনের কাহিনী কীর্তন করেছেন—

'তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর।
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল॥
পাবণাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল পর্বত উপরে যাইয়া॥
কিছু দেবমূর্তি হয় পর্বত উপরে।
লোকে কহে—মূর্তি হয় গোফার ভিতরে॥···
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া।
তিন মূর্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল' চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্বাঙ্গ-স্পর্শন॥'

কেষ্টপ্রভু আরও অনেক কথা গেয়ে চলেছেন। কিন্তু সেকথা কানে যাচ্ছে না আমার। আমি ভেবে চলি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা। ভাবি এও সেই একই ইতিহাস। রাধাকুণ্ডের মতো বর্তমান নন্দগ্রামেরও প্রকৃত প্রবর্তক শ্রীগৌরাঙ্গদেব। সেদিন যদি তিনি সেই

লুপ্ত তীর্থকে প্রকট না করে তুলতেন, তাহলে হয়তো নন্দগ্রাম আজও তেমনি অনাদৃত গণ্ডগ্রামই থেকে যেত।

মনে পড়ছে আরও একজনের কথা—ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের কথা। মহাপ্রভু সেদিন যে নন্দগ্রামকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তীর্ণ করিয়েছিলেন, বন মহারাজ সেই নন্দগ্রামকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করে তুললেন। সেকালের মানুষ মহাপ্রভুর কাছে যেমন ঋণী, একালের মানুষও বন মহারাজের কাছে তেমনি ঋণী হয়ে রইল।

॥ দশ ॥

আজ আমাদের বন-পরিক্রমার একাদশ দিন। সকালে নন্দগ্রাম থেকে রওনা হয়ে দু'মাইল হেঁটে এইমাত্র যাবট পৌঁছলাম। যাবট দর্শন করে আজ আমরা কোশী যাব। কোশী ব্রজের দ্বারকা।

কিন্তু কোশীর কথা এখন নয়। এখন যাবটের কথা হোক্। আমরা যে যাবটে এসেছি। যাবট একটি ছোট গ্রাম, কিন্তু অনেক দর্শন আছে এখানে। আছে গুটি-দশেক কুণ্ড এবং পাঁচটি মন্দির ও স্থল। সবকিছু দর্শন করতে হলে সারাদিন লেগে যাবে। সে সময় নেই। সুতরাং আমরা কেবল এখানকার মূল-মন্দিরটি দর্শন করব।

সেখানেই চলেছে সংকীর্তন শোভাযাত্রা—রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ি অর্থাৎ আয়ান বা রায়াণ ঘোষের বাড়িতে।

যাবট খুবই প্রাচীন গ্রাম। মহাপ্রভু এবং রূপ-সনাতনের আমলে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে এখানে একটি জনবহুল জনপদ ছিল।

সমানে কীর্তন চলেছে। কিন্তু আমরা কয়েকজন কীর্তন করতে পারছি না। শুনছি ভক্তি মহারাজের বক্তৃতা। তিনি বলছেন, "সুদামের অভিশাপে রাধা-বরাহকল্পে শ্রীরাধিকা বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে রাবেল নগরে অবতীর্ণা হন। বৃষভানুজায়া কলাবতী বায়ুগর্ভ ধারণ করেন। যথাকালে তিনি বায়ু-প্রসব করলে অযোনিসম্ভূত শ্রীরাধা উৎপন্ন হলেন।

"বারো বছর বয়সে শ্রীরাধা বৃষভানুসুতায় নিজ ছায়া স্থাপন করে অন্তর্হিতা হন। সেই ছায়ার সঙ্গেই রায়াণের বিবাহ হয়।" একবার থামলেন ভক্তি মহারাজ। তারপরে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "বুঝতে পারলেন?"

বিপদে পড়লাম। কি উত্তর দেব? কিছুই যে বুঝতে পারি নি। কিন্তু সেকথা বলি কেমন করে?

কিছুই বলতে হল না আমাকে। মাঝখান থেকে চক্রবর্তী বলে উঠল, "হ্যাঁ, মহারাজ।"

"কি বুঝলেন বলুন তো?" ভক্তি মহারাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন।

নাঃ, চক্রবর্তীর আর শিক্ষা হবে না। এর আগেও এমনি উত্তর দিয়ে সে বহুবার বিপদে পড়েছে। কি দরকার বাপু তোমার এমন আগ বাড়িয়ে কথা বলার? এখন ঠেলা সামলাও! আমরা এক-পা, দু'-পা করে সরে পড়ি।

প্রকাণ্ড একটি দীঘির পাড় দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। দীঘির দিকে ইসারা করে মথুরা মহারাজ বলেন, "এই জলাশয়ের নাম পারলগঙ্গা বা পিয়লকুণ্ড। এর পশ্চিমতীরে রাধারাণীর রোপণ করা একটি ফুলগাছ আছে। সেই গাছের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে তিনি কৃষ্ণকে দিতেন। বৈশাখ মাসে চমৎকার সুগন্ধী ফুল ফোটে গাছটিতে। স্থানীয়রা নাম দিয়েছেন পারিজাত।"

সামনে একটি বাড়ি দেখা যাচ্ছে। চারদিকে ফাঁকা মাঠ, তারই মাঝে গাছে-ছাওয়া রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ি।

ছোট হলেও বাড়িটি দোতলা। তবে জরাজীর্ণ এবং মোটেই মন্দিরের মতো নয়। কেনই বা হবে, এটি তো আয়ান এবং জটিলা-কুটিলার বাসগৃহ। শ্রীরাধিকারও বটে। তবে সে রাধা ছায়া কি কায়া, তা বলতে পারব না।

আমরা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করি। সামনেই বড় একটি ঘরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। রায়াণ ঘোষের বাড়িতেও কৃষ্ণের মূর্তি। ভক্তরা বড়ই নিষ্ঠুর।

কৃষ্ণভক্তদের কীর্তি আর কি। কৃষ্ণ ছাড়া রাধার মূর্তি স্থাপন

করতে পারেন নি তাঁরা। ভাগ্যিস জটিলা-কুটিলা বেঁচে নেই। থাকলে আর এক কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত এই যাবট গ্রামে।

বেঁচে না থাকলেও জটিলা-কুটিলার মূর্তি এখানে রয়েছে বৈকি। শুধু তাঁরাই নন, রায়াণের একটি মূর্তিও রয়েছে। তবে তা বড় ঘরখানিতে নয়। তাঁদের মূর্তি রয়েছে অন্ধকারে বারান্দার এক কোণে। খুবই স্বাভাবিক। কর্তব্যের খাতিরে কৃষ্ণভক্তদের রায়াণ এবং জটিলা-কুটিলার তিনটি মাটির মূর্তি তৈরি করতে হয়েছে বলে তাঁরা কি সেগুলোকে বড় ঘরে ঠাঁই দিতে পারেন? হোক্ না এটা রায়াণ ঘোষের বাড়ি! রাধা যাঁকে ভালোবাসতেন না, কৃষ্ণভক্তরা তাঁর প্রতি সুবিচার করবেন কেমন করে?

বারান্দা থেকে আমরা সিঁড়ি-কোঠায় আসি। সিঁড়ির সামনে, দেওয়ালে বাংলায় লেখা রয়েছে—'শ্রীল জগদানন্দ দাস বাবাজী মহারাজের স্মরণার্থে তদীয় শিষ্য বৈষ্ণব চরণদাস ১৩৪৩ সালে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন।'

বাবাজী ও চরণদাস উভয়েই আমার অপরিচিত। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ভদ্রলোক শুধু সাল লিখলেন কেন? সংবৎ, খ্রীষ্টাব্দ, শকাব্দ কিংবা বঙ্গাব্দ কেন উল্লেখ করলেন না? তবে মনে হচ্ছে সাল বলতে তিনি বঙ্গাব্দই বুঝিয়েছেন। কারণ সংবৎ, খ্রীষ্টাব্দ ও শকাব্দ হলে এই বাড়িটির বয়স যথাক্রমে ৬৮৩, ৬২৬ অথবা ৫৪৮ বছর হয়ে যাচ্ছে—যা একেবারেই অসম্ভব। আর বঙ্গাব্দ হলে বাড়িটার বয়স দাঁড়াচ্ছে মাত্র ৩৭ বছর। তাই হবে। অর্থাৎ এটি আয়ান ঘোষের বাসস্থান হতে পারে, কিন্তু এ বাড়িটি আয়ানের নয়।

সরু সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠে আসি। চিলে-কোঠায় একটি ছোট জানালা রয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জনৈক ব্রহ্মচারী বলেন, "রাধারাণী এই জানালা দিয়ে দেখতেন কৃষ্ণ আসছেন কিনা। কৃষ্ণকে দেখতে পেলেই তিনি ছুটে যেতেন তাঁর কাছে।"

আশ্চর্য! এ কাহিনী শোনার পরেও আমাকে ভাবতে হবে রাধারাণীর ছায়ার সঙ্গে রায়াণের বিয়ে হয়েছিল! না ভেবে উপায় নেই, কারণ ভক্তি মহারাজ বলে দিয়েছেন—তিনি পণ্ডিত মানুষ।

আমরা ছাদে উঠে আসি। ছোট ছাদ। দূর থেকে বাড়িটিকে দোতলা মনে হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একতলা। দোতলায় শুধু একখানি ঘর—এই চিলে-কোঠাটি।

ছাদ থেকে কিন্তু বর্ষাণা ও নন্দগ্রামকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সমস্ত যাবট গ্রামটিকে।

যাবটে বহু দর্শন রয়েছে, তার মধ্যে রাধাকান্ত ও কিশোরীজীউর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রয়েছে বারোটি কুণ্ড—কিশোরীকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, কুণ্ডলকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, যুগলকুণ্ড, বিহ্বলকুণ্ড, কানিহারীকুণ্ড, লাড়োলিকুণ্ড, নারদকুণ্ড, ধর্মকুণ্ড ও পারলগঙ্গা।

রয়েছে ডহরবন, কোকিলাবন, বেরিয়া ও বৎসখোর। বৎসখোরে শ্রীরাধিকা সুবলের বেশে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

কিন্তু সময়াভাবের জন্য আমরা এ-সব কিছুই দেখতে পাব না। এমন কি কোকিলাবনে পর্যন্ত যেতে পারব না। এখান থেকেই আমাদের সোজা কোশী চলে যেতে হবে।

কোকিলাবন যাবটের দু'মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। কথিত আছে, কৃষ্ণ নাকি সেখানে কোকিলের মতো গান করে কৌশলে শ্রীরাধিকার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ভাদ্র শুক্লা-দশমীতে কোকিলাবনে রাসলীলার অভিনয় হয়। দু'টি কুণ্ড আছে ঐ বনে—কৃষ্ণকুণ্ড ও বলরামকুণ্ড।

যাক্‌গে, সে-সব কথা। এবারে রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ির কথা হোক্‌। আমরা যে ছাদে দাঁড়িয়ে আছি, তার প্রায় কেন্দ্রস্থলে একখানি শ্বেত-পাথরে ছোট একজোড়া পা খোদাই করা রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে মাত্র কয়েকদিন আগে পাথরখানি বসানো হয়েছে।

এখনও চারিদিকে নতুন সিমেণ্টের দাগ লেগে রয়েছে। তাহলেও মহারাজরা বলছেন—রাধারাণীর চরণ-চিহ্ন।

অতএব প্রণাম করি। আমরা প্রকৃতই ভক্ত। কে বলে এ দেশটা ম্লেচ্ছ হয়ে গিয়েছে!

প্রণামের পরে কীর্তন শুরু হয়েছে। সুযোগ বুঝে দল ছেড়ে ছাদের এককোণে এসে দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্ভাগা রায়াণের কথা ভাবতে থাকি। তাঁকে জব্দ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে একবার মা-কালীর রূপ পর্যন্ত ধারণ করতে হয়েছিল। গল্পটা মনে পড়ছে আমার—

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার কথা তখন ব্রজের ঘরে ঘরে প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। অনেকের কাছেই সেই প্রেম নিষিদ্ধ-প্রেমের পর্যায়ভুক্ত। ঘরে-বাইরে পথে-প্রান্তরে আর যমুনার ঘাটে-ঘাটে ব্রজনারীরা সে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। রাধারাণীর দুর্নামে কান পাতা দায়।

জটিলা এবং কুটিলাও সে আলোচনায় অংশ নেন। তবে প্রতিবেশীরা যখন রাধার সঙ্গে আয়ানকে গালমন্দ করেন, তখন জটিলা ব্যথা পান, শত হলেও তিনি মা।

প্রতিবেশীরা কিন্তু তাঁর কষ্টের কথা ভাবেন না। তাঁরা বলেন—আয়ান পুরুষ হয়েও মেয়ে-মানুষ। নইলে অমন বউকে নাক-কান কেটে মাথা মুড়িয়ে ধানে-ভাতে খাওয়ানো উচিত।

তাঁরা তাকে পরামর্শ দেন—বেটাকে বল, বৌকে একটু শাসন করতে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে জটিলা ও কুটিলা ঘাট থেকে ঘরে ফিরে আসেন। এসে দেখেন উনুন জ্বলছে, কিন্তু রাধা বাড়ি নেই।

থাকবেন কেমন করে? উনুন ধরিয়ে রান্না চড়াতে যাবেন এমন সময় কানুর বেণুগীতি রাধার কানে এসে পশেছিল। তাই রান্না রয়েছে পড়ে, রাধা সখীদের সঙ্গে কাননে ছুটে গিয়েছেন।

জটিলা রেগে আগুন হলেন। কিন্তু কুটিলা বললেন—ভালই

হল। ধর্ম আমাদের সহায়। আজ দাদা আসুক, একেবারে হাতে-নাতে ধরিয়ে দেব।

কিছুক্ষণ বাদেই ক্ষুধার্ত আয়ান ঘরে ফিরে এলেন। একে তো রান্না হয় নি, তার ওপরে কুটিলা সবিস্তারে সব কথা বললেন তাঁকে। বললেন—তোমার বউ-য়ের দুর্নামে ব্রজের মাঠে-ঘাটে কান পাতা দায়। অমন বউকে ঘরের কড়ি দিয়ে বেচে আসতে হয়। আগে রাতে যেত, এখন একেবারে দিন-দুপুরে কুঞ্জলীলা শুরু করেছে।

—কেন, বউ যে আমাকে বলেছে, সে শ্যামাপূজা করতে বনে যায়! আয়ান প্রতিবাদ করেন।

কর্কশকণ্ঠে কুটিলা উত্তর দেন—শ্যামাপূজা নয়, শ্যামের পুজো।

আয়ান জিজ্ঞেস করলেন—ধরিয়ে দিতে পারিস ?

—হ্যাঁ, একেবারে হাতে-নাতে। তুমি চল না আমার সঙ্গে।

প্রকাণ্ড একখানা লাঠি হাতে নিয়ে আয়ান কুটিলাকে বললেন—চল তো দেখে আসি বউ কোথায় যায়, সে বনে গিয়ে কি করে ?

এদিকে কালিন্দীর কুলে তখন কুঞ্জলীলা শুরু হয়েছে। সখীরা ফুল তুলছেন, রাধারাণী রাধাবল্লভকে সাজাচ্ছেন। এমন সময় দূরে অস্থির পদধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। সখীরা ছুটে এসে রাধাকে জানালেন—সর্বনাশ, আয়ান আসছে !

ভীত-বিহ্বলা রাধারাণী তাঁর শ্যামচাঁদের দিকে তাকালেন। রাধা-গোবিন্দ একবার মৃদু হাসলেন। তারপরেই শ্রীরাধিকা দেখতে পেলেন, শ্যামচাঁদ শ্যামার মূর্তি ধারণ করেছেন। চোখের পলকে দ্বিভুজ-কৃষ্ণ চতুর্ভুজা-কালী হয়েছেন। তাঁর সামনে করালবদনা লোলরসনা মুণ্ডমালা-শোভিতা মহাকালী বিরাজ করছেন।

ইতিমধ্যে ক্রুদ্ধ আয়ান বিলাসকুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কোথায় কৃষ্ণ! এ যে তাঁর ইষ্টমূর্তি—স্বয়ং শ্যামা। রাধার প্রতি স্নেহ ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি গদগদ কণ্ঠে বলে উঠলেন—রাধে তুমি ধন্য,

আজ আমাকেও তুমি ধন্য করলে। তোমার পুণ্যে আমি আজ আমার ইষ্টদেবীর দর্শন পেলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, আর কখনও আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব না।

আয়ান বিনম্রচিত্তে কৃষ্ণকালীকে প্রণাম করলেন।

একবার মা-যশোদার সমুদ্র দর্শনের সাধ হল। কিন্তু দ্বারকা না গেলে তো সমুদ্র দর্শন সম্ভব নয়। অথচ গোকুল থেকে দ্বারকা যে বহুদূর।

তাহলেও কথাটা তিনি একদিন বললেন গোপালকে। আর তা শুনেই গোপাল বলে উঠলেন—এ আর এমন একটা কঠিন কাজ কি? যেদিন ইচ্ছে তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে সমুদ্র দর্শন করিয়ে আনব।

যশোমতী একটু অবাক হলেন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—দ্বারকার আগে তো সমুদ্র নেই। দ্বারকা যে বহুদূর। আমি কি পারব অত দূর যেতে?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—কেন পারবে না? তাছাড়া কে বললে দ্বারকা বহুদূর? দ্বারকা তো ব্রজমণ্ডলে। তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমি এখুনি তোমাকে দ্বারকা দেখিয়ে আনছি।

মা ছেলেকে জানতেন। পূতনাবধ, শকট-ভঞ্জন, কালীয়দমন, যমলার্জুন-ভঞ্জন, বৎসাসুর, বকাসুর ও অঘাসুর বধ এবং ব্রহ্মাণ্ডদর্শন প্রভৃতি লীলার ভেতর দিয়ে কৃষ্ণ বহুবার অসাধ্য সাধনের প্রমাণ দিয়েছেন। তাই যশোদা কোন প্রতিবাদ না করে কৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকা রওনা হলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই তাঁরা পৌঁছলেন একটি কুণ্ডের তীরে। গোপাল বললেন—মা, আমরা দ্বারকায় এসে গিয়েছি। তুমি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছো। এবারে দর্শন করো।

মা বিরক্ত হলেন। প্রশ্ন করলেন—সমুদ্র কোথায়? এ তো একটা কুণ্ড।

—ভাল করে তাকিয়ে দেখো।

মা আবার তাকালেন সেই কুণ্ডের দিকে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, ঊর্মিমালা মুখরিত সীমাহীন মহাসাগরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। ফেনিল তরঙ্গরাশি মাঝে মাঝেই ছুটে এসে তাঁর পদযুগলকে সিক্ত করছে। তারপরে ফিরে যাচ্ছে সাগরে।

পুলকিতা জননী সস্নেহে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বার বার বলতে থাকলেন—বেঁচে থাক্ বাবা, তুই আমাকে সত্যই সমুদ্র দর্শন করালি। আমার মনোবাসনা পূর্ণ হল।

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কৃষ্ণ জানালেন—মা, এই কুণ্ডরূপ সমুদ্র হল রত্নসাগর। আর এই পুণ্যভূমি হল কুশস্থলী বা কোশী। কোশী আজ থেকে ব্রজের দ্বারকায় পরিণত হল।

আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা এইমাত্র সেই রত্নসাগরের তীরে এসে দাঁড়ালো। মাঝারি আকারের একটি সাধারণ কুণ্ড। কিন্তু একে অবলম্বন করেই সেই অসাধারণ কাহিনীটি যুগ যুগ ধরে কথিত হয়ে আসছে।

মা-যশোদা সত্যই কোনদিন কৃষ্ণের সঙ্গে এই কুণ্ডের তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিনা জানি না। তিনি এই কুণ্ডের জলে সাগরের জলোচ্ছ্বাস দেখেছিলেন কিনা তাও জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি—যুগ-যুগান্ত ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনিভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে। আমার সহযাত্রীদের মতো তাঁরাও ভক্তিপ্লুত অন্তরে এই কুণ্ডের জল স্পর্শ করেছেন। ভক্তিহীন অবৈষ্ণব হয়েও তাদের অনুসরণ করা ছাড়া উপায় নেই আমার। আমি ধার্মিক না হতে পারি, কিন্তু ভারতের সংস্কৃতিকে অস্বীকার করব কেমন করে? শ্রীকৃষ্ণ যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক।

সুতরাং সহযাত্রীদের সঙ্গে আমিও নেমে আসি ঘাটে। জল

স্পর্শ করে আবার উঠে আসি ওপরে। সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে কোশীর পথে।

কোশী মথুরা জেলার একটি সুপ্রাচীন নগরী। বর্তমান নাম কোশী-কালান। ২৭°৪৮′ উঃ অক্ষরেখা ও ৭৭°২৬′ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই জনপদ। হাজার তিনেক বাড়ি আর হাজার আঠারো মানুষ নিয়ে শহর।

রেল-স্টেশনের নামও কোশী-কালান। স্টেশনটি মধ্য রেলওয়ের আগ্রা-দিল্লী রেলপথে অবস্থিত।

মথুরা থেকে কোশীর দূরত্ব ২৮ মাইলের মতো। দু' নম্বর 'ন্যাশনাল হাইওয়ে' বা আগ্রা-দিল্লী জাতীয় সড়কটি কোশীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে। মথুরা দিল্লী ও নন্দগ্রামের সঙ্গে কোশীর নিয়মিত বাস যোগাযোগ রয়েছে। গাড়িতে করে মথুরা থেকে নন্দগ্রাম যেতে হলে কোশী হয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমরা নন্দগ্রাম থেকে এখানে এসেছি।

এবং আমরা রেল কিংবা বাস কোনটাতেই আসি নি। এসেছি পায়ে হেঁটে—অন্য পথে। আমরা যে ব্রজ-পরিক্রমা করছি।

দলের অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তাই ধীরে ধীরে হাঁটতে হয়েছে। পৌঁছতে দেরি হয়ে যাওয়ায় দুপুরে আর কোন দর্শন হয় নি। একেবারে প্রসাদের পরে শুরু হয়েছে দর্শন—কোশী-প্রদক্ষিণ।

আমরা প্রথম দর্শন করলাম রত্নাকরকুণ্ড বা রত্নসাগর। তারপরে একে একে মাভৈকুণ্ড, ভিক্ষাকুণ্ড ও গোমতীকুণ্ড। এখন চলেছি বিহারীজীর মন্দিরে। পথে পড়বে সরাই শাহী—দেওয়াল-ঘেরা সুবিশাল এলাকা। মহামতি আকবরের রাজত্বকালে তৎকালীন কোশী পরগণার শাসক খাজা ইতিবর খান নির্মাণ করেছিলেন সেই ঘেরা। এখন নাকি সেটি কোশীর বড় বাজার।

বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে মথুরা জেলায় কোশীর একটি উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। এখানকার প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তূলা গুড় তৈলবীজ

গম যব বজরা জোয়ার ডাল এবং গোরু। প্রতি মঙ্গলবারে ঘেরায় হাট বসে। শত-শত গোরু কেনা-বেচা হয়।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কোশী শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। এখানে কলের জল ও বৈদ্যুতিক আলো রয়েছে। 'লোড্ শেডিং' আছে কিনা জানার সুযোগ হয় নি এখনও। রয়েছে স্কুল কলেজ হাসপাতাল থানা ডাক ও তারঘর, সাধারণ গ্রন্থাগার, সিনেমা হল এবং চারটি ধর্মশালা। তারই একটিতে উঠেছি আমরা।

ছোট শহর হলেও কোশী ইতিহাসে মোটেই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরে এ অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ভরতপুরের জাটরাজা সুরজমলের ছেলেরাই তখন ব্রজমণ্ডলের প্রকৃত শাসক।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরজমলের ছোট ছেলে রণজিৎ সিং বর্ষাণার যুদ্ধে নজাফ খানের কাছে পরাজিত হলেন। জাটবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে যাবার পথে রণজিৎ কোশী দখল করে নিলেন।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে নজাফ খানের ভাইপো মিরজা সাহ কোশী পুনরুদ্ধার করে নেন। কিন্তু বেশিদিন দখলে রাখতে পারেন না।

গৌরবের কথা সিপাহী যুদ্ধের সময়ও কোশী তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে এখানকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা দিল্লী যাবার পথে কাস্টম্‌স-য়ের বাংলোটিতে আগুন ধরিয়ে দেন এবং থানা ও ট্রেজারী লুঠ করেন। অবশ্য তখন কোশীতেও দেশদ্রোহীর অভাব হয় নি। তারা ইংরেজদের সাহায্য করেছিল এবং পুরস্কার স্বরূপ তাদের শ্বেতাঙ্গ-প্রভুদের কাছ থেকে পঞ্চাশটি করে চাঁদির-জুতো উপঢৌকন পেয়েছিল।

কুণ্ড দর্শনের পরে আমরা একে একে দর্শন করলাম বিহারীজী ও দাউজী অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং বলরামের মন্দির। একটু আগে দর্শন করেছি লক্ষ্মীনারায়ণ, মহাদেব ও গোপালজীর মন্দির। কীর্তন করেছি মহাপ্রভুর বৈঠকে।

ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে মহাপ্রভু কোশীতে এসে যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন, সেই পুণ্যস্থানটি মহাপ্রভুর বৈঠক বলে পরিচিত। আমরা সেখানে বসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলাকীর্তন করেছি।

দর্শন শেষে ফিরে চলেছি ধর্মশালায়। সহযাত্রীরা কীর্তন করেছেন আর আমি ভেবে চলেছি সেই কাহিনী। বিহারীজীর মন্দিরে বসে ভক্তি মহারাজ যে কাহিনীটি বলেছেন আমাদের। ভক্তি মহারাজ বলেছেন—

আঠারোবার জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করবার পরে কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন আর মথুরায় বাস করা নিরাপদ নয়। তাই তিনি অধিকাংশ যাদবদের নিয়ে দ্বারকা রওনা হলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই কৃষ্ণ-বলরাম যাদবদের নিয়ে পৌঁছলেন এখানে। জায়গাটা শ্রীকৃষ্ণের বড় পছন্দ হল। তাঁর মনে পড়ল মা-কে সেই সমুদ্র দর্শন করাবার কথা। বলরামের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি সাব্যস্ত করলেন—পুরনারীদের এখানে রেখে তাঁরা এগিয়ে যাবেন। দ্বারকা নতুন জায়গা। প্রথমেই সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে সেখানে যাওয়া সমীচীন নয়। মেয়েরা এখানে কিছুদিন অপেক্ষা করুন। কৃষ্ণ-বলরাম ছেলেদের নিয়ে দ্বারকায় যাবেন। বাড়ি-ঘর তৈরি করবেন। তারপরে এখানে এসে মেয়েদের নিয়ে দ্বারকায় ফিরবেন।

কিন্তু মথুরার পুরনারীরা তো অরক্ষিত প্রান্তরে বাস করতে পারেন না। তাই কৃষ্ণ এখানে এক নগর নির্মাণ করলেন। নব-নগরের নাম রাখলেন কুশস্থলী বা ব্রজের দ্বারকা।

সেই মন-দ্বারকা দর্শনের সৌভাগ্য হল আজ। আমি সৌভাগ্যবান।

সকৃতজ্ঞ অন্তরে আরেকবার দ্বারকাধীশের উদ্দেশে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে সহযাত্রীদের সঙ্গে এগিয়ে চলি ধর্মশালার দিকে।

ধর্মশালায় ফিরে আসতেই নরেনপ্রভু তলব করে . । না জানি অজান্তে কি অপরাধ করে ফেলেছি। ভয়ে ভয়ে তার ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হই। নরেনপ্রভু চেঁচিয়ে ওঠেন, "এই যে ঘোষমশয়, আপনার একটা চিঠি আইছে, লইয়া যান।"

চিঠি! বিস্মিত হই। কে চিঠি লিখল আমাকে? তাড়াতাড়ি চিঠিটা হাতে নিই। খামের চিঠি। ঠিকানার হাতের লেখাটা অপরিচিত। আমি তার লেখা চিনি না। তাহলেও সন্দেহ হচ্ছে।

বেরিয়ে আসি ধর্মশালা থেকে। অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় এসে চিঠিটা খুলি।

হ্যাঁ, যা ভেবেছি। মানসীরই চিঠি। সে লিখেছে—

বৃন্দাবন

সখা,

চিঠি লেখার জন্য বহুবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছি। কিছুতেই তুমি আমার সেই সামান্য অনুরোধটুকু রাখলে না—ইচ্ছে করেই রাখলে না। কি জানি হয়তো সে অনুরোধ রাখার মতো মন আর তোমাতে নেই।

তাহলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি কর্তব্যে অবহেলা করেছ। অবশ্য জানি কর্তব্য বা সৌজন্য জিনিসগুলো আপেক্ষিক। প্রীতি ও ভালোবাসা মানসিক বৃত্তি। সুতরাং যুক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে তার হের-ফের ঘটানো যায় না। আর তা ঘটানো উচিতও নয়। অতএব মন যখন চাইছে না চিঠি লিখতে, লিখো না।

আর তাই আরেকটি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি—তুমি আমাকে ভুলে যেও। তাতে ব্যথা পেলেও অপমানিত বোধ করব না, দুঃখ পেলেও ছোট হব না নিজের কাছে।

নিরুপায় হয়েই আমি আজ তোমাকে এ চিঠি দিলাম। রাগ ক'রো না। অন্যায় হলে ক্ষমা ক'রো।

বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করি—আমার চোখের জল যেন তোমার পরিক্রমার পথে ফুল হয়ে ফুটে থেকে সে পথকে সুরভিত করে রাখে।

প্রণাম নিও

ভাগ্যহীনা

মানসী

সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে। সেদিন বহুবার বলে দিয়েছিল চিঠি লিখতে। লিখব-লিখব করেও লেখা হয়ে ওঠে নি। কালই ওকে চিঠি দিতে হবে।

ফিরে আসি ধর্মশালায়। যথারীতি ধর্মশালার উঠোনে অস্থায়ী-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সহযাত্রীরা সকলেই সেখানে। ঘর ফাঁকা। ভালই হল, কিছুক্ষণ একা থাকা যাবে। আমি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসি।

মানসীর চিঠিটা মনকে বড় বেশি ভারী করে তুলেছে। তার ওপরে শরীরটাও ভাল লাগছে না। কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব। তাই আর নিচে নামি না। দোতলার বারান্দায় বসে কোশীর কথা ভাবতে থাকি। সারাদিনের স্মৃতিচারণ করতে ভালই লাগছে।

কিন্তু বাধা পড়ল জানকীর আকস্মিক আগমনে। সে কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "একা একা বসে রয়েছেন যে?"

"সঙ্গী পাই নি বলে।" একটু হেসে উত্তর দিই।

"ইস্! সংসারে যার এত আপনজন, তার আবার সঙ্গীর অভাব!"

"আপনজন হলেই যে মনের মতো সঙ্গী হবে, একথাটা কে বলল তোমাকে?"

"কে যে আপনার মনের মতো তা যে আজও বুঝে উঠতে পারলাম না।"

জানকীর কথা শুনে হেসে উঠি। বলি, "আমি কি তোমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছি নাকি?"

"তা আর বলতে!"

"তাহলে এখন আমার কি করা কর্তব্য?"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।"

"প্রশ্নটা কি ছিল যেন?"

"সন্ধ্যারতি দেখতে না গিয়ে একা এখানে বসে রয়েছেন কেন?"

"তার আগে যদি আমি প্রশ্ন করি, তুমি নিজে সন্ধ্যারতি না দেখে কেন এসময়ে এখানে এসেছো?"

"খুব পরিষ্কার উত্তর।"

"কি?"

"আমি আপনাকে দেখতে এসেছি।"

"কারণ?"

"সবার সঙ্গে আপনাকে না দেখে ভাবলাম হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে।"

জানকী কি অন্তর্যামী? সত্যই আজ আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। তাহলেও সেকথা বলা যাবে না তাকে। জানকী মানসী নয়, কিন্তু নারী তো বটেই। বললেই ডাক্তার ডেকে একটা হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। কাজেই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "না, না, শরীর খারাপ হবে কেন? শরীর বেশ ভালই আছে। এমনি বসে আছি আর কি!"

"আর বসে থাকতে হবে না, এখন নিচে চলুন।"

"কেন?"

"সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে এল, এবারে পাঠের আসর বসবে। মথুরা মহারাজ আজ ভাগবত পাঠ করবেন।"

"তাই নাকি? চল তাহলে যাওয়া যাক্।"

"চলুন।"

নিচে এসে দেখি জানকী ঠিকই বলেছে। ভাগবত পাঠের আয়োজন সম্পূর্ণ।

কয়েক মিনিট বাদেই পাঠের আসর বসল। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী। আজ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চাশৎ অধ্যায়টি পাঠ করছি। এই অধ্যায়ে জরাসন্ধ ও কালযবনের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামের যুদ্ধ এবং দ্বারকাপুরী নির্মাণের কথা বলা হয়েছে।

"আপনারা জানেন কংসের দুই স্ত্রী অস্তি ও প্রাপ্তি মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা এবং জরাসন্ধ একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কংসবধের পরে বিধবা অস্তি ও প্রাপ্তি বাবার কাছে এসে কান্না-কাটি জুড়ে দিলেন। তাঁরা জরাসন্ধকে পতিহত্যার প্রতিশোধ নিতে বললেন। ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ সাব্যস্ত করলেন তিনি পৃথিবীকে যাদবশূন্য করবেন। উদ্বেলিত সাগরের মতো সৈন্য-সামন্ত নিয়ে জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলেন।

"ভীষণ যুদ্ধ বেধে গেল। জরাসন্ধের সৈন্যরা কৃষ্ণ-বলরামকে ঘিরে ফেলল। পুরনারীরা প্রাসাদের অলিন্দ থেকে তাঁদের গরুড়ধ্বজ ও তালধ্বজ রথ দু'খানিকে দেখতে না পেয়ে শোকে মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

"কিন্তু মূর্ছাভঙ্গের পরে তাঁরা দেখতে পেলেন, কৃষ্ণ-বলরাম শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে ফেলেছেন। পুরনারীরা বৃথাই ভয় পাচ্ছিলেন। যিনি অনন্ত গুণশালী, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় যাঁর লীলামাত্র, তাঁর কাছে এ-সব কিছুই নয়।

"যাই হোক্, যুদ্ধ শেষে বলরাম রক্ষীহীন জরাসন্ধকে বন্দী করতে গেলেন। কিন্তু কৃষ্ণ বাধা দিলেন তাঁকে। এটিও শ্রীকৃষ্ণের আর একটি লীলা। তিনি চাইলেন জরাসন্ধ বেঁচে থাকুন। আবার তিনি সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করুন। আর কৃষ্ণ সেই পাপাচারী সৈন্যদের বিনাশ করে ভূ-ভার লাঘব করুন।

"পরাজিত জরাসন্ধ সঙ্কল্প করলেন তিনি তপস্যায় বসবেন।

কিন্তু অন্যান্য রাজারা তাঁকে বাধা দিলেন। তাঁরা বললেন—এ পরাজয় তোমার কর্মফল ছাড়া আর কিছুই নয়। জরাসন্ধ দুঃখিত মনে মগধে ফিরে গেলেন।

"বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মথুরাপুরীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। উল্লসিত মথুরাবাসীরা মথুরাপতিকে আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। তাঁরা কয়েকদিন ধরে বিজয়োৎসব পালন করলেন।

"জরাসন্ধ কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার মথুরা আক্রমণ করলেন। আবার পরাজিত হয়ে মগধে ফিরে গেলেন। এইভাবে জরাসন্ধ সতেরোবার মথুরা আক্রমণ করলেন। প্রত্যেকবারই পরাজিত হলেন।

"দুর্দান্ত বীর কালযবন সখা-জরাসন্ধের দুর্দশায় ব্যথিত হলেন। দেবর্ষি নারদের পরামর্শে পরের বারে তিনিও জরাসন্ধের সঙ্গে তিন-কোটি সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করলেন।

"চতুর শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, জরাসন্ধ ও কালযবনের যুগপৎ আক্রমণ থেকে মথুরাকে রক্ষা করা কঠিন। এই সাঁড়াশী-অভিযানের চাপে তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা মরে যাবেন। তাই তিনি স্থির করলেন, একটি দুর্গম দুর্গ নির্মাণ করে আত্মীয়-স্বজনদের সেখানে রেখে তারপরে তিনি কালযবনকে সংহার করবেন।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হল। সমুদ্রের মধ্যে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত এক দুর্গম দুর্গ ও আশ্চর্য নগরী নির্মিত হল। রাজপথ অঙ্গন উদ্যান ও অট্টালিকায় সুশোভিত এই নগরীর নাম রাখা হল দ্বারাবতী বা দ্বারকা।

"কৃষ্ণ আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারকাপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরে তিনি বলদেবকে মথুরা রক্ষার ভার দিয়ে একা বেরিয়ে এলেন মথুরা-পুরী থেকে, আপন মনে হেঁটে চললেন।"

"কোথায় ?" মথুরা মহারাজ থামতেই চক্রবর্তী প্রশ্ন করে।

"সেকথা আজ বলব না। কারণ এখানেই পঞ্চাশৎ অধ্যায় শেষ

হল।" একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে বললেন, "কৃষ্ণ কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, সেকথা আমি পরের দিন আপনাদের বলব। আজ এই পর্যন্তই থাক্।" তিনি প্রণাম করে ভাগবতখানি বন্ধ করতে চাইলেন।

গুরুমহারাজ বাধা দিলেন, বললেন, "বন্ধ ক'রো না মথুরা! মোটে আটটা বাজে। ন'টার আগে প্রসাদ হবে না। পরের অধ্যায়টাও আজই হয়ে যাক্।"

আমরা খুশি হয়ে উঠি। মথুরা মহারাজ ভাগবতে মনোনিবেশ করেন। একটু নীরব থেকে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, "এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের এক-পঞ্চাশৎ অধ্যায় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলার শেষ অধ্যায়টি পাঠ করব। এই অধ্যায়টি পঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগবত-পাঠ মোটামুটিভাবে শেষ হবে। যতদূর মনে পড়ে, যমলার্জুন-ভঞ্জন ও মা যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন ছাড়া প্রয়োজনীয় সমস্ত অধ্যায় আমরা এই বনযাত্রাকালে পাঠ করেছি। শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে ঐ দু'টি লীলা করেছিলেন। কাজেই আমরাও গোকুলে গিয়েই ঐ অপরূপ লীলাকাহিনী স্মরণ করব। এখন আসুন, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের এক-পঞ্চাশৎ অধ্যায়টি পাঠ করি। এই অধ্যায়ে ভাগবতকার কালযবনভস্ম ও মুচুকন্দের ভগবৎ স্তুতির কথা বলেছেন।"

একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে গলা পরিষ্কার করে আবার বলতে শুরু করলেন—

"শ্রীকৃষ্ণ একা বেরিয়ে এলেন মথুরাপুরী থেকে। তিনি ধীরে ধীরে পথ চলতে থাকলেন। কালযবন দেখতে পেলেন তাঁকে। দেখলেন শ্যামবর্ণ, পীতবসন, দীর্ঘবাহু, পদ্মলোচন, প্রসন্নমূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণকে। দেখলেন নারদের বর্ণনার সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে। তিনি বুঝতে পারলেন এই কৃষ্ণ, কিন্তু চিনতে পারলেন না পরমপুরুষকে। কারণ তিনি মায়াবদ্ধ জীব। রূপ দেখলেও সবার স্বরূপজ্ঞান হয় না।

"কালযবন কৃষ্ণের পেছন পেছন ছুটলেন। কৃষ্ণ ধরা দেবার অভিনয় শুরু করে দিলেন। কালযবনের কেবলই মনে হতে লাগল, এই বুঝি তিনি কৃষ্ণকে ধরে ফেলতে পারবেন।

"কিন্তু ভক্ত ছাড়া তো কেউ ভগবানকে ধরতে পারেন না। কালযবনও পারলেন না। তাঁর কেবল কৃষ্ণের পেছনে ছোটাই সার হল।

"অবশেষে কৃষ্ণ একটি গুহায় প্রবেশ করলেন। একটু বাদে কালযবনও উপস্থিত হলেন সেখানে। দেখতে পেলেন একজন লোক সেই গুহার ভেতরে শুয়ে আছেন। কালযবন ভাবলেন, এই কৃষ্ণ। তিনি তাঁকে পদাঘাত করলেন।

"নিদ্রিত পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি তাকালেন কালযবনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে কালযবনকে ভস্মীভূত করে ফেলল।" থামলেন মথুরা মহারাজ।

সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্তী প্রশ্ন করে, "ঐ নিদ্রিত লোকটি কে মহারাজ?"

মথুরা মহারাজ একটু হেসে উত্তর দেন, "বলছি। একটু ধৈর্য ধারণ করুন। একবার দম নিতে দিন।"

"দণ্ডবৎ মহারাজ! অপরাধ ক্ষমা করবেন।" চক্রবর্তী প্রণাম করে।

মথুরা মহারাজ বলেন, "না, অপরাধের কি আছে?" তারপরে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বলতে থাকেন, "ঐ নিদ্রিত পুরুষ মহারাজা মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে তিনি বহু অসুরকে বধ করেছিলেন। সন্তুষ্ট ইন্দ্র যখন তাঁকে বর দিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন—আমি যুদ্ধশ্রমে শ্রান্ত। আমি যেন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারি। যদি কেউ আমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তবে সে যেন আমার চোখের আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

"সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ তাই কৌশলে কালযবনকে মুচুকুন্দের কাছে

নিয়ে এসে ভস্ম করে ফেললেন। তারপরে তিনি ভুবনমোহনরূপে দর্শন দিলেন মুচুকুন্দকে।

"ভক্ত মুচুকুন্দ ভগবানকে চিনতে পারলেন। তিনি দু'চোখ ভরে দেখতে থাকলেন তাঁর প্রাণের প্রিয়তমকে।

"ভাগবতকারের ভাষায়—

'তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥'

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রঙ মেঘের মতো শ্যামবর্ণ। তাঁর পরিধানে পীত কৌষেয় বসন। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন। তিনি দীপ্তিশালী কৌস্তুভমণির মতো বিরাজিত, তিনি বৈজন্তী মালায় শোভিত চতুর্ভুজ।

"মুগ্ধ মুচুকুন্দ শ্রীগোবিন্দের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। ভগবান বললেন—আমার সহস্র সহস্র জন্ম, কর্ম ও নাম আছে। তথাপি আমি তোমাকে আমার বর্তমান জন্ম ও কর্মের কথা বলছি। ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূ-ভার হরণ করতে আমি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি। যদুবংশে বসুদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি বলে এখন আমার নাম বাসুদেব। আমি কংস ও তার অনুচরদের বধ করেছি। তোমাকে দিয়ে কালযবনকে দগ্ধ করিয়েছি। এখন তোমাকে অনুগ্রহ করতে এই গুহায় এসেছি। কারণ তুমি পুরাকালে আমার কৃপা-প্রার্থনা করেছিলে। তুমি বর প্রার্থনা কর।

"মুচুকুন্দ তখন ভগবান-শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে থাকলেন। বললেন—জগতের নরনারী আপনার মায়ায় মুগ্ধ, ফলে তারা আপনার সেবায় বঞ্চিত। তারা সবাই সুখ চায়, কিন্তু দুঃখের ঘরেই বন্দী হয়ে থাকে। দুর্লভ মানব-জন্ম পেয়েও তারা বিষয়ের অন্ধকূপে ডুবে থাকে আমিও তাই করেছি। অনিত্য দেহ ও রাজত্বের অভিমান

নিয়ে জীবন কাটিয়েছি। একবারও নিত্য বস্তু আপনার কথা ভাবি নি।

—"হে ভগবান, যে ব্যক্তি বড় বড় যুদ্ধে জয়ী হয়ে সকলের শ্রদ্ধেয় হয়, সে-ই আবার কামোন্মত্ত হলে অবলা রমণীর পদাঘাত সহ্য করে। রাজ্য-জয় সহজ, কিন্তু রিপু-জয় কঠিন।

—"হে অচ্যুত, যখন জীবের বন্ধন কাটে, তখনই মহতের সঙ্গ-লাভ হয়। ত্যাগ ও মহৎ-সঙ্গের ফলে হৃদয়ে হরিভক্তি জন্মে। ভক্তি জন্মালেই মানুষ সব দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করে। আমিও তাই ত্রিগুণময় রাজ্যের সকল বিষয় ত্যাগ করে নিরুপাধি, গুণাতীত, জ্ঞানঘন ও অদ্বয়তত্ত্ব আপনার শরণ নিলাম। আপনি সত্যস্বরূপ, ভয়াতীত ও শোকাতীত। আমি বিপদে পতিত, আপনি বিপদ্‌বারণ। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

"ভক্তপ্রবর মুচুকুন্দের স্তবে তুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান তাকে বললেন—তোমার বুদ্ধি নির্মল ও উজ্জ্বল। আমি প্রলোভন দেখাবার পরেও তুমি বিষয় কামনায় চঞ্চল হও নি। ভক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে বিষয় প্রাপ্তিতে ক্ষতি হয় না। আমাতে আসক্তি থাকলে, বিষয়াসক্তি আসতে পারে না।

"ভগবান আরও বললেন, ভক্তিই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ; অতএব—

'বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ময্যনপায়িনী॥
ক্ষাত্রধর্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তৎ তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ॥
জন্মন্যনন্তরে রাজন্! সর্বভূত-সুহৃত্তমঃ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্'॥"

একবার থেমে গলাটাকে সাফ করে নিয়ে মথুরা মহারাজ আবার বলতে থাকেন—

"ভগবান এখানে ভক্ত মুচুকুন্দকে বলছেন—আমাতে চিত্ত সমাহিত করে পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ কর। আমাতে তোমার নিশ্চলা ভক্তি হোক্।

"ক্ষাত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃগয়ার সময় তুমি বহুপ্রাণ বিনষ্ট করেছো। এখন আমাকে আশ্রয় করে সমাহিত হয়ে তপস্যার দ্বারা সেই পাপ নাশ কর।

"হে রাজা! তাহলেই তুমি পরের জন্মে সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠরূপে জন্মগ্রহণ করবে—অনুপম আমাকেই প্রাপ্ত হবে। সর্বদা আমার সঙ্গে থাকবে।"

॥ এগার ॥

সকালে কোশী থেকে রওনা হয়ে আজ দুপুর নাগাদ আমরা শেরগড়ে এসেছি। শেরগড় কৃষ্ণলীলাকালের খেলনবন। গোচারণের সময় কৃষ্ণ-বলরাম সখা ও সখীদের সঙ্গে এখানে খেলা করতেন বলে এই লীলাভূমির নাম খেলনবন।

শেরগড় নামটি হয়েছে নবাবী আমলে। খেলনবনের সরকারী নাম শেরগড়-বংগার। সেই নামেই সে এখন সর্বত্র পরিচিত। তাহলেও আমরা খেলনবনই বলব। আমরা যে কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করছি—ব্রজ-পরিক্রমা করছি।

কোশী থেকে খেলনবনের দূরত্ব ১৩ মাইলের মতো। পথে পঁয়গ্রামে অবশ্য আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পেরেছি। তাহলেও এখানে পৌঁছে সবাই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু এখানকার কথা পরে হবে, আগে পঁয়গ্রামের কথা বলে নিই। পঁয়গ্রামও একটি তীর্থ। জনৈক সিদ্ধ নাগাজী মহারাজ জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে। তিনি নাকি একবার তাঁর শিষ্যদের সামনে চতুর্ভুজরূপে দর্শন দিয়েছিলেন। নাগাজীর মন্দিরটি পঁয়গ্রামের প্রধান দর্শন। মন্দিরে নাগাজীর সেই চতুর্ভুজ রূপ, রাম-সীতা ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি আছে। নাগাজী মহারাজের জন্মতিথিতে মহোৎসব হয় সেখানে।

পঁয়গ্রাম থেকে একটানা ৭ মাইল হেঁটে আমরা খেলনবনে এসেছি। গুরুমহারাজের শিষ্য-সন্ন্যাসী গোবর্ধন মহারাজ অশক্ত যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে বাসে করে অনেক আগে পৌঁছে গিয়েছিলেন এখানে। আমরা পৌঁছুবার আগেই তিনি রান্নার পাট প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন। সুতরাং স্নান সেরেই আমরা প্রসাদ পেয়ে গেছি।

প্রসাদ শেষ হতেই শুরু হয়েছে সংকীর্তন শোভাযাত্রা। আজ অবশ্য কয়েকজন সহযাত্রী নেই আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সকালে কোশী থেকে বাসে করে চলে গিয়েছেন বড়-বৈঠান, চরণ-পাহাড়ী ও শেষশায়ী দর্শন করতে। সময়াভাবের জন্য সাধারণ দর্শন থেকে এই তিনটি তীর্থ বাদ দেওয়া হয়েছে। শরীরটা ভাল নয় বলে আমি তাঁদের সঙ্গী হতে পারি নি। তাঁরা সন্ধ্যের আগেই খেলনবনে এসে যোগ দেবেন আমাদের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, চক্রবর্তী সেই ভাগ্যবান পুণ্যার্থীদের অন্যতম।

সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। আমি কিন্তু কীর্তন করছি না। ভেবে চলেছি খেলনবনের কথা—আজকের পদযাত্রার কথা—

শেরগড় মথুরা জেলার ছাতা তহশিলের অন্তর্গত একটি ছোট শহর। তহশিলের পূর্বতম প্রান্তে অবস্থিত। হাজারখানেক বাড়ি ও হাজার পাঁচেক মানুষ নিয়ে শহর।

যমুনার ডানতীরে ২৭°৪৭´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৭°৩৮´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই জনপদ। দূরত্ব মথুরা থেকে ২২ মাইল ও ছাতা থেকে ৮ মাইল। দু'জায়গা থেকেই নিয়মিত বাস চলাচল করে।

শের শাহের একটি ভগ্ন দুর্গ এখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। সেই দুর্গটির নাম থেকেই জনপদের নাম হয়েছে শেরগড়। সে আমলে যমুনা ঐ দুর্গটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত। কিন্তু এখন যমুনার প্রবাহ মাইলখানেক দূরে সরে গেছে। কাজেই যমুনার সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি আমাদের।

কিছুকাল আগেও শেরগড় পাঠানদের জমিদারী ছিল। তারপরে মথুরার শেঠ গোবিন্দদাস শেরগড় কিনে নেন। তাঁর বংশধরগণ মুন্নালাল নামে জনৈক স্থানীয় ধনীর কাছে জমিদারী বিক্রি করে দেন। কিন্তু তাঁর বংশধরদের সঙ্গে পাঠানদের বিবাদ লেগেই আছে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রতিবেশী গ্রামের গুর্জরগণ শেরগড় আক্রমণ করেন। কিন্তু স্থানীয় ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছে তাঁরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ব্রিটিশ শাসক তখন হাথরাসের রাজা গোবিন্দ সিংকে ঐ সব গুর্জরগ্রাম দান করে দেন। গুর্জররা সে অবিচারের কথা আজও ভুলতে পারেন নি। সুযোগ পেলেই তাঁরা সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

আজ সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। তার ওপর ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। অগ্রহায়ণ মাস। বেশ শীত-শীত করছে। আর তাই বোধহয় কীর্তনের জোরটাও আজ অন্যদিনের চেয়ে কিছু বেশি। জোরে কীর্তন করলে শীত বা গ্রীষ্মবোধ দুই-ই কমে যায়।

কেষ্টপ্রভু গলা ছেড়ে গান ধরেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে শ্রীগৌরাঙ্গের বন-ভ্রমণলীলা কীর্তন করছেন। গাইছেন—

'সারাদিন প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈলা।
তাহাঁ হইতে মহাপ্রভু খদিরবনে আইলা॥
লীলাস্থল দেখি তাহাঁ গেলা শেষশায়ী।
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পঢ়েন গোসাঞি॥
তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥'

শেঠজীর ধর্মশালা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। একটি বাঁধানো কুণ্ডের কাছে এসে সাময়িক যাত্রা-বিরতি ঘটল। সহযাত্রীরা জলস্পর্শ করবার পরে আবার শুরু হল পথ চলা।

পথের পাশে একটি টিলা দেখতে পাচ্ছি। বেশ বড় এবং উঁচু টিলা। জনৈক সহযাত্রী জানালেন, টিলার ওপরে অনেক সাধু-সজ্জনদের সমাধি রয়েছে। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে।

একটি শিবমন্দিরের সামনে এসে আবার থামতে হল। সহযাত্রীরা সশ্রদ্ধচিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করলেন।

শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। বেশ জনবহুল পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর ও দোকানপাট। কৃষ্ণলীলা কালের কথা বাদ দিলাম, কিছুকাল আগেও নাকি খেলনবনের পথে-প্রান্তরে পদ-পরিক্রমার সময় ময়ূরের ডাক শুনতে পাওয়া যেতো। দুর্ভাগ্য আমাদের, এখানে এসে এখন পর্যন্ত শিখী-সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয় নি।

রাজপথ থেকে পায়ে-চলা পথে নেমে এসেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। এবারে মাঠে নামতে হল। মাঠ ভেঙে এগিয়ে চলল সংকীর্তন শোভাযাত্রা।

হঠাৎ নজর পড়ে ভদ্রমহিলার দিকে। আজ যেন তাঁর গতিবেগ একটু বেশি মন্থর। ভদ্রমহিলা মানে বণিকপ্রভুর স্ত্রী। নিজের ছেলে-মেয়ে নেই। ভাসুরপোকে মানুষ করেছিলেন। এখন সে বিয়ে করে ভিন্ন হয়ে গেছে। কারণ বণিকপ্রভু আসানসোলের বাড়িখানা এখনও তার নামে লিখে দেন নি। সংসারের স্বার্থপরতা স্বামী-স্ত্রীকে ধার্মিক করে তুলেছে। তাঁরা বন-পরিক্রমায় এসেছেন।

বণিকপ্রভুর স্বাস্থ্যও ভাল নয়। রোজই পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পান। তবু-বরং তাঁর পক্ষে পরিক্রমা করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর পক্ষে এই পরিক্রমায় আসা রীতিমত বিস্ময়কর। বাতের প্রকোপে ভদ্রমহিলার কোমর থেকে শরীরের ওপর দিকটা বেঁকে গেছে। তাঁকে সামনেব দিকে ঝুঁকে পড়ে পথ চলতে হয়। তবু তিনি আমাদের সঙ্গে সমান তালে পথ চলেন। একটি দর্শনও বাদ দেন না। কিন্তু আজ কেন যেন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছেন।

বৃদ্ধার কাছে এসে সবিনয়ে প্রশ্ন করি, "চলতে কষ্ট হচ্ছে কি ?"

"একটু হচ্ছে বাবা, আজ শরীরটা ভাল নেই।" অপরাধীর স্বরে তিনি উত্তর দিলেন।

বলি, "আস্তে আস্তে চলুন।"

"সবাই যে এগিয়ে গেল।"

"যাক্, আপনি আস্তে আস্তে চলুন। আমি আপনার সঙ্গে থাকছি।"

"বেঁচে থাকো বাবা!" বৃদ্ধা বোধহয় বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছে আমার দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

আজকের যুগে কারও কাছেই সুদীর্ঘ জীবন সুখের হতে পারে না। তবু স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধার আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করি।

সহযাত্রীরা সবাই সামনে এগিয়ে গেছে। আমরা দু'জনে পড়ে রয়েছি পেছনে। ধীরে ধীরে পথ চলছি।

সামনে দেখছি দু'টি দোকান রয়েছে। একটু চা পেলে ভালই হয়। ব্রহ্মচারী ও মহারাজরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। এই ফাঁকে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্। আমি বৈষ্ণব তো নই-ই, ভক্তও নই। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে চা খেতে হচ্ছে।

সেই কথাই বলি বণিকপ্রভুর স্ত্রীকে। তিনি বলেন, "খেতে পারলে তো ভালই হয়, কিন্তু সবাই যে এগিয়ে গেল!"

তাঁর সেই একই চিন্তা—সহযাত্রীরা এগিয়ে গেলেন। অভয় দিয়ে বলি, "ওঁরা মন্দিরে পৌঁছে কীর্তন করবেন, দর্শন ও পরিক্রমা করবেন। চা খেয়ে নিয়েও আমরা অনায়াসে তার মধ্যে পৌঁছে যাব।"

"বেশ, চলো।"

বৃদ্ধার সম্মতি পেয়ে এগিয়ে চলি চা-য়ের দোকানে।

আর দোকানের সামনে এসেই বুঝতে পারি, সহযাত্রীদের অনেকেই এগিয়ে যায় নি। তারাও আমাদেরই মতো চা-য়ের দোকানে আসন নিয়েছে।

গুরুমহারাজ কিংবা সন্ন্যাসীরা কেউ উপস্থিত না থাকলেও প্রকাশ্যে চা খাওয়া খুবই অন্যায়। কিন্তু তাঁরা বেশ মৌজ করে চা খাচ্ছিলেন। বণিকপ্রভুর স্ত্রীকে দেখে স্বভাবতই তাঁরা আঁতকে উঠলেন। কারণ তাঁর সঙ্গে তাঁদের তেমন আলাপ হয় নি। তাঁরা তাড়াতাড়ি চা-য়ে শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলেন দোকানীকে।

চা-য়ের দোকান থেকে মাইল আধেক হেঁটে আমরা দাউজী (দাদাজী) অর্থাৎ বলরামের মন্দিরে এলাম। জনপদের প্রান্তে মাঠের ভেতরে ছোট মন্দির। পাশেই একটি মসজিদ।

মাঠে ঘুঁটে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। উনুন ধরাবার নয়, মানুষ পোড়াবার ঘুঁটে। এ অঞ্চলে গাছ-পালা কম। কাজেই কাঠের অভাব। গোবর, কাঠের গুঁড়ো ও মাটি দিয়ে তাই মস্ত মস্ত ঘুঁটে তৈরি করা হয়। যমুনার তীরে সেই ঘুঁটের আগুনে মৃতদেহ সৎকার করা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, ঘুঁটের সেই আগুনে মৃতদেহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা সম্ভব হয় না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্মশান-বন্ধুরা সেই আধপোড়া মৃতদেহ যমুনায় ফেলে দিয়ে শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করে। আর মনুষ্য-মাংসের মধুর স্বাদ আস্বাদন করে যমুনার কচ্ছপকুল মানুষ-খেকো হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিবছর যমুনায় অবগাহনরত একাধিক ভক্ত কচ্ছপের কামড়ে প্রাণ হারান।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। আমরা একে একে মন্দিরে উঠে আসি। সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রীবলদেবের অপূর্ব-সুন্দর মূর্তিকে দর্শন ও দণ্ডবৎ করি। মন্দির প্রদক্ষিণ করে সকলে মন্দির-প্রাঙ্গণে বসে পড়ি। কীর্তন আরম্ভ হয়।

আর ঠিক তখুনি পাশের মসজিদ থেকে সোচ্চার স্বরে আজানের শব্দ জেগে উঠল। যতদূর জানি এটা আজানের সময় নয়, নমাজের তো নয়ই। তাহলে কি আমাদের কীর্তনকে অশ্রদ্ধা জানাবার জন্যই এই আজান!

গুরুমহারাজ হাত উঁচু করলেন। মুহূর্তের মধ্যে কীর্তন থেমে গেল। কিন্তু কেন? কেন গুরুমহারাজ শেষ হবার আগেই আমাদের কীর্তন থামিয়ে দিলেন? অসময়ে আজান দেবার জন্য ওদের যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, অসময়ে কীর্তন থামাবার জন্য আমাদের অপরাধ তার চেয়ে কিছু কম কি?

বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমরা ক্রমাগত শুনে আসছি ভারতবর্ষ

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু এই নিরপেক্ষতা রক্ষা করার সমস্ত দায়িত্ব কি শুধুই এক পক্ষের ?

আগের কথা বাদ দিলাম। এই উপমহাদেশের বিগত পঁচিশ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস জেনেও যারা মনে করছে, কব্জি এবং গলার জোরে আপন ধর্মকে বড় করা যায়, তারা নিঃসন্দেহে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

ধর্মপথেই ধর্মের প্রসার হয়, আদর্শই আদর্শকে রক্ষা করে। আওরঙ্গজেব হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে যা পারেন নি, ভারত-পথিক বিবেকানন্দ একা তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে পেরেছেন। আজান দিয়ে রাম-কৃষ্ণকে ছোট করা যায় না। তাঁরা বড় হয়ে আছেন, বড়ই থাকবেন। থাকবেন তাঁদের আদর্শে, উদারতায় ও ভালোবাসায়। তাঁদের ক্ষয় নেই। তাঁরা অবিনশ্বর।

লোকালয়ের ভেতর দিয়ে আবার এগিয়ে চলেছে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। কয়েকটি তরুণ পথের পাশে দাঁড়িয়ে টিটকারি দিচ্ছে, হাসা-হাসি করছে, ভেংচি কাটছে, মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করছে।

বৃন্দাবন থেকে কোশী পর্যন্ত সর্বত্রই দেখেছি আবালবৃদ্ধবনিতা পথের পাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ আমাদের শোভাযাত্রার সামিল পর্যন্ত হয়েছে। এখানেই প্রথম তার ব্যতিক্রম দেখছি।

এবং সে ব্যতিক্রম, বিশেষ করে মেয়েদের প্রতি অশালীন আচরণ বরদাস্ত করলেন না কর্ণেল। আমাদের সহযাত্রী। পাঞ্জাবের মানুষ। পাকিস্তানের সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় একমাত্র পুত্র শহীদ হয়েছে। তারপরই তিনি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে তীর্থ দর্শন করে চলেছেন। গত গ্রীষ্মে গিয়েছিলেন কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, বর্ষায় অমরনাথ আর হেমন্তে এসেছেন মধু-বৃন্দাবনে।

সহসা শোভাযাত্রা ছেড়ে কর্ণেল ছুটে গেলেন শেরগড়ের রক-

ফেলারদের কাছে। আর গিয়েই সবচেয়ে উৎসাহী তরুণটির জামার কলার চেপে ধরলেন। কর্ণেলের চেহারা দেখে ও তাঁর হুঙ্কার শুনে ছেলেটি কেঁদে ফেলল। তার সঙ্গীদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

তাড়াতাড়ি ছুটে আসি কর্ণেলের কাছে। অনেক কষ্টে তাঁকে নিরস্ত করি। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন করলে, একটি দাঁতও অবশিষ্ট থাকবে না, এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কর্ণেল ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেন।

আমরা ফিরে আসার পরে শোভাযাত্রা আবার চলল এগিয়ে। মনে মনে ভেবে চলি কর্ণেলের কথা। তিনি আমাদের আশ্রমের শিষ্য নন। গুরুমহারাজের জনৈক পাঞ্জাবী শিষ্যের চিঠি নিয়ে বৃন্দাবনে এসে যাত্রায় যোগ দিয়েছেন। শান্ত ও মার্জিত স্বভাবের জন্য ইতিমধ্যেই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছেন। আমাদের সঙ্গে নিজেকে সুন্দর খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এমন কি আমরা সবাই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পরিক্রমা করছি বলে, নিজেও তাই পরে নিয়েছেন। বৃন্দাবনে বসে এক রাতের ভেতরে পাঞ্জাবি তৈরি করিয়েছেন।

শান্ত স্বভাব হলেও তিনি সেনাধ্যক্ষ। তাই আমাদের মতো শেরগড়ের রোমিওদের বেয়াদবী বরদাস্ত করতে পারলেন না। এজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। এবং বোধহয় ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।

এখন আমরা বাজারের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। মফঃস্বল শহরের বাজার যেমন হয় আর কি। খানিকটা জায়গা জুড়ে সংকীর্ণ পথের দু'পাশে সারি-সারি দোকান।

বাজার ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়েই শ্রীরাধাগোপীনাথজীর মন্দির। গোপীনাথের মন্দির রয়েছে বৃন্দাবন ও কাম্যবনে। অর্থাৎ এ যাত্রায় আমাদের এটি তৃতীয়বার গোপীনাথ দর্শন। পথ থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দিরে। সিঁড়ির পাশেই একটি কুয়ো। সিঁড়িতে

কোন রেলিং নেই। একটু এধার-ওধার হলেই কুয়োতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। পড়ে গেলে প্রাণ-সংশয় হবে কিনা বলতে পারি না। তবে হেমন্তের এই অপরাহ্ণ বেলায় কুয়োর সুশীতল সলিলে অবগাহন করা কোনমতেই সুখকর হতে পারে না। সুতরাং সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরে।

মন্দিরের দরজাটি বড়ই ছোট। মন্দিরটিও বড় নয়। সুতরাং ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। তারই মধ্যে রাধাগোপীনাথকে দর্শন করে কোনমতে নেমে আসি মন্দির থেকে।

সংকীর্তন শোভাযাত্রা আবার চলল এগিয়ে। এবারে আমরা চলেছি শ্রীরাধামদনমোহনের মন্দিরে। বৃন্দাবন এবং কাম্যবনের মতো এখানেও মদনমোহনের মন্দির আছে। কিন্তু নেই রাধাগোবিন্দের মন্দির। কেন নেই বুঝতে পারছি না। কারণ গোবিন্দ গোপীনাথ ও মদনমোহন হলেন গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর।

কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব? আমার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই ভক্ত-বৈষ্ণব। তাঁদের কাউকে একথা জিজ্ঞেস করলেই ধমক খেতে হবে। তাঁরা পাল্টা-প্রশ্ন করবেন—হিস্ট্রি শুনতে চাইছেন? কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি হিস্ট্রি শুনে ব্রজ-পরিক্রমা হয় না, ধাম দর্শন করতে হয় সূক্ষ্ম দিব্যদৃষ্টি দিয়ে—প্রেমিক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের মতো, সাধক লীলাশুকের মতো।*

সুতরাং নিঃশব্দে এগিয়ে চলি মদনমোহন মন্দিরের দিকে। মনে মনে ভেবে চলি শ্রীসনাতন গোস্বামীর কথা। যিনি মথুরার জনৈক চৌবের বাড়ি থেকে মদনমোহনজীকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁর সেই পরমারাধ্যকে বৃন্দাবনে যমুনার তীরে দুঃশাসন টিলায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

সনাতন তাঁর ইষ্টদেবতাকে নিয়ে সেখানেই একটি পর্ণকুটিরে বাস করেছিলেন। কিছুকাল পরে একদিন রামদাস নামে জনৈক

*'ব্রজপর্ব' দ্রষ্টব্য

সওদাগর নৌকা-বোঝাই পণ্য নিয়ে দিল্লী থেকে আগ্রা যাচ্ছিলেন। দুঃশাসন টিলার সামনে এসে সহসা তাঁর নৌকা যমুনার চরায় আটকে গেল।

বহু চেষ্টা করেও যখন তিনি নৌকাকে মুক্ত করতে পারলেন না, তখন স্থানীয় লোকদের পরামর্শে ছুটে এলেন শ্রীসনাতনের কাছে। সনাতন তাঁকে মদনমোহনের কৃপাভিক্ষা করতে বললেন।

কৃপাভিক্ষা করে রামদাস নেমে এলেন দুঃশাসন টিলা থেকে। ঘাটে এসে সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর নৌকা চরামুক্ত হয়ে জলে ভাসছে। মদনমোহনের কৃপাধন্য রামদাস প্রতিজ্ঞা করলেন—এবারে পণ্য বিক্রি করে যা লাভ হবে, তা দিয়ে আমি মদনমোহনের মন্দির তৈরি করে দেব।

তারপরেও একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। রামদাস সেবার আগ্রাতে গিয়ে সেই পণ্য বিক্রি করে এগারো গুণ লাভ করলেন।

বৃন্দাবনে ফিরে এসে তিনি মনের মতো করে মদনমোহন মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। সেটি ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহামতি আকবর নাকি সেই মন্দির থেকে ব্রজের অতুল সম্পদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

দুর্ভাগ্যের কথা তাঁরই প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব সেই মন্দির ধ্বংস করেন। এবং ধ্বংসযজ্ঞের কথা আগে জানতে পেরে জয়পুরের মহারাজা অন্যান্য বহু বিগ্রহের সঙ্গে গোপীনাথজীর বিগ্রহকে বৃন্দাবন থেকে জয়পুরে নিয়ে যান। যাবার পথে সম্ভবত গোপীনাথ ও মদনমোহন খেলনবনে রাত্রিবাস করেছিলেন। যেখানে তাঁদের যাত্রা-বিরতি ঘটেছিল, পরবর্তীকালে সেখানেই গড়ে উঠেছে মন্দির। গোপীনাথ ও মদনমোহন মন্দির।

গোপীনাথজীর প্রতিনিধি বিগ্রহ দর্শন করে আমরা এখন চলেছি শ্রীরাধামদনমোহনকে দর্শন করতে। শ্রীসনাতনের সেই পরমারাধ্যের উদ্দেশে আরেকবার প্রণাম জানিয়ে পুলকিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলি খেলনবনের পথে।

ফেরার পথে বণিকপ্রভুর স্ত্রীকে একখানি রিক্‌শা করে দিতে হল। তিনি একেবারেই হাঁটতে পারছিলেন না। কাল তাঁকে গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে বাসে পাঠিয়ে দিতে হবে। গোবর্ধন মহারাজ আমাদের 'কোয়ার্টার-মাস্টার'। অর্থাৎ এই শতাধিক তীর্থযাত্রীর খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাপক। আমরা প্রতিদিন সকালে উঠে বিছানা ও জিনিসপত্র তাঁকে দিয়ে দিই। তিনি সে-সব নিয়ে বাসে করে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যান। আমাদের আশ্রয় ও আহারের বন্দোবস্ত করেন। কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও সেবক তাঁকে এ-ব্যাপারে সাহায্য করছেন।

সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা স্বাস্থ্য বা বয়সের কারণে হাঁটতে পারছেন না, তাঁরাও গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে বাসে করে এক বন থেকে আরেক বনে যাচ্ছেন। আগামীকাল বণিকপ্রভুর স্ত্রীকেও তাঁদের সঙ্গে দিতে হবে।

বণিকপ্রভুর স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবার পরেই কথাটা মনে পড়ল আমার—চিঠিটা ডাকে দেওয়া দরকার। সেদিন রাধাকুণ্ডে বসে মানসী মাথার দিব্যি দিয়ে নিয়মিত চিঠি লিখতে বলে দিয়েছিল। চিঠি দিই নি বলে সে অভিমানভরা চিঠি পাঠিয়েছে। গতকাল রাতেই উত্তর লিখে রেখেছি। কিন্তু এখনও ডাকে দেওয়া হয়ে ওঠে নি।

শোভাযাত্রা থেকে বেরিয়ে আসি। একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করতেই, তিনি হাত দিয়ে পোস্ট-অফিস দেখিয়ে দেন। ঠিক বড় রাস্তার ওপরে নয়, একটু ভেতরে।

চিঠিটা ডাকে দিয়ে ফিরে আসি বড় রাস্তায়। আর এসেই অবাক হতে হয়।

শোভাযাত্রা অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু জানকী দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, "তুমি এখানে?"

"আপনার পথ চেয়ে।"

একটু হেসে বলি, "কেন, তোমার কি মনে হল, আমি পথ হারিয়ে ফেলব ?"

"না। তবে ভয় হল, পাছে আপনি ভুলপথে চলে যান !"

"হঠাৎ এমন ভয় পাবার কারণ ?"

"হয়তো বা কৃষ্ণের কৃপা।" বলেই হো-হো করে হাসতে থাকে জানকী। বুঝতে পারছি, প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল সে। আমি তবু নীরব থাকি।

আমরা পথ চলা শুরু করি। হেমন্তের গোধূলি শেষ হতে চলেছে। সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে খেলনবনের আলোহীন ধূলিময় পথে। সংকীর্তন শোভাযাত্রা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কীর্তনের শব্দ অবশ্য কানে আসছে। সেই শব্দ অনুসরণ করে আমি জানকীর পাশে পাশে পথ চলেছি—মধু-বৃন্দাবনেব পথ।

জানকী সহসা প্রশ্ন করে, "বার চিঠি ডাকে দিলেন, মানসীদির ?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

কোন মন্তব্য করে না সে। একটু বাদে বলে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, যদি কিছু মনে না করেন..."

"তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেস করতে পারো।" আমি ওকে অভয় দিই।

জানকী বলে, "আচ্ছা, মানসীদির সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?"

"দু'বছরের কিছু বেশি।"

"কোথায় পরিচয় হল ?"

"মানালীতে।"

"তারপর থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে ?"

"না, একেবারেই যোগাযোগ ছিল না।"

"তাহলে ?" জানকীর স্বরে বিস্ময়।

একটু হেসে বলি, "হিমাচল পরিক্রমার শেষে পাঠানকোট স্টেশনে আমরা দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছিলাম। তারপরে দু'বছর আমাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। এবারে বৃন্দাবনে পৌঁছবার পরদিন সন্ধ্যায় সহসা বঙ্কুবিহারী মন্দিরের সামনে দেখা হল তার সঙ্গে। আমি ওর চেহারা ও পোশাক দেখে অবাক হয়েছিলাম। সে যে বৃন্দাবনে এসে এমন জীবন যাপন করতে পারে, এ ছিল আমার ধারণাতীত।"

"মেয়েদের সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা চিরকালই সীমাবদ্ধ। কাজেই নিজের ধারণার কথা না বলে মানসীদির কথা বলুন। তাঁর কথা আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।"

বিস্ময়কর কৌতূহল। তবু বলতে শুরু করি, "মানসী বড়-লোকের মেয়ে। শৈশবে মাকে হারিয়েছে। তার স্নেহপরায়ণ পিতা পরমস্নেহে মানুষ করেছেন তাকে। দেখতে শুনতে ও লেখা-পড়ায় ভালই ছিল সে। তার ছোড়দার দরিদ্র সহপাঠী সুদর্শন ও মেধাবী বিমলেন্দুকে ভালোবেসেছিল সে। বাবার অমতেই বিয়ে করেছিল তাকে।…"

"বিয়ে করেছিল! মানসীদি বিবাহিতা?" জানকী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে ওঠে।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই, "সে বিয়েতে ওর বাবার মত ছিল না, কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা ওকে বাধা দেন নি। শুধু তাই নয়, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি জামাইকে বিলেত পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন। শ্বশুরের পয়সায় ব্যারিস্টারী পাশ করে বিমলেন্দু দেশে ফিরল কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলো তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী মারিয়াকে।"

"ক্রিমিন্যাল।" জানকী প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

"হ্যাঁ।" আমি বলি, "মানসীর দাদারা বিমলেন্দুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। কিন্তু অসহায়া মারিয়ার কথা ভেবে মানসী তার

শাস্তি প্রার্থনা করতে পারে নি। সে শুধু জজসাহেবের কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছিল।

"জজসাহেব মানসীর সে আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। মানসী ফিরে পেয়েছিল তার বাবার পদবী। দাদারা আবার তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে রাজি হয় নি। মানুষের প্রতারণা মানসীকে দেবতাত্মা হিমালয়ের প্রতি আসক্ত করে তুলেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সে হয়ে উঠেছিল আমার একজন অনুগত পাঠিকা।..."

"মানে!" জানকী প্রায় চমকে ওঠে।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কথায় কথায় এমন একটা কথা বলে ফেলেছি, যেটি আমি এতদিন সহযাত্রীদের কাছে সযত্নে গোপন করেছি। এঁরা কেউ আমার লেখক-পরিচয় জানেন না। ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা নিয়ে বই লিখব বলে আমি এই যাত্রায় এসেছি। লেখক জানতে পারলে, সহযাত্রীরা আমার সম্পর্কে সর্বদা সজাগ হয়ে থাকবেন। আমি তাঁদের আর এমন করে কাছে পাবো না। স্বাভাবিক-ভাবেই আমি তাঁদের কাছে নিজের পরিচয় জানাতে পারি নি।

নিজের অলক্ষ্যেই সেই গোপন কথাটি জানকীর কাছে প্রকাশ করে ফেললাম। এবং যা বলে ফেলেছি, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং সন্ধি করি। তাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে অনুরোধ জানাই, "তুমি কিন্তু কথাটা আর কাউকে জানিও না জানকী!"

জানকী মাথা নাড়ে। কিন্তু সে যেন কেমন একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

খুবই স্বাভাবিক। কারণ লেখকরাও যে রক্ত-মাংসের মানুষ, একথা অনেক পাঠক-পাঠিকাই ভেবে দেখেন না। ফলে তাঁরা লেখকের সঙ্গে মনে মনে একটা দূরত্ব রচনা করে রাখেন। এমন একজন লেখককে অকস্মাৎ এত কাছে পেলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। এবং তার এই বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বেশ একটু সময় নেবে।

তাই তাকে অন্যমনস্ক করে তুলবার জন্য বলতে থাকি, "সেবারে লাহুল-পরিক্রমা শেষ করে আমি যখন মানালীতে এলাম, তখন আকস্মিকভাবে মানসীর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই আমরা দু'জনে দু'জনের বন্ধু হয়ে গেলাম। একসঙ্গে নাগর কুলু মণিকরণ ও যোগীন্দরনগর বেড়িয়ে আমরা পাঠানকোটে ফিরে এলাম।

"সহসা সেখানে মানসীর পিতৃ-বিয়োগের সংবাদ এলো। দুঃসংবাদটা না জানিয়েই আমি তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করেই মানসী সেদিন আমাকে তার ঠিকানা দেয় নি। এবং আমার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও দু'বছর আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ করে নি।*

"তারপরে হঠাৎ সেদিন বৃন্দাবনে বসে দেখা হল তার সঙ্গে। দেখলাম সে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করছে। কেন বলতে পারব না।"

"আমি পারি।" স্বাভাবিক স্বরে জানকী কথা বলে।

"কেন বলো তো?"

"শান্তির জন্য।" জানকী উত্তর দেয়।

"তোমার কি ধারণা তার সে সাধনা সফল হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি এসব বিশ্বাস করো?"

"করি বৈকি। আর তা করি বলেই তো মায়ের সঙ্গে এই পরিক্রমায় এসেছি।"

কোন উত্তর দিই না। কেবল মনে মনে সেই পরম মঙ্গলময়কে বলি—ঠাকুর, তুমি জানকীর এই সাধনাকে সফল করে তোল।

---

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' দ্রষ্টব্য

॥ বারো ॥

আজ তেরোদিন ধরে আমরা বন-বৃন্দাবনের পথে পথে পদচারণা করছি। সকালে সেরগড় থেকে রওনা হয়ে এখন নন্দঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। নন্দঘাট সেরগড় থেকে ৮ মাইল। পথে পড়বে অক্ষয়বট, গোপীঘাট ও চীরঘাট।

বহু বনযাত্রী সেরগড় থেকে নন্দঘাট যাবার পথে উবে গ্রাম হয়ে শ্রীরামঘাট দর্শন করতে যান। অর্থাৎ তাঁরা উত্তর-পূর্বদিকে পথ চলেন। রামঘাট মধু-বৃন্দাবনের বিখ্যাত ঘাটগুলির অন্যতম। রাম মানে শ্রীরামচন্দ্র নয়, বলরাম।

রামঘাট সেরগড় থেকে মাত্র ২ মাইল। কথিত আছে—বলরাম সেখানে সখীদের সঙ্গে দু'মাস রাসলীলা করেছিলেন। রাসলীলাকালে একদিন তাঁর জলকেলি করার বাসনা হল। তাই তিনি যমুনাকে আহ্বান করলেন। কিন্তু প্রেম-যমুনা কাছে এলেন না। হলধর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি হল দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করলেন। যমুনা আর দূরে থাকতে পারলেন না। তিনি কাছে এলেন। যমুনা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বলাবাহুল্য সঙ্কর্ষণ তাঁকে ক্ষমা করলেন। হরিবংশ-পুরাণেও এ কাহিনীটি বলা হয়েছে।

সেই থেকে যমুনা আজও রামঘাটের কাছে ত্রিধারায় বক্রভাবে প্রবাহিতা। সেখানে যমুনার আকৃতি অবিকল একটি ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতো। মনে হয় শূরশ্রেষ্ঠ বলরাম বৃহত্তর প্রয়োজনে তাঁর হলাস্ত্র দিয়ে খাল কেটে যমুনার ধারাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করেছিলেন।

রামঘাটের বলরাম মন্দিরটির কিন্তু শুনেছি খুবই জীর্ণ দশা। মন্দিরের পাশেই রয়েছে একটি সুপ্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। গাছটি নাকি

বলরামের সখা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কিছুকাল বাস করেছিলেন সেখানে।

রামঘাটের পুবদিকে শ্রীকৃষ্ণের রাসস্থলী ভুকনবন। কাছেই নিবারণবন বিহারবন ও তপোবন। বনগুলি নাকি বড়ই সুন্দর। তাহলেও আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, আমরা সোজাপথে চলেছি—চলেছি দক্ষিণ-পুবে। আমরা নন্দঘাটেই রাত্রিবাস করব।

আজ আবার চক্রবর্তী সঙ্গী হয়েছে আমাদের। গতকাল খেলন-বনের পথে সে আমাদের সঙ্গে ছিল না, কোশী থেকে কয়েকজন পুণ্যার্থীর সঙ্গে বাসে করে বড়-বৈঠান, চরণ-পাহাড়ী ও শেষশায়ী দর্শন করতে গিয়েছিল। সময়াভাবের জন্য গুরুমহারাজ আমাদের মূল-পরিক্রমা থেকে ঐ তিনটি দর্শনকে বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

দীক্ষা নেবার জন্য সেদিন চক্রবর্তী কাম্যবনের চরণ-পাহাড়ী দর্শন করতে পারে নি। বড় বৈঠানের চরণ-পাহাড়ী দেখে এসে তার সে আপসোস ঘুচেছে। তার ধারণা কৃষ্ণ-ভগবানের কৃপায় সে লাভবান হয়েছে। কারণ কাম্যবনের চরণ-পাহাড়ীর চেয়ে বড়-বৈঠানের চরণ-পাহাড়ী অনেক বড় এবং ভাল। সেখানে শুধু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন আর এখানে কৃষ্ণ এবং তাঁদের গোধন ও সখাদের চরণ-চিহ্ন রয়েছে। রয়েছে সেই রমণীয় বনের অধিবাসী হরিণ ঘোড়া ও হাতিদের পদচিহ্ন।

কিন্তু গতকাল ওদের ফিরে আসতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা তখন শুয়ে পড়েছি। সুতরাং চক্রবর্তী রাতে আর তেমন জমিয়ে গল্প বলতে পারে নি। আজ সকালেও সুযোগ পায় নি। তাই পথে বেরিয়ে চক্রবর্তী আজ আর কীর্তনীয়াদের সঙ্গে যোগ দেয় নি, আমাদের সঙ্গী হয়েছে। নাম-কীর্তন না করে আমাদের কানে কানে গতকালের কীর্তিকাহিনী কীর্তন করে চলেছে। মধু-বৃন্দাবনের পথে বেরিয়ে কীর্তনের প্রতি চক্রবর্তীকে এমন অমনোযোগী আর কখনও দেখি নি।

তাই বলে আমাদের অমনোযোগী হবার উপায় নেই। সে যখন কথা বলে, তখন কেউ অন্যমনস্ক হলে চক্রবর্তী ভীষণ ক্ষেপে যায়। সুতরাং আমাদের শুনতে হচ্ছে তার দর্শন-কাহিনী। চক্রবর্তী বলছে, "বুঝলে ঘোষ, তোমরা জানতে পারলে না কি হারালে? কি অপরূপ দর্শন তোমরা বাদ দিলে?"

"বাদ দিলাম কোথায়?" মাঝখান থেকে বৌদি প্রশ্ন করেন।

চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "বাদ দিলেন বৈকি। এত কাছে এসেও দর্শন করতে গেলেন না, একে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কি বলব?"

"না।" বৌদি বলেন, "একে বাদ দেওয়া বলে না। কারণ আপনি আমাদের যাত্রাসঙ্গী। আপনার দর্শন এবং আমাদের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য নেই কোন।"

"তা তো বটেই।" চক্রবর্তী রীতিমত অপ্রস্তুত।

বৌদি নীরব। সম্ভবত হাসি চাপতে ব্যস্ত। সেনবাবু ও বোসবাবু অন্যদিকে তাকিয়ে পথ চলেছেন। তাঁদেরও একই অবস্থা। আমিও কিছু বলতে ভরসা পাচ্ছি না, পাছে হেসে ফেলি।

মুখ রক্ষা করে জানকী। সে গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে, "আপনি তো জানেন চক্রবর্তীদা, শ্রবণে অর্ধেক দর্শন। কাজেই আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো, কি দেখে এলেন সেখানে?"

"আহা! সে-সব অপূর্ব দর্শন, জানকী!" উৎসাহিত চক্রবর্তী বলতে শুরু করে, "কোশী থেকে বাসে চড়ে মাত্র মাইল তিনেক বাদেই নামতে হল আমাদের। জায়গাটার সরকারী নাম বঠেন-কালান। আমরা বলি বড়বৈঠান। মথুরা থেকে দূরত্ব ৩০ মাইল। জ্ঞানীরা বলেন, সেখানে কৃষ্ণ-বলরামের বৈঠকখানা ছিল। কারও মতে বলরাম সেখানে বসে কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করেছিলেন। আবার কেহ বা বলেন, রাম-কৃষ্ণ নন্দগ্রাম থেকে বর্ষাণায় গিয়ে রাধারাণী ও সখীদের সঙ্গে হোলি খেলে শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বৈঠানে গিয়ে বিশ্রাম

নিয়েছিলেন। আর কৃষ্ণ তখন বলরামের পদসেবা করেছিলেন। বৈঠান শব্দের অর্থ বৈঠক।"

"আরও একটি অর্থ আছে।" মাঝখান থেকে বোসবাবু বলে ওঠেন।

"কি?" চক্রবর্তী তাঁর দিকে তাকায়।

বোসবাবু বলেন, "পশু-চারণক্ষেত্র।"

"তা হবে।" চক্রবর্তী আবার বলতে থাকে, "বড়-বৈঠানের সবচেয়ে বড় কুণ্ডটির নাম বলভদ্রকুণ্ড। ঘাটটি পাথর-বাঁধানো। ব্রজবাসীদের অনুরোধে শ্রীসনাতন গোস্বামী কিছুকাল বাস করেছিলেন সেখানে। দোল-পূর্ণিমার পরের দিন বেশ বড় মেলা হয় বড়-বৈঠানে। ব্রজবাসীরা এই মেলাকে বলেন হুরঙ্গমেলা। তাঁরা কুণ্ডের জলে রঙ ও আবির ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দেন। এই মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ গোপ ও গোপিনীদের লড়াই।"

"সেটা কি রকম?" বৌদি সহাস্যে প্রশ্ন করেন।

চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "বঠেন গাঁয়ের যুবতীরা লাঠি হাতে পাশের গাঁয়ের যুবকদের তাড়া করে। তারা গাছের ডালের ঢাল দিয়ে মেয়েদের মার ঠেকায়। কৃত্রিম মারামারি শেষ হবার পরে যুবক-যুবতীরা হাত ধরাধরি করে সারারাত নাচগান করে।"

"চমৎকার তো!" জানকী মন্তব্য করে।

"ব্রজমণ্ডলের সবই এমনি চমৎকার জানকী!" চক্রবর্তী সগর্বে ঘোষণা করে।

"আপনারা কোকিলা বনে গিয়েছেন?" বোসবাবু প্রশ্ন করেন।

বিমর্ষ স্বরে চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "না প্রভু, যেতে পারি নি।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "মানে সময় কম বলে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। শুনেছি নাকি বড় সুন্দর, অপরূপ কৃষ্ণলীলাস্থল।"

"হ্যাঁ।" সেনবাবু বলেন, "ব্রজভাষার কবিদের প্রিয়তম বন।"

সেনবাবু থামতেই চক্রবর্তী আবার শুরু করে, "চলতি ভাষায় গৌড়ীয় ভক্ত-বৈষ্ণবরা বৈঠানকে বঠেন বলে। বড়-বৈঠানের আধ মাইল উত্তরে ছোট-বৈঠান। শ্রীকুন্তলকুণ্ড সেখানকার শ্রেষ্ঠ দর্শন। কৃষ্ণ-ভগবান নাকি ঐ কুণ্ডের তীরে দাঁড়িয়ে সখাদের সঙ্গে কেশবিন্যাস করেছিলেন।"

"ছোট-বৈঠান দেখে বোধহয় আপনারা চরণ-পাহাড়ীতে গেলেন?" জানকী প্রশ্ন করে।

"চরণ-পাহাড়ী!" বৌদি বিস্মিতা। বলেন, "চরণ-পাহাড়ী যে কাম্যবনে! আমরা তো সেদিন দর্শন করলাম।"

চক্রবর্তী মৃদু হাসে। তাঁর ভাবখানা—সেদিন দীক্ষা নেবার জন্য আমি কাম্যবনের চরণ-পাহাড়ী দর্শন করতে পারি নি। তেমনি তোমরা কেউ এটি দর্শন করতে পারলে না। সে সগর্বে বলে, "সেটা ছোট, এটি বড় চরণ-পাহাড়ী! ছোট-বৈঠানের এক মাইল উত্তরে। সে এক অপূর্ব দর্শন প্রভু!"

"প্রভু নয়, বৌদি বলুন।" সেনবাবু বাধা দেন, খুবই স্বাভাবিক, বৌদি তাঁর সহধর্মিণী।

আমরা হেসে ফেলি।

চক্রবর্তী গম্ভীর স্বরে বলে, "হ্যাঁ, সরি!" তারপরে সে ভক্তি-বিনম্র কণ্ঠে শুরু করে, "ছোট-বৈঠান থেকে মাত্র মাইলখানেক উত্তরে বেশ বড় একটি বনাবৃত পাহাড়ের ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য চরণচিহ্ন—গরু ঘোড়া হাতি হরিণ ও মানুষের পায়ের ছাপ। কঠিন সেই পাথরের ওপরে কেমন করে ঐ সব পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে জানো?"

"না।" জানকী উত্তর দেয়।

"তাহলে শোনো।"

"বলুন।"

চক্রবর্তী বলতে থাকে, "শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে বলদেব একবার সমস্ত

বয়োজ্যেষ্ঠ গোপ, গোধন, ঘোড়া, হরিণ ও হাতিদের নিয়ে ঐ শিলাখণ্ডের ওপরে উপস্থিত হলেন। আর তারপরেই কৃষ্ণ সহসা বংশীধ্বনি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই সুকঠিন শিলা গলতে শুরু করল —পাষাণের ওপরে মানুষ ও পশুর পদচিহ্ন অঙ্কিত হল। সেই অপরূপ লীলাস্থলীর নামই চরণ-পাহাড়ী।"

"শুনেছি কাছেই চরণগঙ্গা নামে একটি জলধারা রয়েছে?" বোসবাবু এতক্ষণে কথা বলেন। তিনি চিরকালই কম কথার মানুষ। মধ্যবয়সী এই পরোপকারী ছোট-খাটো অকৃতদার মানুষটি প্রথম থেকেই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

"হ্যাঁ।" চক্রবর্তী উত্তর দেয়, "কৃষ্ণ-ভগবান সেখানে শ্রীচরণ ধৌত করেছিলেন। কিন্তু আমরা সে পুণ্যতোয়াটি দর্শন করতে পারি নি।" তার স্বরে স্পষ্ট অনুশোচনা।

কিন্তু জানকীর দেখছি সেজন্য কিছুমাত্র সমবেদনা নেই। সে বলে বসে, "আচ্ছা, আপনাদের ঐ চরণ-পাহাড়ীর চরণচিহ্নের ভেতরে নাকি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন নেই?"

"কে বললে?" চক্রবর্তী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে পাল্টা-প্রশ্ন করে।

বৌদি উত্ত' দেন, "মথুরা মহারাজ।"

মুহূর্তে মিইয়ে যায় চক্রবর্তী। ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করে, "কি বলেছেন তিনি?"

"বলেছেন, কাম্যবনের চরণ-পাহাড়ীতে যে চরণচিহ্ন রয়েছে, তার চেয়ে ওখানকার চরণচিহ্নগুলি অনেক বড়। কাজেই সেগুলি রাম-কৃষ্ণ কিংবা সখা-সখীদের চরণচিহ্ন নয়, বৃদ্ধ গোপদের পদচিহ্ন।"

"হতে পারে।" চক্রবর্তী বাধ্য হয়ে মথুরা মহারাজের মতটি মেনে নেয়।

তাকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যই বোধহয় বোসবাবু বলেন, "এবারে আপনি শেষশায়ীর কথা বলুন।"

চক্রবর্তী আবার উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করে, "চরণ-পাহাড়ী

দর্শন করে আমরা নেমে এলাম লোকালয়ে। বাজারে পৌঁছে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপরেই বাস এলো। বেলা দু'টো নাগাদ শেষশায়ী পৌঁছলাম। কয়েক পা হেঁটেই ক্ষীরসাগর—বেশ বড় একটি কুণ্ড। কুণ্ডের পশ্চিমতীরে নারায়ণের অনন্তশয্যা। লক্ষ্মী তাঁর চরণসেবা করছেন। পাণ্ডারা বললেন—কৌতুক করে একবার কৃষ্ণ নাকি ক্ষীরসাগরে জলের ওপরে শুয়ে পড়েছিলেন। রাধারাণী তখন তাঁর চরণবন্দনা করেছিলেন। সেই থেকেই ঐ পুণ্যক্ষেত্র শেষশায়ী নামে পরিচিত।"

"তা ব্রজবাসীরা কি সেখানে আপনাদের মাঠা দিয়ে সেবা করেছেন?" চক্রবর্তী থামতেই বোসবাবু প্রশ্ন করেন।

"না তো!" চক্রবর্তী সবিস্ময়ে উত্তর দেয়।

"সেকি মশাই!" এবারে সেনবাবু কথা বলেন, "আমিও শুনেছি, শেষশায়ীর ব্রজবাসীরা নাকি বড়ই অতিথিপরায়ণ। ভক্ত-বৈষ্ণবদের তাঁরা সর্বদা ঘোল খাওয়ান।"

"আমাদের খাওয়ায় নি তো!"

"তার মানে তাঁরা বুঝতেই পারেন নি যে, আপনারা ভক্ত-বৈষ্ণব।" জানকী মাঝখান থেকে মন্তব্য করে।

আমরা হেসে উঠি। চক্রবর্তী নিজের অসুবিধে বুঝতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "অনেকক্ষণ থেকে কীর্তন না করে গল্প করছি। গুরুদেব বোধহয় লক্ষ্য করছেন আমাকে।"

আমাদের কাউকে আর কিছু বলার কোন সুযোগ না দিয়ে চক্রবর্তী সামনে এগিয়ে যায়। কীর্তনীয়াদের সঙ্গে যোগ দেয়। দু'হাত উপরে তুলে গাইতে শুরু করে—

'...তবে মায়া পাতি সেই প্রলম্ব-অসুরে।
কপট করিয়া তবে বলদেবে হারে॥
জিনিয়া বলাই তার কান্ধের উপরে।
লাফ দিয়া যায় তবে সেই ত' অসুরে॥...

কৃষ্ণের কথা শুনি বলাই দৃঢ় মুষ্টি করি।
দুই পায় দিয়া তারে গলা চাপি ধরি॥
মুষ্টি মারিল তার মস্তক উপরে।
সান্ধাইল মুণ্ড-গোটা স্কন্ধের ভিতরে॥...
পড়িয়া মরিল তবে প্রলম্ব-অসুর।
দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিল প্রচুর॥...'

কেষ্টপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে প্রলম্ব-বধের কাহিনী কীর্তন করছেন, চক্রবর্তী গিয়ে তারই সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

কেষ্টপ্রভুর এখন প্রলম্বাসুর বধের কীর্তন করার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। আমরা যে অক্ষয়বটকে পাশে রেখে চলেছি এগিয়ে। অনেকের ধারণা এই অক্ষয়বটই ভাণ্ডীরবট এবং এখানেই বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন।

ধারণাটি কিন্তু সত্য নয়। যমুনার ওপরে ভাণ্ডীরবনেই প্রকৃত ভাণ্ডীরবট আর সেখানেই বলরাম প্রলম্বকে বধ করেছিলেন। আমরা আগামীকাল ভাণ্ডীরবনে যাব। সুতরাং প্রলম্ব-বধের কথাও কালই হবে, এখন আজকের পথের কথা হোক্।

অক্ষয়বট ছাড়িয়েই গোপীঘাট। কথিত আছে ব্রজবালারা সেই ঘাটে বসেই কাত্যায়নী ব্রত করেছিলেন। তাই গোপীঘাটের অপর নাম তপোবন। এখান থেকে চীরঘাট ২ মাইল ও নন্দঘাট ৪ মাইল। অর্থাৎ আমরা আজকের পদযাত্রার অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

সংকীর্তন শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। কিছুক্ষণ বাদে আর একটি ঘাটের কাছে এলাম। ভক্তি মহারাজ ইসারা করে বললেন, "ঐ হচ্ছে চীরঘাট।"

বিস্মিত হলাম, চীরঘাট তো বৃন্দাবনে? গোবিন্দঘাটের উত্তরে ও ভ্রমরঘাটের দক্ষিণে অবস্থিত সে ঘাট আমরা দর্শন করেছি।* মহাপ্রভু বৃন্দাবনে পদার্পণ করে সেই ঘাটে স্নান করে-

* 'ব্রজপর্ব' দ্রষ্টব্য

ছিলেন। কেশীদৈত্যকে বধ করার পরে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বিশ্রাম করেছিলেন। চীরঘাট শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলাস্থল।

কিন্তু সে-সব কথা বলা যাবে না ভক্তি মহারাজকে। নিজের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর একটা আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস। সুতরাং কোন প্রতিবাদ করি না, তাঁর কথা শুনতে শুনতে নীরবে পথ চলি। ভক্তি মহারাজ বলছেন, "গোপীঘাটের ছ'মাইল দক্ষিণে এবং অক্ষয়বটের অগ্নিকোণে অবস্থিত এই চীরঘাট। ঐ দেখুন ঘাটের ওপরে কৃষ্ণলীলাকালের সেই কদম্ব-বৃক্ষ বিরাজমান। আর এই হচ্ছে কাত্যায়নীদেবীর মন্দির।"

সহযাত্রীদের সঙ্গে আমরাও সেই ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রণাম করি। তারপরে এগিয়ে চলি নন্দঘাটের দিকে। নন্দঘাট এখনও ছ'মাইল। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের শোভাযাত্রা।

কেষ্টপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকেই কীর্তন করে যাচ্ছেন। তিনি গাইছেন—

'ধ্যান করি চিন্তি মনে দেব শ্রীহরি।
ধরিয়া বরুণ-দূতে নিল তার পুরী॥
সেই পথে জল-মধ্যে করিল গমন।
বরুণের পুরী গেলা দেব নারায়ণ॥
দেখিয়া বরুণ তবে শ্রীমধুসূদন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন॥ ··
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে তুমি অধিকারী।
মুক্তি-দায়ক তুমি, দেব শ্রীহরি॥
সফল হইল জন্ম দেখিনু চরণ।
বাপ লইয়া ঘর গোসাঞি করহ গমন॥ ··
হরষিত নন্দ ঘোষ সঙ্গে গদাধর।
বরুণের পুরী হৈতে দুঁহে আইলা ঘর॥....'

সহযাত্রীরা কেউ বা কীর্তন করছেন, কেউ বা গল্প করতে করতে

পথ চলেছেন। আগামীকাল এঁদের অনেকেই সঙ্গে থাকবেন না। কারণ যমুনায় নৌকো পাওয়া না গেলে কাল পায়ে হেঁটেই যমুনা পার হতে হবে। তাই অনেকেই ঠিক করেছেন গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে বাসে করেই মাটবনে চলে যাবেন। অনেকটা ঘুরে ওপারে পৌঁছতে হবে তাঁদের। তার ওপরে ভদ্রবন ও ভাণ্ডীরবন দর্শন করতে পারবেন না। কিন্তু যমুনা পার হবার হাঙ্গামা পোহাতে হবে না। যমুনায় নাকি মানুষখেকো কচ্ছপ আছে।

না, সহযাত্রীদের কথা নয়। আমি কিন্তু আপনমনে ভেবে চলেছি কীর্তনের কথা। কেষ্টপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয় থেকে শ্রীকৃষ্ণের নন্দমোক্ষণ-লীলার কাহিনী কীর্তন করছেন। আমরা যে এখন সেই অপরূপ লীলাস্থল নন্দঘাটে চলেছি।

শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টবিংশ অধ্যায়ে সেই লীলা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

কথিত আছে, মহারাজ নন্দ প্রতিদিন প্রত্যূষে নন্দঘাটে স্নান করতেন। কোন এক একাদশীর দিনে হরিবাসর পালন করে তিনি নারায়ণের অর্চনা করলেন। তারপরে যমুনার ঐ ঘাটে গেলেন স্নান করতে। নন্দরাজ শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী যমুনায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বরুণের জনৈক অসুর-ভৃত্য ভাবল—আসুরীবেলায় যমুনায় স্নান করে অপরাধ করেছেন নন্দরাজ। তাই সে নন্দরাজকে নিয়ে গেল বরুণের কাছে।

এদিকে নন্দরাজের সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে না পেয়ে 'হে কৃষ্ণ, হে বলরাম' বলে আর্তনাদ শুরু করে দিলেন।

গোপগণের আকুল আহ্বান শুনে ভক্তজনের রক্ষক ও অভয়দাতা কৃষ্ণ-ভগবান ছুটে গেলেন নন্দঘাটে। তিনি বুঝতে পারলেন বরুণের কোন অনুচর পিতা নন্দকে অপহরণ করেছে। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন বরুণালয়ে।

লোকপাল বরুণ হৃষীকেশ গোবিন্দকে পরম সমাদরে বরণ করে

নিলেন। নানা উপকরণ দিয়ে তাঁর পুজো করলেন। তারপরে যুক্ত-করে বললেন—আপনার চরণ দর্শন করে আমার অনেক দিনের মনোরথ পূর্ণ হল। আমার দেহধারণ সফল হল। আমি কৃতার্থ হলাম। আমার ভৃত্য মূঢ়, তাই সে আপনার পিতাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি নন্দরাজকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

কৃষ্ণ ক্ষমা করলেন বরুণকে। তারপরে পিতাকে নিয়ে ফিরে এলেন নন্দঘাটে। ব্রজের ঘরে ঘরে আনন্দের প্লাবন প্রবাহিত হল। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের জয়গানে মধু-বৃন্দাবন মুখরিত হয়ে উঠল।

॥ তেরো ॥

মধু-বৃন্দাবনের বনপথে পাড়ি দিতে হলে প্রেম-যমুনা পেরোতেই হবে।

একুল ওকুল দু'কূল মিলিয়েই মধু-বৃন্দাবন। একূলে অর্থাৎ যমুনার এই পশ্চিমতীরে মধুবন, তালবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খেলন-বন ও বৃন্দাবন। আর মথুরা, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন, ডিগ্, বর্ষাণা, নন্দগ্রাম, যাবট, কোশী, শেষশায়ী প্রভৃতি তীর্থ এবং স্থল।

ওকূলে অর্থাৎ যমুনার ঐ পূর্বতীরে ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, মাটবন, বিল্ববন, মান-সরোবর, লৌহবন, রাবেল ও গোকুল-মহাবন।

নন্দঘাটে এসে আমাদের এপারের দর্শন শেষ হল। এবারে ওপারের দর্শন কয়টি শেষ করতে পারলেই পূর্ণ হবে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা। কিন্তু ওপারে যেতে হলে প্রেম-যমুনা পেরোতেই হবে।

সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আজ বেরিয়ে পড়েছি পথে। কীর্তন করতে করতে এগিয়ে চলেছি প্রেম-যমুনার কূলে।

আজ আর সকালে রওনা হবার দরকার হয় নি। নন্দঘাট থেকে মাটবন মাত্র ৬ মাইল। তাই প্রসাদের পরে রওনা হয়েছি আমরা।

সকালে রওনা না হবার আরও একটি কারণ ছিল। এ তো আর পর্বতাভিযান নয় যে, দু-তিন প্রস্থ করে বাসন-পত্র থাকবে। এ হল গিয়ে দামোদর-ব্রতধারী ভক্ত-বৈষ্ণবদের ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। আমরা একপ্রস্থ বাসনপত্র নিয়েই বন-ভ্রমণ করছি। ফলে এখানেই দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা না চুকিয়ে নিলে অসুবিধে হত। নন্দঘাট থেকে হাঁটা-পথে মাটবন মাত্র ৬ মাইল। কিন্তু যমুনা পার হবার জন্য মালবাহী 'বাস'-কে মথুরা ঘুরে যেতে হবে। তার মানে গোবর্ধন মহারাজকে প্রায় 'দশগুণ' পথ পেরিয়ে মালপত্র নিয়ে

পৌঁছতে হবে সেখানে। তাই তিনি দুপুরের প্রসাদপর্ব এখানেই শেষ করে নিলেন।

বয়স্ক যাত্রীরা প্রায় সকলেই এবং বৌদিসহ মহিলারা অনেকেই বাসে করে চলে গিয়েছেন। বণিকপ্রভুও তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন। কিন্তু বহু বলার পরেও মিসেস বণিক সঙ্গী হন নি তাঁর। তিনি শুধু স্বামীকে ভরসা দিয়েছেন—আমার জন্য ভেবো না তুমি, আমি ঠিক পৌঁছে যাব।

পুণ্যের প্রয়োজনে পতিপরায়ণা স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ অমান্য করেছেন। পায়ে হেঁটে পরিক্রমা করলে যে অধিক পুণ্য অর্জন হয়। এত কষ্ট করে এ পর্যন্ত এসেছেন, এখন বাসে চড়ে পুণ্যের পরিমাণ কমাতে চান না।

কিন্তু তিনি যমুনা পার হবেন কেমন করে? বয়সের কথা ছেড়ে দিলাম। তিনি যে বাতের রোগী। কোমর থেকে শরীরের উর্ধ্বাংশ সোজা করতে পারেন না। মাটির প্রায় সমান্তরাল করে পথ চলতে হয়। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে যমুনা পার হওয়া সহজ কথা নয়। যমুনায় জল কম হতে পারে, কিন্তু নদীখাত তো ছোট নয়। রীতিমত সুদীর্ঘ। সেখানে বালি কাঁকর আর কচ্ছপের সমারোহ।

এসব কথা বলা হয়েছে তাঁকে। শুধু বণিকপ্রভু নন, বলেছেন মহারাজ ও ব্রহ্মচারীরা, বলেছে জানকী, সেনবাবু, বোসবাবু ও চক্রবর্তী, বলেছি আমি।

উত্তরে তিনি শুধু করুণ কণ্ঠে অনুরোধ করেছেন—আমার মন বলছে আমি পারব, তোমরা আমাকে বাধা দিও না।

না, আর বাধা দিই নি। কারণ আমারও মন বলছে, তিনি পারবেন। এই শরীর নিয়ে তিনি ইতিপূর্বে যা করেছেন তাও তো কম আশ্চর্যের নয়। কোথাও কোথাও তিনি রিক্শা টাঙ্গা কিংবা ডুলি করেছেন সত্য, কিন্তু যেখানে তা পাওয়া যায় নি, সেখানেও

পেছ-পা হন নি। তিনি প্রতিটি মন্দির দর্শন করেছেন, প্রতিটি পাহাড়ে উঠেছেন, প্রতিটি কুণ্ডের জল স্পর্শ করেছেন।

কিন্তু কেন? কেন তিনি এত কষ্ট করে এই পরিক্রমা করছেন? এ কি শুধুই পুণ্যলাভের জন্য? কি হবে সে পুণ্য দিয়ে? তিনি রোগমুক্ত হবেন? তাঁর ভাশুরপোর মতি-গতির পরিবর্তন হবে কি?

কিন্তু বণিকপ্রভুর ভাইপোর কথা থাক্, তাঁর স্ত্রীর কথাই ভাবা যাক্। ভদ্রমহিলা যেমন স্নেহশীলা তেমনি পতিপরায়ণা। বণিক-প্রভু বেশ একটু বিকারগ্রস্ত মানুষ। খিটখিটে স্বভাব। স্বাস্থ্যও ভাল নয়, অথচ অত্যন্ত ভোজনবিলাসী।

বৃন্দাবনের মতো বন-পরিক্রমার সময়েও স্ত্রী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক ঘর নির্দিষ্ট হচ্ছে। কোন ধর্মশালায় আমরা নিচে থেকেছি, মেয়েরা ওপরে রয়েছেন। কোথাও বা আমরা বাইরের মহলে বাস করছি, মেয়েরা ভেতরে রাত্রিবাস করছেন। আমরা যেমন ওঁদের মহলে যাচ্ছি না, ওঁরাও আমাদের মহলে বড় একটা আসেন না। বৌদি কিংবা খাণ্ডাপ্রভুর স্ত্রী কোনদিন তাঁদের স্বামীদের খোঁজখবর নিতে আমাদের ঘরে আসেন নি। অথচ বণিকপ্রভুর স্ত্রী প্রত্যেকদিন সকাল-সন্ধ্যায় স্বামীর কাছে আসেন। শুধু সংবাদ নিতে নয়, সেবা করতে। কখনও বা লেবুর সরবৎ নিয়ে আসেন, কখনও বা তাঁকে ওষুধ খাইয়ে যান।

কিন্তু বণিকপ্রভুর স্ত্রীর কথা ভাববার আর অবকাশ নেই। আমরা যে পৌঁছে গেছি যমুনাপুলিনে অর্থাৎ নন্দঘাটের ঘাটে। ঘাটের নামেই জায়গার নাম। ঘাটকে কেন্দ্র করেই যে গড়ে উঠেছে জনপদ

এবারে নামতে হবে জলে—যমুনার জলে। ব্রহ্মপুত্র কিংবা ইছামতীর শাখানদী যমুনা নয়, বগুড়া কিংবা নাগা পাহাড়ের যমুনা নয়—বান্দরপুচ্ছ শৃঙ্গ-নিঃসৃত যমুনোত্রীর যমুনা। রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলার সাক্ষী যমুনা। সূর্য কন্যা ও যমরাজের ভগিনী যমুনা। তপনতনুজা শ্যামা কালিন্দী।

সে শ্যামা কেননা সূর্যের তেজে তাঁর মাতার সুন্দর কান্তি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে কালিন্দী কেননা সে কলিন্দ শৈলজা—সে কলিন্দনন্দিনী। সে শমনস্বসা, সে যমস্বসা, সে তাপী। সে যমী ও যমনী। সে কৃষ্ণপ্রিয়া, তাই যমুনা আমাদেরও পরমারাধ্যা।

সহযাত্রীরা সকলেই ঘাটে এসে পৌঁচেছেন। তাঁরা যমুনাকে দেখছেন। মথুরা ছাড়ার পরে গতকালই যমুনার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছে আমাদের। আমরা তার তীরভূমি ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। এখন আবার এসেছি তার তীরে—প্রেম-যমুনার তীরে।

আমি কিন্তু আর যমুনার কথা ভাবছি না। ভাবছি তাঁর ঘাটের কথা—এই নন্দঘাট।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই ঘাট। শ্রীরূপ-সনাতনের ছোট ভাই অনুপমের ছেলে শ্রীজীব। তিনি বিশ বছর বয়সে বৃন্দাবনে এসেছিলেন। সেটি সম্ভবত ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ।

বৃন্দাবনে এসে শ্রীজীব রূপ-সনাতনের কাছে ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি বৈষ্ণব সমাজের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচার দেখে রূপ-সনাতন এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে দিয়ে নিজেদের গ্রন্থাদি শুদ্ধ করিয়ে নিতেন।

শ্রীজীব তখন শ্রীরূপের সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস করছেন। একদিন তিনি যখন ঘাটে স্নান করতে গিয়েছেন, তখন জনৈক অহঙ্কারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ গোস্বামীর ভজনকুটিরে হাজির হলেন। তিনি শ্রীরূপকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। শ্রীরূপ সবিনয়ে সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্থাৎ তিনি বিনা তর্কে দিগ্বিজয়ীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

অহঙ্কারী দিগ্বিজয়ী তখন সোচ্চার স্বরে সেই কথা বলতে বলতে ঘাটের দিকে এগিয়ে চললেন। পথে শ্রীজীবের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। সব শুনে শ্রীজীব বড় অপমানিত বোধ করলেন। বাধ্য হয়ে

তিনি দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এবং বলা বাহুল্য কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগ্বিজয়ীর গর্ব খর্ব হল। তিনি শ্রীজীবের কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে নতমস্তকে বৃন্দাবন ত্যাগ করলেন।

লোকমুখে কথাটা কানে এলো শ্রীরূপের। তিনি কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না, বরং ভয়ানক রেগে গেলেন শ্রীজীবের ওপরে। তিনি শ্রীজীবকে তিরস্কার করলেন। বললেন—এখনও তোর মনে প্রতিষ্ঠার লোভ রয়েছে, তুই অবৈষ্ণব। তুই আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা।

অনুতপ্ত শ্রীজীব হাঁটতে হাঁটতে এসে উপস্থিত হলেন এই নন্দঘাটে। জায়গাটা বড়ই ভাল লাগল তাঁর। তিনি এখানেই বাস করতে থাকলেন। তখন নন্দঘাট বনময়। কাছাকাছি কোন জনবসতি ছিল না। কাজেই দূর গাঁয়ের মানুষরা কোনদিন এসে কিছু দিয়ে গেলে, সেদিন শ্রীজীবের খাওয়া জুটত, নইলে তাঁকে উপোস করতে হত।

শ্রীজীবের অবশ্য তাতে কোন কষ্টই হত না। বরং সেই বনবাস কালেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ষটসন্দর্ভ' রচনা করলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীসনাতনের নির্দেশে রূপ গোস্বামী নিজে এসে শ্রীজীবকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু 'ষটসন্দর্ভ' প্রণয়নভূমি নন্দঘাট আজও বৈষ্ণবদের কাছে পরমতীর্থরূপে সমাদৃত।

সহযাত্রীরা ঘাটে নামছেন। আমিও নন্দঘাটের ভাবনা ছেড়ে তাঁদের সঙ্গী হই।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ঘাটে একখানি নৌকো রয়েছে। কিন্তু জল যে যৎসামান্য—নৌকো চলবে কি?

মাঝি কিন্তু বলছে চলবে। তবে 'চার্জ'টা একটু বেশি পড়বে, জনপ্রতি চার আনা।

বেশি কোথায়? সেকালে তো ষোল আনা না হলে পারাপারের

তরী মিলত না। আহা, কত কষ্টেই ব্রজগোপীদের সেই পারের কড়ি যোগাড় করতে হয়েছিল! কি করবে বেচারীরা, কানুর মতো নাছোড়বান্দা নেয়ে যে আর জন্মায় নি এ সংসারে। নইলে অমন দরাদরি করার পরেও কেউ বলতে পারে,

'শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি,
আমারে তুলিয়া কর পারে॥…
রাখাল হইয়া বনে সদা ফিরি ধেনুসনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী।
তোমার পিরীতি পাইয়া এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
তুয়া লাগি হইনু কাণ্ডারী॥'*

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। নেয়ের সঙ্গে দরাদরি করে ঠিক হল চার আনা নয়, টাকায় পাঁচজন করে পার করবে সে। তবে কমপক্ষে পঁচিশ জন যাত্রী হওয়া চাই। অর্থাৎ সে অন্তত পাঁচটি টাকা রোজগার করতে চায়।

এ সর্তে অবশ্য আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। যাত্রীর সংখ্যা পঁচিশ ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু বিপদ বাধল নৌকোয় চড়া নিয়ে। কাদা তো ভাঙতেই হবে, সে না হয় নৌকোয় গিয়ে পা ধুয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু নৌকো যে রয়েছে বেশ খানিকটা দূরে। জল কম বলে একেবারে তীরে আসতে পারছে না। অর্থাৎ কাপড় না ভিজিয়ে নৌকোয় ওঠার উপায় নেই।

তাই করলেন ওঁরা। কিন্তু বণিকপ্রভুর স্ত্রীর পক্ষে জলে নামা কষ্টকর। তিনি অবশ্য নামতেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে নিষেধ করলাম। তাঁকে কোলে করে নৌকোয় চড়িয়ে দিলাম।

জানকী দেখছি এখনও তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নৌকোয় ওঠার নাম

*শ্রীজগন্নাথ দাস (ব্রজপর্ব দ্রষ্টব্য)।

করছে না। কাছে এসে বলি, "তাড়াতাড়ি যাও, এখুনি যে নৌকো ছেড়ে দেবে!"

"ছাড়ুক গে!" জানকী ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়।

"কেন? তুমি কি নৌকোয় যাবে না?"

"না।"

"কেন?"

"কাপড় যদি ভিজেই যায়, তাহলে আর নৌকোয় চড়ে কি লাভ?"

"আপত্তি না থাকলে বণিকপ্রভুর স্ত্রীর মতো তোমাকেও আমি নৌকোয় নিয়ে যেতে পারি।"

"ঐভাবে কোলে করে ওপারে নিয়ে যেতে পারেন না বুঝি?"

"তাও পারি।"

"না, পারেন না।" একবার থামে সে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলে, "শক্তি থাকলেও অতখানি সাহস নেই আপনার।"

চোখ সরিয়ে নিই। কোন জবাব দিতে পারি না, চুপ করে থাকি। সে-ও আর কিছু বলে না। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসে জলে—প্রেম-যমুনার জলে।

বলা বাহুল্য সহযাত্রীদের অধিকাংশই পায়ে হেঁটে পার হচ্ছেন। তবে জানকী ছাড়া অন্যান্য মেয়েরা সবাই নৌকোয় উঠেছেন। জানকী অক্লেশে জল ভেঙে আমাদের সঙ্গে ওপারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

সামান্যই জল। কোথাও কোমরের বেশি নয়, তবে বেশ ঠাণ্ডা জল। হবেই তো, হেমন্তের শেষ।

আমরা জল ভেঙে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। কয়েকজন ব্রহ্মচারী আগে আগে চলেছেন, আমরা সারি বেঁধে তাঁদের পেছনে চলেছি। জলে নামার আগেই মথুরা মহারাজ সাবধান করে

দিয়েছেন—খুব হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলবেন, কচ্ছপ আছে কিন্তু। তাদের গায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে।

ঠিকই বলেছেন তিনি। কারণ, মধু-বৃন্দাবনের যমুনায় বহু মানুষখেকো কচ্ছপ আছে। তাদের পাল্লায় পড়লে অন্তত একখানি পা না খুইয়ে মুক্তি পাওয়া যায় না। আর অনেক সময় সে মুক্তি মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাজির হয়।

প্রথম জলধারাটি পেরিয়ে এলাম। শুরু হল বালি আর কাঁকরের বিস্তীর্ণ নদীখাত। ভাগ্যিস এখনও তেমন রোদ ওঠে নি। এই বালি তেতে উঠলে আর রক্ষে ছিল না। পায়ে নির্ঘাৎ ফোস্কা পড়ে যেত। মানসী যতই বলে দিক্, সহযাত্রীরা সবাই যখন খালি-পায়ে পথ চলেছেন, তখন আমার পক্ষে কাঁধের ঝোলা থেকে হাওয়াই চপ্পল বের করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাঁদের সঙ্গে পথ চলছি, আমাকে যে তাঁদের মতই হতে হবে। নইলে আমি মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমার কথা লিখব কেমন করে?

বালিয়াড়ি পেরিয়ে আমরা এলাম দ্বিতীয় জলধারাটির কাছে। এই দু'টি ধারা নিয়েই মধু-বৃন্দাবনের, যমুনা। একটি ওপারে, একটি এপারে। একটি মন-বৃন্দাবনের আর একটি বন-বৃন্দাবনের। কিছু দূর গিয়ে দু'টি ধারা এক হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়েই নৌকো ওপারে যাবে।

এই সেই যমুনা—যমুনোত্রীর যমুনা, কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থের যমুনা, মথুরা ও বৃন্দাবনের যমুনা, আগ্রা ও প্রয়াগের যমুনা। দিল্লী থেকে সে এসেছে এখানে—এই বৃন্দাবনে। এখান থেকে আগ্রা হয়ে চলে গিয়েছে পূর্ণকুম্ভের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগে। পূর্ণ করেছে তার আটশো ষাট মাইল দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা—নীল-যমুনা বিলীন হয়েছে গৈরিক-গঙ্গায়।

একটা আর্ত চিৎকারে আঁতকে উঠি। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। জানকী জলের ভেতর হাবুডুবু খাচ্ছে আর তারস্বরে চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

তার কাছাকাছি যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা বোধহয় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিস্ফারিত চোখে নিমজ্জমানা জানকীর দিকে তাকিয়ে নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেউ তাকে জল থেকে তুলছেন না।

জানকীই বা জল থেকে উঠছে না কেন? স্বাস্থ্যবতী এবং বুদ্ধিমতী যুবতী হয়েও সে এমন খাবি খাচ্ছে! জল তো সামান্যই। বড়জোর তার বুক অবধি।

কী হয়েছে জানকীর? কচ্ছপে ধরে নি তো?

ভাববার সময় নেই। ছুটে যাই জানকীর কাছে। ধরে ফেলি তাকে। নিমজ্জমানের মতই সে ছু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমিও জলে পড়ে যাই। কিন্তু জানকীকে ছেড়ে দিই না। তাকে পাঁজাকোলে করে উঠে দাঁড়াই। সে তেমনি আমার গলা জড়িয়ে থাকে। তবে চিৎকার থামিয়েছে, কিন্তু এখনও তার মুখে আতঙ্কের আভাস।

সহযাত্রীরা সম্বিৎ ফিরে পান। সমস্বরে জিজ্ঞেস করেন, "কি হয়েছিল? অমন চেঁচাচ্ছিলে কেন?"

ফ্যালফ্যাল করে তাঁদের দিকে একবার তাকায় জানকী। তারপরে আমার দিকে চেয়ে শঙ্কা-জড়ানো স্বরে বলে, "কচ্ছপ!"

"কোথায়?"

"আছে···এখানে।" একবার ঢোঁক গেলে সে।

হেসে বলি, "তুমি ভুল ভেবেছো। থাকলেও তারা তোমার কোন ক্ষতি করত না। এই তো আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছি।"

"না।" জানকী ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে। বলে, "আমি কচ্ছপটার পিঠের ওপর পা দিয়েছিলাম। সে বোধহয় আমার পায়ে কামড়ে দিয়েছে।"

ওর পায়ের দিকে তাকাই। পা ছু'খানি সম্পূর্ণ অক্ষত।

হাসতে হাসতে বলি, "কচ্ছপ একবার যা কামড়ে ধরে, তা আর ছেড়ে দেয় না। তোমার পা যখন রয়েছে, তখন কচ্ছপটা তোমাকে কামড়ে দেয় নি।"

জানকী ক্ষেপে যায়। ভয়ের কথা ভুলে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, "তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি?"

"না, না, মিথ্যে কথা বলতে যাবে কেন? তুমি সত্যি সত্যিই একটা প্রকাণ্ড বড় কচ্ছপের পিঠের ওপর পা দিয়েছিলে। স্বাভাবিক-ভাবেই সেটা সরে গেছে। তুমি জলে পড়ে গিয়েছো।"

জানকী খানিকটা শান্ত হয়। সে অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, কচ্ছপটা যদি সত্যি সত্যি আমাকে কামড়ে দিত?"

"খুবই মুশকিল হত। তবে এ কচ্ছপটা ভাল ছিল, এবং আমার ধারণা, এ-ঘাটের কচ্ছপগুলো সবাই ভালো—তারা মানুষখেকো নয়। কাজেই তুমি এবার জলে নেমে আস্তে আস্তে ওপারে চলো।"

আমি তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চাই। কে কি ভাবছেন জানি না। তবে সবাই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি যে একটি জলে-ভেজা সোমত্ত-মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

"কিন্তু আবার যদি ওর পিঠের ওপর আমার পা পড়ে?" জানকী ছোট্ট মেয়ের মতো প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "তুমি আবার জলে পড়ে যাবে, আমি আবার এমনি তোমাকে জল থেকে তুলব। আমি তো তোমার পাশেই থাকব।"

আশ্বস্ত জানকী আমার কোল থেকে জলে নামে—যমুনার জলে। আমার একখানি হাত ধরে সে এগিয়ে চলে। ভয় হচ্ছে জানকী আবার মানসীর মতো সবার সামনেই গলা ছেড়ে গান ধরে না বসে, —আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।*

*লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' দ্রষ্টব্য।

॥ চৌদ্দ ॥

যমুনার তীর থেকে দক্ষিণ-পুবে মাইল দু'য়েক এসে ভদ্রবন। কৃষ্ণ-বলরামের বিবিধ ক্রীড়া ও গোচারণভূমি। দ্বাদশ বনের অন্যতম হলেও দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা খুবই সামান্য। উল্লেখযোগ্য দর্শন মাত্র দু'টি—অশ্বত্থ-বট ও সঙ্গমকুণ্ড।

পাণ্ডারা বললেন যে, ঐ জোড়া অশ্বত্থ-বট নাকি দ্বাপরযুগের বৃক্ষ। বক্তব্যটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু গাছ দু'টি সত্যিই পুরনো।

তারপরে আমরা দর্শন করেছি সঙ্গমকুণ্ড। মাঝারি আকারের একটি রমণীয় সরোবর।

ভদ্রবন দর্শন করে এখন আমরা এগিয়ে চলেছি ভাণ্ডীরবনের দিকে। চলেছি দক্ষিণদিকে। ভদ্রবন থেকে ভাণ্ডীরবন ২ মাইল।

ভাণ্ডীরবনে রাম-কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক্রীড়া করতেন। এই সংবাদ শুনে শ্রীরাধিকা একবার সুবলের বেশে সেখানে এসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে কে জয়লাভ করেছিলেন, কেউ বলেন নি আমাকে। তবে অনুমান করতে পারি কৃষ্ণ মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারেন নি।

ভাণ্ডীরবনেই বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন। কিন্তু পথ চলতে চলতে মথুরা মহারাজ এখন সে কাহিনী বলছেন না। আমরা মথুরা মহারাজের গল্প শোনার জন্য কীর্তন না করে তাঁর সঙ্গে সবার পেছনে পথ চলেছি।

মথুরা মহারাজ বলছেন অন্যকথা। তিনি বলছেন, "ভাণ্ডীরবনের ছয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আরাগ্রাম নামে একটি জায়গা আছে। একবার রাম-কৃষ্ণ যখন সেখানে গোচারণ করছেন, তখন সহসা ভীষণ দাবানল জ্বলে উঠল। স্বভাবতই সখারা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু

সখাসহায় শ্রীহরি তাঁদের উতলা হতে নিষেধ করলেন। বললেন—তোমরা চোখ বুজে থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত কেউ চোখ খুলবে না।

"মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই ভক্তবৎসল কৃষ্ণ-ভগবান তাদের চোখ মেলতে বললেন। সখারা সবিস্ময়ে দেখলেন কোথাও কোন আগুনের চিহ্নমাত্র নেই। এবং তাঁরা সকলেই গোধনসহ ভাণ্ডীরবটের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাণ্ডীরবন তাই যোগীদের পরমপ্রিয় স্থান। আমরা এখন সেখানেই চলেছি। এই বন দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। তাঁর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

আর কিছুক্ষণ পরেই তো আমরা সেই পরম-পবিত্র স্থানটি দর্শন করছি। সুতরাং নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—আমি এবং আমার সহযাত্রীরা কেউ আর মৃত্যুর পরে এ পৃথিবীতে ফিরে আসছি না। আমরা স্বর্গ কিংবা নরকে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকব।

সংবাদটি পেয়ে নিশ্চয়ই আমাদের উত্তরপুরুষগণ খুশি হবে। কারণ পণ্ডিতদের মতে, জনসংখ্যাই নাকি আগামী-পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাঁরা বলছেন, আগামী পঁয়ত্রিশ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। অনুমান করছেন যে, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দেই ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৯৫ কোটি ৬০ লক্ষ।

সুতরাং আমি এবং আমার সহযাত্রীরা আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করব না শুনে আমাদের উত্তরপুরুষরা অবশ্যই পুলকিত হবে। পুলকিত আমরাও, কারণ আমাদেরও আর জীবন-যন্ত্রণা সইতে হবে না।

কিন্তু যাঁরা বাসে চড়ে নন্দঘাট থেকে মাটবনে চলে গিয়েছেন? তাঁরা তো ভাণ্ডীরবন দর্শন করতে পারবেন না। তাহলে কি তাঁদের আবার জন্ম নিতে হবে? আর তাঁদের মধ্যে যে বৌদিও একজন। বেচারী ছেলে-মেয়েদের ওপর সংসার ফেলে স্বামীর সঙ্গে তীর্থে এসেছেন। বৌদি ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্ভাগ্যে দুঃখিত না হয়ে পারছি

না। কিন্তু সমবেদনা জানানো ছাড়া আমরা তাঁদের জন্ম আর কিছু করতে পারি কি ?

পারি বৈকি। আমরা তাঁদের কাছে ভাণ্ডীরবনের রূপ বর্ণনা করতে পারি। তাহলে তাঁদের অন্তত অর্ধেক পুণ্য সঞ্চয় হবে। এবং সেই পুণ্যের জোরে তাঁরা পুনর্জন্মের অর্ধেক ঝামেলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবেন। কারণ শ্রবণে অর্ধেক দর্শন।

এবং সে সূত্রে নিশ্চয়ই আমার পাঠক-পাঠিকারাও পুনর্জন্মের আধখানি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। কারণ শ্রবণে অর্ধেক পুণ্য অর্জিত হলে পঠনেও অর্ধেক পুণ্য লাভ হতে বাধ্য। আমি সত্যই সৌভাগ্যবান। এত মানুষের আংশিক মুক্তির সহায়ক হয়ে রইলাম।

ভাণ্ডীরবনে পৌঁছে শোভাযাত্রার গতি মন্থর হল। বড় রাস্তা থেকে বালিময় গরুর গাড়ির পথে নেমে এলাম। পথের দু'দিকেই বাড়ি-ঘর। মাঝে মাঝে দু-একটি বেশ ভাল পাকাবাড়ি।

তবে গ্রামটি মোটেই বড় নয়, বরং ছোটই বলা যেতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকালয় শেষ হয়ে গেল। পথের দু'পাশে শুরু হল ক্ষেত। অধিকাংশই আখের ক্ষেত। আর মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাবন। অদৃষ্ট ভাল। পথের ওপরে কাঁটা প্রায় নেই বললেই চলে। থাকলেও অবশ্য খুব একটা ক্ষতি হত না। কাঁটা ফুটে ফুটে আমাদের চরণযুগল এমন কণ্টকিত হয়ে রয়েছে যে, দু-চারটি নতুন কাঁটা ফুটলে আর তেমন কোন কষ্ট হবে না।

কেবল কাঁটাগাছ নয়, পথের পাশে মাঝে মাঝে ঝাউগাছ রয়েছে। রয়েছে কেলিকদম্ব আর কুলগাছ। ব্যস, কয়েকজন উৎসাহী সহযাত্রী মহারাজদের অনুমতি না নিয়েই কুল পাড়তে শুরু করে দিল। চক্রবর্তী তাদের 'লীড্' করছে আর জানকী তাকে 'এসিস্ট' করছে। সুতরাং কুল না পেড়েও কুলের ভাগ পেলাম। অর্থাৎ একুল-ওকুল দু'কূলই বজায় রইল। মহারাজদের গালাগাল খেতে হল না, কিন্তু কুল খেতে পাওয়া গেল।

বড় রাস্তা থেকে মিনিট দশেক হেঁটে ভাণ্ডীর-কূপের সামনে এলাম। মাঝারী আকারের একটি কুয়ো। কথিত আছে—সখাদের তেষ্টা পেয়েছে শুনে সখানাথ এখানে দাঁড়িয়ে বেণুগীতি করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাতাল থেকে সুশীতল বারিধারা উঠে সখাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। সেই পুণ্যধারাই এই ভাণ্ডীর-কূপ আর তাই এর অপর নাম বেণু-কূপ।

কুয়োর বাঁদিকে একটি শিবমন্দির—লিঙ্গমূর্তি। পাশেই মুকুট ভগবানের ছোট মন্দির। মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই, রয়েছে ভগবানের মুকুট। আমরা প্রণাম করি।

মুকুট মন্দিরের উল্টোদিকে দাউজী মন্দির। আমরা সেখানে আসি। ভেতরে মূল-বিগ্রহ রেবতী ও বলরাম। নিচে রাধা-কৃষ্ণের ছোট মূর্তি।

দাউজী মন্দিরের পাশেই ভাণ্ডীরবট। ব্রজমণ্ডলের চারটি শ্রেষ্ঠ বটবৃক্ষের অন্যতম এটি। অন্য তিনটি হল—অদ্বৈতবট, শৃঙ্গারবট ও ও বংশীবট। দানাবল থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণ সখাদের এই ভাণ্ডীর-বটের নিচে নিয়ে এসেছিলেন। এটি ভাণ্ডীরবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন।

গাছটি বেশ পুরনো। গোড়ায় একখানি শ্বেত-পাথর বাঁধানো। পাণ্ডা বলেন, "রাধা-কৃষ্ণের বিবাহস্থলী।"

ভক্তদল দণ্ডবৎ করলেন।

ভাণ্ডীর-কূপের অনতিদূরে ভাণ্ডীরকুণ্ড। অনেকে একে অভিরামকুণ্ড বলেন। কুণ্ডের তীরে শ্রীদামের মন্দির। শ্রীদামের এমন মনোহর মূর্তি আর কোথাও দেখি নি।

শ্রীদামজীকে দর্শন করে আমরা ভাণ্ডীরবিহারীর মন্দিরে আসি। এটি ভাণ্ডীরবনের বৃহত্তম মন্দির—বাঙালী মন্দির। জনৈক সতীশ চন্দ্র তৈরি করে দিয়েছেন। তবে সেবাইত বাঙালী নয়, ব্রজবাসী।

ঝুলন্ত সিংহাসনে রাধা-কৃষ্ণের বেশ বড় বিগ্রহ। নিচে অষ্টসখী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দোলা দিচ্ছেন কি ? হয়তো তাই।

পাণ্ডাজীও তাই বলেন, "সিংহাসন নয়, সন্দোলিকা। আপনারা যাকে বলেন ঝুলন। শ্রীকৃষ্ণ যে এই ভাণ্ডীরবনেই ঝুলন-লীলা করেছিলেন।"

ভাণ্ডীরবন দর্শন শেষে আমরা এখন মাটবনের দিকে এগিয়ে চলেছি। মাত্র মাইল দু'য়েক পথ। মাট বেশ বড় জায়গা। মথুরা জেলার একটি তহশিল-সদর।

কিন্তু না, মাটের কথা নয়—আমি ভাবছি ভাণ্ডীরবনের কথা। ভাবছি—শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রার কথা। ছোটবেলায় পূর্ববঙ্গের সেই মফঃস্বল শহরে ঝুলন আমাদের বড়ই প্রিয় উৎসব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সেই অপরূপ লীলার কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলেছি আমি—

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের পরে স্নিগ্ধ বর্ষার সমাগম হয়েছে। আষাঢ় শেষে শ্রাবণ এসেছে। মধু-বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কদম্বের সুগন্ধ। পুষ্পবন সৌরভে বিভোর। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। মাঝে মাঝেই মেঘদল বর্ষণমুখর হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে শুরু হচ্ছে বাতাসের মাতামাতি। সুতরাং কোন কুঞ্জই এখন আর সমাগম-যোগ্য নয়। কেবল বংশীবট পত্রের ছত্রধারণ করে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে দিনরাত সখা-সখীদের মিলনমেলা।

সেদিন ছিল শ্রাবণী-পূর্ণিমার পুণ্যতিথি। সন্ধ্যাবেলায় সখীরা বটের ঝুবিতে ফুল সাজিয়ে অপূর্ব এক হিন্দোল রচনা করলেন। কিছুক্ষণ পরেই গোপীনাথ এলেন সেখানে। সখীরা রাধা-কৃষ্ণকে সেই দোলায় বসিয়ে দোল দিতে থাকলেন। তাঁরা সমবেত স্বরে গান ধরলেন—

'কানন-ওর হেরইতে ভোর কিশোরী কিশোর
প্রেমরসে ভাসিয়া।
ঝুলন কেলি দুহুঁজন মেলি অঙ্গ অঙ্গ হেলি
হৃদয় উল্লাসিয়া॥

কতয়ে সুতান করতহি গান রাখত মান
যন্ত্র সুরঙ্গিয়া।
দেই করতল অতি সুরসাল কহে ভালি ভাল
বাওয়ে মৃদঙ্গিয়া॥'*

মাট জায়গাটি বেশ বড়। স্টেট ব্যাঙ্ক, ইন্‌স্‌পেক্‌শান বাংলো, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসালয়, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, পোস্ট-অফিস, থানা, স্কুল-কলেজ অর্থাৎ শহরের প্রায় সব উপকরণই এখানে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

আমরা এইমাত্র মাট শহরে প্রবেশ করলাম। আগেই বলেছি মাট মথুরা জেলার একটি তহশিল-সদর। কিন্তু মজা হচ্ছে মাট নামে কোন জায়গা নেই। রয়েছে মাট-মুলা-বংগার, মাট-মুলা-খদার, মাট-রাজা-বংগার ও মাট-রাজা-খদার।

সব কয়েকটি পল্লী নিয়েই এই শহর। জনসংখ্যা চার হাজারের মতো। ২৭° ৩৬′ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭°৪৩′ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর। এখান থেকে মথুরা ১২ মাইল। বারো মাইল দূরের এই জনপদটিতে আসতে চোদ্দদিন লাগল আমাদের। আমরা যে বন-পরিক্রমা করছি, শতাধিক মাইল ঘুরে এখানে এসেছি।

যমুনার পশ্চিমতীরের পাঁচটি বন এবং বহু তীর্থ ও স্থল দর্শন করে আমরা আজ এখানে এলাম। আমরা মথুরা দর্শনের আগেই বৃন্দাবন দর্শন করেছি।*

বৃন্দাবন থেকে মাট সোজা পথে ৪ মাইল। মানসী মাত্র চার মাইল দূরে রয়েছে। কত কাছে, অথচ কত দূরে!

* শ্রীউদ্ধব দাস।

*'ব্রজপর্ব' ও 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য।

আমরা একটি মাটির কেল্লার পাশ দিয়ে পথ চলেছি। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছে এই কেল্লাটি। কেবল মাটি দিয়ে তৈরি, ইট বা পাথর ব্যবহার করা হয় নি। এমন কেল্লা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। এখন অবশ্য কেল্লাটির অনেকাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তাহলেও সর্বাঙ্গে অতীতের স্মৃতি নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে।

অনেকে বলেন এই মাটির কেল্লার জন্যই জায়গাটার নাম হয়েছে মাট। কিন্তু কৃষ্ণভক্তরা সেকথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, শিশু-কৃষ্ণ একবার দুষ্টুমি করে এখানে একটি দুধ বোঝাই মাট বা মটকি উবুর করে ফেলেছিলেন। ভগবানের সেই মাট-লীলার জন্যই জায়গাটার নাম হয়েছে মাটবন।

স্থানীয় স্কুলে আমরা আজ রাত কাটাবো। স্কুলবাড়ির সামনে আসতেই দেখা হল ওদের সঙ্গে—বৌদির সঙ্গে সেনবাবুর, বণিকপ্রভুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর, মায়ের সঙ্গে জানকীর।

গোবর্ধন মহারাজ ঠিকই বলেছিলেন, বাস আমাদের আগেই পৌঁছে গেছে এখানে। অথচ ওঁরা প্রায় ষাট মাইল ঘুরে এখানে এসেছেন, আর আমরা মাত্র ছ মাইল পথ হেঁটেছি। অবশ্য দর্শনের জন্য বেশ খানিকটা দেরি হয়েছে আমাদের।

সেনবাবু বৌদিকে বলেন, "যেমন হাঁটতে রাজি হলে না, তেমনি ভদ্রবন ও ভাণ্ডারীবন দেখতেও পারলে না। শুধু তাই নয়," একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "তোমাকে আবার জন্ম নিতে হবে, কিন্তু আমাদের আর জীবন-যন্ত্রণা সইতে হচ্ছে না।"

"তা কেমন করে হবে?" বৌদি বিস্ময়ের ভান করেন, "তুমি না জন্মালে তো আমারও আর জন্ম হতে পারে না। আমি যে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সতী-সাধ্বী স্ত্রী। সুতরাং আমিও আর জন্মাচ্ছিনে এ পৃথিবীতে। তোমার পুণ্যেই আমার পুনর্জন্মের ঝামেলা মিটে গেল।"

অখণ্ডনীয় যুক্তি। আমরা সোচ্চার স্বরে বৌদির বুদ্ধির তারিফ করে উঠি।

গুরু মহারাজ বলেন, "মাটবনে একটি মাত্র দর্শন—দাউজী মন্দির। কাছেই, মাত্র মাইল আধেক দূরে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, চলো একেবারে দর্শন সেরে এসে বিশ্রাম করবে।"

একে তো প্রস্তাবটা যুক্তিসঙ্গত, তার ওপর গুরুদেবের আদেশ। সুতরাং কীর্তনীয়ারা আবার গলা চড়ালেন। ভক্তদের গায়েও যেন জোর ফিরে এলো। সবাই জোর কদমে এগিয়ে চললেন। বলাবাহুল্য যাঁরা নন্দঘাট থেকে বাসে চড়ে এসেছেন, এবারে তাঁরাও সঙ্গী হলেন। আজ সারাদিন পরে আবার 'ফুল টীম্'-য়ের পদ-পরিক্রমা শুরু হল।

কয়েক মিনিট পদচারণার পরেই আমরা দাউজী তথা বলরাম মন্দিরের সামনে এলাম। ছোট মন্দির। ভেতরে শ্বেত-পাথরের বলদেব মূর্তি। রেবতী নেই। হয়তো মাটবন কৃষ্ণ-বলরামের গোচারণ লীলাস্থল বলে।

না, আমার অনুমান সত্য নয়। কারণ রেবতী নেই, কিন্তু রাধিকা আছেন। একা নয়, রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে—বলদেব-মূর্তির ঠিক নিচে। আমরা প্রণাম করি। তারপরে গর্ভ-মন্দির থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসি। বেশ বড় বারান্দা—দেওয়ালে বহু ঠাকুর-দেবতার বড়-বড় ছবি।

বারান্দা থেকে নেমে আসি উঠোনে। বাঁধানো উঠোন। ঠিক মাঝখানে দু'টি নিমগাছ। পাশেই একটি কুয়ো। মন্দিরের জনৈক সেবক আমার তৃষ্ণার্ত সহযাত্রীদের জলদান করছেন।

ছোট হলেও মন্দিরটি বেশ সুন্দর। ভক্তি মহারাজ বলেন, "এটি বাঙালী মন্দির। সেবাইতরাও বাঙালী।"

"তাই বলুন," চক্রবর্তী বলে, "নইলে এমন ছিম-ছাম ও ফিট-ফাট!"

তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীকে চিমটি কাটি, আমাদের সঙ্গে বহু অবাঙালী যাত্রী রয়েছেন। তাঁরা অনেকেই বাংলা বোঝেন। কানে কানে বলি, "চুপ, কে আবার শুনে ফেলবে!"

"শুনুক গে," চক্রবর্তী আরও গলা চড়ায়। বলে, "সত্যি কথা বলব, তাতে আবার ভয় কি? এই যদি বাঙালী না হয়ে অন্য কোন জায়গার সেবাইত হত, দেখতে মন্দিরের কি হাল হয়েছে!"

কথাটা কোনমতেই সত্য নয়। তবু চক্রবর্তীকে সে-কথা বলতে যাওয়া বৃথা। এখন ওকে সংযত করাও সম্ভব নয়। অতএব এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাড়াতাড়ি চলে আসি মথুরা মহারাজের কাছে। তিনি নিমগাছের গোড়ায় বসে বিশ্রাম করছেন।

কিন্তু মথুরা মহারাজের কি বিশ্রাম করার উপায় আছে? সহযাত্রীরা ঘিরে ধরেছেন তাঁকে। বলছেন, "মহারাজ, আজ আমরা ভাণ্ডীরবন দর্শন করলাম। কিন্তু আপনি তো বলদেবের প্রলম্ব-বধের কাহিনী বললেন না। সেখানেই তো তিনি সেই লীলা করেছিলেন?

"হ্যাঁ।" মথুরা মহারাজ উত্তর দেন।

"তাহলে, বলুন না সেই কাহিনী!"

মথুরা মহারাজ শুরু করেন—

"প্রলম্ব-বধের কাহিনীটি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এর আগের দু'টি অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণের কালীয়-দমন ও দাবাগ্নিমোচনের কথা নিয়ে। আপনারা সে কাহিনী জানেন।"

আমরা মাথা নাড়ি

মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "তখন গ্রীষ্মকাল। কৃষ্ণ-বলরাম রাখালরূপে ব্রজের বনে বনে বিহার করছেন। আর তাঁদের মধুর স্পর্শে গ্রীষ্মকে বসন্তের মতো স্নিগ্ধ বলে মনে হচ্ছে। বৃন্দাবনের নির্ঝর তখনও নৃত্য-চঞ্চল, তার সরোবরও কুসুমিত। ঝিল্লির শব্দ,

বনের মর্মর আর পাখির কূজনে বৃন্দাবনের আকাশ উতলা, বাতাস ব্যাকুল।

"রাম-কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবনের বনে বনে নানা ধরনের খেলা করে দিন কাটান। কোনদিন নাচ-গান, কোনদিন বা কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। কোনদিন বাহুযুদ্ধের খেলা হয়। খেলা করতে করতে তাঁরা যমুনা-পুলিনে, কুণ্ড ও সরসীর তীরে, পাহাড়ে-পর্বতে, বনবীথি ও কুঞ্জবনে ভ্রমণ করেন।

"সুযোগ বুঝে প্রলম্ব নামে এক অসুর কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণের উদ্দেশ্যে রাখাল বেশে ব্রজে এলো।

"কৃষ্ণ কিন্তু দেখেই তাকে চিনতে পারলেন। তবু তিনি সখ্যভাবে তাকে খেলায় নিলেন। তিনি সখাদের বললেন—আজ একটা নতুন ধরনের খেলা হবে। সে খেলার নাম বাহ্যবাহক। অর্থাৎ বয়স ও বল অনুসারে আমরা দু'দলে বিভক্ত হব। এক দলের নেতা দাদা, আর এক দলের আমি। যারা জিতবে, তারা হবে বাহ্য আর যারা হারবে, তারা হবে বাহক। বাহ্য বাহকের কাঁধে চড়বে।

"খেলা শুরু হল। খেলতে খেলতে তাঁরা ভাণ্ডীরবনে উপস্থিত হলেন। আর তার পরেই কৃষ্ণের দল খেলায় হেরে গেল। ঠিক হল কৃষ্ণ বহন করবেন শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বহন করবেন বৃষভকে আর প্রলম্বাসুর বলদেবকে।

"প্রলম্ব ইচ্ছে করেই বলদেবকে কাঁধে নিল। সে খুব তাড়াতাড়ি ছুটতে শুরু করল যাতে শ্রীকৃষ্ণ দেখতে না পান। প্রলম্ব ভাণ্ডীর-বট ছাড়িয়ে চলল।

"কিন্তু বলরাম ছিলেন খুবই ভারী, ফলে অসুরের গতিবেগ ক্রমেই কমে আসতে থাকল। দৃশ্যটা কিন্তু হয়েছিল ভারী সুন্দর—অসুরের চেহারা কালো মেঘের মতো আর বলরাম রুপোলী চাঁদের মতো রূপবান। মনে হচ্ছিল একখানা কালো মেঘ যেন চন্দ্রকান্তকে নিয়ে চলেছে।

"বলরাম বেশ আনন্দেই ছিলেন। তিনি অশ্বারোহণের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল প্রলম্বের দিকে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন, যে বালকটি তাঁকে খেলার মাঠে ঘাড়ে তুলেছে, ইতিমধ্যে সে এক ভয়ানক অসুরে রূপান্তরিত। বিশাল তার বপু। চোখ দু'টি আগুনের মতো উজ্জ্বল, দাঁতগুলো ভীষণ এবং বড় বড় আর চুলগুলো চক্‌চক্‌ করছে।

"প্রথমে বলরাম একটু ভয় পেলেন। কিন্তু তারপরেই তাঁর আত্মবিশ্বাস ফিরে এলো। তিনি নির্ভয় হলেন। বলরাম বুঝতে পারলেন, রাখালের ছদ্মবেশে অসুর তাঁকে অপহরণ করতে এসেছিল এবং এখন সে তাঁকে নিয়ে চলেছে।

"প্রচণ্ড রাগ হল বলরামের। এতবড় দুঃসাহস অসুরটার! তাঁকে চুরি করে নিয়ে চলেছে! তবে রে—বলেই বলরাম প্রলম্বের মাথায় মুষ্ট্যাঘাত করলেন।..."

"মুষ্ট্যাঘাত কি মহারাজ?" মাঝখান থেকে মিসেস খাণ্ডা প্রশ্ন করে উঠলেন।

থামতে বাধ্য হলেন মথুরা মহারাজ। বিরক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "মুষ্ট্যাঘাত বুঝলেন না, মুষ্টির আঘাত। তার মানে ঘুষি।" মহারাজ হাত মুঠি করে দেখিয়ে দিলেন।

"ও, বুঝতে পেরেছি।" মিসেস খাণ্ডা ঘাড় নাড়েন।

"ইস! আপনার তো দ্যাখতে আছি অনেক বুদ্ধি!" দিদিমার পক্ষে বোধ হয় কিছুতেই আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। তিনি যোগ করেন "তা এতই যখন বুদ্ধি, তখন কাহিনী শ্যাষ হওয়ার আগে কথা কয়েন, ক্যান্? শ্যাষ হইলে জিগাইতে পারেন না?" একবার থামেন তিনি। তারপরে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক করে মথুরা মহারাজকে অনুরোধ করেন, "আপনে কয়েন মহারাজ!"

মিসেস খাণ্ডা দিদিমার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

মথুরা মহারাজ আবার বলতে শুরু করেন, "প্রবল ক্রোধের সঙ্গে বলরাম প্রলম্বের মাথায় সুদৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত করলেন। দেখে মনে হল দেবরাজ ইন্দ্র যেন বজ্র দিয়ে পর্বতকে আঘাত করছেন।

"আকস্মিক আঘাতে প্রলম্বের মাথাটি ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। সে চোখে অন্ধকার দেখতে থাকল। তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেল। পরমায়ু শেষ হয়ে এলো। ভয়ানক একটা শব্দ করে সে সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মনে হল যেন একটা পাহাড় ভেঙে পড়ল মাটিতে। প্রলম্ব আর উঠতে পারল না। সে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

"বলরাম নেমে এলেন অসুরের পিঠ থেকে। একটু বাদেই সখাদের নিয়ে কৃষ্ণ ছুটে এলেন সেখানে। তাঁরা প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন মহাবীর সঙ্কর্ষণকে। ব্রজের বনে বনে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।"

থামলেন মথুরা মহারাজ, কিন্তু আমরা কেউ কোন প্রশ্ন করার আগেই ভক্তি মহারাজ লাঠি-হাতে উঠে দাঁড়ালেন। কোনরকম প্রস্তাবনা না করেই বলতে শুরু করলেন, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হিন্দোল বা ঝুলনযাত্রা ভারতবর্ষের সর্বত্র মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই উৎসবটির উল্লেখ নেই। এই উৎসবটির সঙ্গে আমরা প্রথম পরিচিত হই হরিবংশে। বলা হয়েছে যে, বর্ষা সমাগমে রাম-কৃষ্ণ ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীরবটে সন্দোলিকা বা দোলায় চড়ে সখা-সখীদের সঙ্গে আনন্দক্রীড়া করতেন।

"সম্ভবত এই কাহিনীকে অবলম্বন করেই ঝুলন-উৎসবটির উৎপত্তি। অনেকে বলেন, এটি গন্ধর্বানুষ্ঠিত হিন্দোলযাত্রা। আবার অনেকের মতে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন নাকি প্রথম এই উৎসবটির প্রচলন করেন।"

ভক্তি মহারাজ আরও কতক্ষণ চালিয়ে যেতেন জানি না, কিন্তু গুরুমহারাজের ইসারায় থামতে হল তাঁকে। গুরুমহারাজ বললেন,

"সন্ধ্যে হয়ে এলো, এখানে আর দেরি করা উচিত হবে না। স্কুল-বাড়িতে ওরা মাত্র চার-পাঁচজন মানুষ রয়েছে, তারাও রান্না-বান্নায় ব্যস্ত। জিনিসপত্র সব চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মাটবনে ভয়ানক চোরের উৎপাত।"

"চোরের উৎপাত!" কয়েকজন সহযাত্রী একসঙ্গে আঁতকে ওঠেন।

"হ্যাঁ।" গুরুমহারাজ বলেন, "আগে আমরা যখন বন-পরিক্রমার সময় মাটবনে আসতাম, তখন ধুনি জ্বালিয়ে সারারাত পাহারা দিতে হত।"

একটু হেসে মথুরা মহারাজ বলেন, "বৃন্দাবনের বাসিন্দারা কি বলেন জানিস?"

"কি?" জানকীর সঙ্গে আমরাও সমবেত স্বরে প্রশ্ন করি।

মথুরা মহারাজ উত্তর দেন, "ধন্য মাটবন্‌কা চোর, বৃন্দাবন্‌কা ধ্যান্ লাগাতে য্যায়সে চন্দ্র আউর চকোর।"

॥ পনেরো ॥

না, আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে। তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। যার যা ছিল, তাই আছে। চোর আসে নি, কিন্তু মাট-বনের রাত ফুরিয়েছে।

অবশ্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সাবধানতার কিছু অভাব ঘটে নি। পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সেবক ও ব্রহ্মচারীরা লাঠি-হাতে পালা করে সারারাত পাহারা দিয়েছেন। সুতরাং নিশি-কুটুম্বরা এ-মুখো হয় নি।

আগে তো বটেই, এখনও বন-পরিক্রমার সময়ে যাত্রীদল মাঝে মাঝেই চোর-ডাকাতের খপ্পরে পড়েন। তাঁরা নিজেদের খরচে বন্দুকধারী পাহারাদার কিংবা পুলিশ সঙ্গে রাখেন। আমাদের আশ্রম থেকে এবারে সে ব্যবস্থা করা হয় নি। কারণ আমরা নির্জন স্থানে তাঁবুতে রাত্রিবাস করছি না। জনপদের ভেতরে ধর্মশালায় কিংবা স্কুলবাড়িতে রাত কাটাচ্ছি।

অবশ্য লোকালয়ের ভেতরে যে ডাকাত পড়তে পারে না, তা নয়। তবে এখন পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটে নি।

বোধকরি এর আরও একটি কারণ আছে। আজকাল শুনেছি চোর-ডাকাতদেরও 'ইন্‌টেলিজেন্স বিউরো' আছে। তারা নিশ্চয়ই আমাদের আর্থিক দুরবস্থার খবর পেয়ে গেছে। জানতে পেরেছে, আমাদের ওপর চড়াও হলে, পরিশ্রম পোষাবে না।

আর আমার এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বাকি পাঁচটি রাতও নির্বিঘ্নেই অতিবাহিত করতে পারব। আজ আমাদের বন-পরিক্রমার পঞ্চদশ দিবস।

কেন যেন আজ সকালে আর ঘণ্টার শব্দে ঘুম ভাঙে নি। যাঁদের সঙ্গে কাল রাতে একঘরে ঘুমিয়েছি, তাঁরাও ডাকাডাকি করেন নি।

অথচ নিজেরা তৈরি হয়ে অস্থায়ী মন্দিরে চলে গিয়েছেন। সেখানে মঙ্গলারতি শুরু হয়ে গেছে। কীর্তনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি কম্বলের ওপরে উঠে বসি। না, বণিকপ্রভু ছাড়া আর কেউ নেই এ ঘরে। তিনি চিরদিনই সবার শেষে শয্যাত্যাগ করেন। বাথরুমের ব্যাপারটায় তাঁর যে একটু বেশি সময় লাগে। মঙ্গলারতি, মন্দির-প্রদক্ষিণ ও প্রভাতী পাঠ-কীর্তনের 'ক্লাশ এ্যাটেণ্ড' করতে অসুবিধে হয় তাঁর। তাই গুরুমহারাজ তাঁকে 'এগ্‌জেম্‌ট' করে দিয়েছেন।

কিন্তু বণিকপ্রভুর কথা আলাদা। তিনি একে বৃদ্ধ, তার ওপরে গুরুমহারাজের প্রবীণ শিষ্য, তথা বৈষ্ণব—ভক্ত-বৈষ্ণব। তিনি 'এগ্‌জেম্‌শন' পেতেই পারেন। কিন্তু আমি? আমি বৃদ্ধ নই, শিষ্য নই, বৈষ্ণব নই, এমন কি ভক্ত পর্যন্ত নই। আমার তো এত বেলা অবধি সুখ-নিদ্রা সমীচীন নয়। সুতরাং গামছা ও দাঁতের মাজন নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

ঝড়ের বেগে ঘরে ঢোকেন জানকীর মা। পঞ্চাশোত্তীর্ণা বিধবা। ছেলেরা কলকাতায় ভাল চাকরি-বাকরি করেন। তিনি গুরুমহারাজের শিষ্যা। ছোট মেয়েকে নিয়ে বন-পরিক্রমায় এসেছেন।

কিন্তু তিনি আবার এত সকালে এ ঘরে কেন? গতকাল যমুনার জলে জানকীকে কোলে নেওয়ার জন্য নয় তো?

"তোমার কাছে কি ডেটল আছে বাবা?" জানকীর মা জিজ্ঞেস করেন।

নিশ্চিন্ত হই, কালকের কোন ব্যাপার নয়। শান্তস্বরে উত্তর দিই, "না। ডেটল নেই, তবে 'সিবাজল অয়েন্ট্‌মেন্ট্‌' আছে।"

"শিগ্‌গীর আমাকে একটু দাও বাবা!"

"কেন, কার কি হয়েছে?"

"কার আবার, জানকীর। পা কেটে ফেলেছে। অনেকটা কেটে

গেছে। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।" একবার থামেন তিনি। তারপরে বিরক্তকণ্ঠে বলেন, "আর এই মেয়েটাকে নিয়ে আমার হয়েছে মরণ। কিছুতেই কথা শুনবে না।"

সত্যি তাই। বাড়ির সকলের অমতেই জানকী বামুনের মেয়ে হয়েও সেই কায়স্থ যুবকটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু বড়লোকের বেকার ছেলে বাবার আদেশে আরেকজনকে বিয়ে করেছে। আর মেয়ের মনের জ্বালা নেবাতে মা তাকে নিয়ে বন-পরিক্রমায় এসেছেন।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমার কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তাই তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করি, "কেমন করে কাটল ?"

"আর বলো কেন, কুয়োর ওধারে জঙ্গলে গিয়েছিল বুনোফুল তুলতে, খোপায় গুঁজবে। কে যেন একটা ভাঙা কাচের বোতল ফেলে দিয়েছিল। দেখতে পায় নি, পা কেটে গিয়েছে।"

আর কথা না বাড়িয়ে ওষুধ ও তুলো বের করি। তারপরে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "কোথায় আছে সে ?"

"ঘরে নিয়ে এসেছি।"

"চলুন, আমিও যাচ্ছি।"

জানকীর ঘরে আসি। দেখি মেঝেতে পা রেখে কম্বলের ওপর বসে আছে সে। ঘরে আর কেউ নেই। সবাই বোধহয় মন্দিরে গিয়েছেন। কিন্তু জানকী মন্দিরে না গিয়ে খোপার ফুলের জন্য এত সকালে একা একা ফুলবনে গিয়েছিল কেন ?

মা ঠিকই বলেছেন। তার পা থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। মুখখানি দেখে মনে হল একটু যন্ত্রণাও হচ্ছে।

কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়েই মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে সে। বলে, "পা কেটে ফেলেছি শুনে বোধহয় ভদ্রতায় বাধল, আর না এসে পারলেন না ?"

"শোন, মুখরা মেয়ের কথা শোন", মা মেয়ের হয়ে জবাবদিহি

করেন, "তুমি কোথায় শোনামাত্র বাসিমুখে ওষুধ নিয়ে ছুটে এলে, আর দজ্জাল মেয়ের সম্ভাষণ শুনলে ?"

আমি কিছু বলে ওঠার আগেই জানকী জবাব দেয়, "উনি তো আর তোমাদের মত ভক্ত-বৈষ্ণব নন মা, ওঁর কাছে নিয়মের চেয়ে মানুষের মূল্য বেশি। মানুষের প্রয়োজনে উনি কৃষ্ণভজনা ফেলে বাসিমুখে বৃন্দাবন চলে যেতে পারেন।" জানকী আমার দিকে তাকায়।

বৃন্দাবন বলতে সে কি বোঝাতে চাইল ? মানসী বৃন্দাবনে থাকে বলেই কি সে বৃন্দাবন শব্দটা ব্যবহার করল ? কিন্তু মায়ের সামনে এখন তাকে সে প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। তাই তার কাছে এগিয়ে এসে অন্য কথা বলি, "দেখি কতটা কেটেছে ?" আমি তার পায়ের কাছে বসে পড়ি।

জানকী নিজের পায়ের দিকে তাকায়। আমি তার পায়ে হাত দিই। জানকী কোন প্রতিবাদ করে না।

পকেট থেকে তুলো বের করে জানকীর পা মুছিয়ে দিই। কি ভেবে সহসা সে হেসে ফেলে।

মা রেগে যান। তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "হাসছিস কেন ?"

হাসতে হাসতেই উত্তর দেয় জানকী, "একটা কথা ভেবে হাসি পেয়ে গেল যে !"

"কি কথা ?" মা প্রশ্ন করেন।

আমি নিঃশব্দে আমার কাজ করে চলি। জানকীর পায়ে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে থাকি।

জানকী মাকে পাল্টা-প্রশ্ন করে, "তুমি তো পুরীর মন্দিরে 'গীত-গোবিন্দ'-র গান শুনেছো মা ?"

"শুনেছি বৈকি, শুনি নি আবার ! কি চমৎকার গান ! যেমনি কথা, তেমনি সুর। সংস্কৃত বলে মনেই হয় না।"

ভক্তকবি জয়দেবের গীতিকাব্যের কথা উঠলে যে-কোন ভক্তেরই

হৃদয়-মন ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ওঠে। জানকীর মায়েরও তাই হয়েছে। তিনি মূল প্রসঙ্গটি ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু জানকী ভুলবার পাত্রী নয়। সে আমাকে দেখিয়ে বলে, "ওনাকে আমার পদসেবা করতে দেখে গীতগোবিন্দের সেই গানটি মনে পড়ে গেল।"

"কোন্ গান?" মা জিজ্ঞেস করেন।

মেয়ে সহসা সুর করে গেয়ে ওঠে—

'স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।'

আবার শুরু হয়েছে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা। আমরা এখন মাটবন থেকে বিল্ববনে চলেছি। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার শুরু হবে পদ-পরিক্রমা। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছব মান-সরোবর—মাটবন থেকে আট মাইল। সেখানেই রাত কাটাব আজ।

আগামীকাল সকালে লোহবন যাত্রা করে প্রথম যাব পানিগাঁও। পরশু সকালে রাধারাণীর জন্মস্থান রাবেল দর্শন করে পৌঁছব গোকুল-মহাবন—শিশুকৃষ্ণের পুণ্যলীলাভূমি। গোকুল-মহাবন দর্শন করে সহযাত্রীদের সঙ্গে মথুরায় ফিরে যেতে পারলেই আমাদের চুরাশি ক্রোশ বিস্তৃত ব্রজ-পরিক্রমা পূর্ণ হবে।

আজ সকাল থেকে নিজের শরীরটাও ভাল লাগছে না—বড্ড মাথা ধরেছে। আর পায়ের ব্যথার জন্য বোধহয় জানকীও ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছে। একসময় দেখলাম সবাই এগিয়ে গেছেন, শুধু আমরা দু'জন পড়ে রয়েছি পেছনে।

"তোমার পায়ে কি খুব ব্যথা হচ্ছে?" জানকীকে জিজ্ঞেস করি।

"হলেও তো বলবার উপায় নেই।"

"কেন ?"

"বারে, আপনি পায়ে হাত দিয়ে ডাক্তারী করলেন, আর আমি বলব পায়ে ব্যথা হচ্ছে ?"

ওর উত্তর শুনে হেসে ফেলি।

জানকী আবার বলে, "আর ব্যথা করলেই বা আপনি কি করতে পারেন ?"

"কি করতে হবে বল ?"

"যা বলব, তা করতে পারবেন ?" জানকী আমার দিকে তাকায়।

"চেষ্টা করে দেখতে পারি !" ওর চোখে চোখ রেখে উত্তর দিই।

জানকী জিজ্ঞেস করে, "পারবেন, এই আট মাইল পথ আমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে ?"

"প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই পারব।"

জানকী একটু হাসে। বলে, "তারপরে তিনি যখন শুনবেন, বন-বৃন্দাবনের নির্জন পথে আপনি আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গেছেন, তখন কি কৈফিয়ৎ দেবেন ?"

জানকী 'তিনি' বলতে মানসীকে বোঝাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বরে ঈর্ষা, চোখে বোধহয় বিদ্রূপের ছোঁয়া। কথাটা ভাল লাগে না আমার। তবু শান্তস্বরে বলি, "সে উচ্চশিক্ষিতা এবং উদার। কিছুই মনে করবে না। বুঝতে পারবে প্রয়োজন পড়েছিল বলেই আমি তোমাকে কাঁধে নিয়েছি।"

জানকী আর কোন কথা বলে না। সে নীরবে আমার পাশে পাশে পথ চলতে থাকে।

সহসা পেছন থেকে জানকী বলে, "একটু দাঁড়ান।"

আমি থমকে দাঁড়াই। পেছন ফিরি।

জানকী এগিয়ে আসে আমার কাছে। কিছু বুঝতে

পারার আগেই সে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে। আমাকে প্রণাম করে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। নীরবে তার দিকে তাকাই।

জানকী উঠে দাঁড়ায়। বলে, "চলুন।"

চলতে চলতে জিজ্ঞেস করি, "হঠাৎ প্রণাম করলে কেন?"

"প্রায়শ্চিত্ত করলাম।" জানকী পথ-চলা শুরু করে।

"পাপটা কখন করলে?"

"আজ সকালে।"

"কি ভাবে?"

সহসা জানকী যেন গম্ভীর হয়ে যায়। সে ভারী স্বরে বলতে থাকে, "বিদ্যে-বুদ্ধি ও বয়সে আপনি আমার চেয়ে অনেক বড়। তবু তখন আপনাকে আমার পায়ে হাত দিতে দেখেও চুপ করে থাকতে হল। জানতাম, বাধা দিলে আপনি শুনবেন না। কিন্তু পাপ যেটুকু হয়েছে, তা তো সবটাই আমার। তাই সুযোগ পেয়ে একটি প্রণাম করে, সেই পাপের বোঝাকে খানিকটা হালকা করে রাখলাম।"

বৃন্দাবনের বিপরীত দিকে যমুনার পূর্বতীরে বিল্ববন।

দূরত্ব মাত্র সওয়া দু'মাইল। বৃন্দাবন থেকেই শুরু হয়েছে আমাদের পরিক্রমা। কিন্তু আমরা বহুদূরে চলে গিয়েছিলাম। আজ আবার বৃন্দাবনের কাছে এসেছি। বিল্ববন থেকে পানিগাঁও পর্যন্ত আমরা এমনি বৃন্দাবনের কাছাকাছি থাকব, কিন্তু বৃন্দাবনে যাব না। আমরা যে বন-বৃন্দাবন পরিক্রমা করছি, মন-বৃন্দাবনে যাবার উপায় নেই এখন। সুতরাং যত কাছেই থাকুক, মানসীর সঙ্গে আমার দূরত্ব ঘুচবে না।

বিল্ববনও শ্রীকৃষ্ণের একটি গোচারণভূমি। কথিত আছে,

বিল্ববনের কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করে বনের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমা দর্শন করলে, সর্বপাপ মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে যাওয়া যায়। আমাদের অবশ্য সে প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বেই আমরা যে পুণ্যসঞ্চয় করে ফেলেছি, তাতে আমাদের বিষ্ণুলোকে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। তাহলেও আমরা আজ বিল্ববনে পৌঁছে লক্ষ্মীদেবীকে অবশ্যই দর্শন করব। তবে কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করব না।

বিল্ববনের আরেক নাম শ্রীবন। বিল্ব মানে শ্রীফল, লক্ষ্মীর ফল। শ্রী মানে লক্ষ্মী। শুনেছি লক্ষ্মীর নাম থেকেই ঐ বনের নাম হয়েছে। কারণ, কৃষ্ণকে পাবার জন্য তিনি নাকি ওখানে বসে তপস্যা করেছিলেন—সুকঠিন তপস্যা।

তপস্যাশেষে বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করলেন। রাধারমণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—বল, কি তোমার প্রার্থনা?

কমলা বললেন—আমি হেমন্তের প্রভাতে যমুনার কূলে তোমার বস্ত্রহরণ লীলা দেখেছি। জ্যোৎস্নালোকিত শরতের যামিনীতে পুষ্প-রেণুগন্ধময় যমুনার উপবনে সৈকতলীলা, জললীলা ও কুঞ্জলীলার ভেতর দিয়ে রাধার সঙ্গে তোমার রাসলীলা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই আমি স্বর্গ থেকে ছুটে এসেছি এই মধু-বৃন্দাবনে, তোমার তপস্যা করেছি। আমি তোমার সঙ্গলাভ করতে চাই।

—তোমাকে সঙ্গদান করতে আপত্তি নেই আমার। তবে তার আগে তোমাকে একটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

—বেশ, বল কি তোমার শর্ত?

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—তুমি তো জানো, আমি গোপীনাথ, আমি ভক্তবৎসল। গোপীরা আমার ভক্ত। তাই তাদের সেবা না করে কেউ আমাকে পায় না। আমার সঙ্গলাভ করতে হলে প্রথমেই তোমাকে ব্রজগোপিনীদের পদসেবা করতে হবে।

ক্ষিপ্তকণ্ঠে লক্ষ্মী প্রশ্ন করলেন—কিন্তু আমি যে ইন্দিরা, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুবল্লভা, লোকমাতা! আমি স্বর্গের অধীশ্বরী ও পরম

ঐশ্বর্যশালিনী। আমি কেমন করে ঐশ্বর্যহীন মর্ত্যের মানবীদের পদ-সেবা করব?

মৃদু হেসে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন—ব্রজগোপিনীরা মোটেই ঐশ্বর্যহীনা নয়, তারা ভক্তিধনে ধনী। কিন্তু সে ধনের যখন কোন মূল্য নেই তোমার কাছে, তখন আমার পক্ষে তোমাকে সঙ্গদান করা সম্ভব নয়।

মথুরা মহারাজ বলেছেন, সেদিন নাকি লক্ষ্মীদেবীর আকুল কান্নায় বিল্ববনের আকাশ-বাতাস উতলা হয়ে উঠেছিল।

আর আজ আমাদের আনন্দ-সংকীর্তনে বিল্ববন মুখরিত হয়ে উঠল। সংকীর্তন-শোভাযাত্রা বিল্ববনে পৌঁছে গিয়েছে।

কেষ্টপ্রভু গেয়ে চলেছেন--

'তবে খেলাতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা।
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা॥
শ্রীবন দেখি পুন গেলা লৌহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন।'

কেষ্টপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে মহাপ্রভুর বন-পরিক্রমার কাহিনী কীর্তন করছেন। আগেই বলেছি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁর মর্ত্যলীলার মধ্যভাগে নীলাচল থেকে মধু-বৃন্দাবনে এসেছিলেন। সেটি সম্ভবত ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁর সেই পরিক্রমা থেকেই বন-পরিক্রমার আরম্ভ। শ্রীচৈতন্য খেলনবন থেকে ভদ্রবন ও ভাণ্ডীরবন দর্শন করে শ্রীবনে এসেছিলেন। সেখান থেকে লৌহবন হয়ে গোকুল-মহাবনে। গোকুল থেকে তিনি ফিরে গিয়েছিলেন মথুরা।

আমরাও এখন শ্রীবনে এসেছি। এখান থেকে লৌহবন ও গোকুল-মহাবন হয়ে আমরাও ফিরে যাব মথুরা—পূর্ণ করব আমাদের এই মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা। সুতরাং আমরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সেই পুণ্য-পরিক্রমার কাহিনী কীর্তন করতে করতে পথ চলেছি।

চারিদিকে দেওয়াল-ঘেরা রমণীয় একটি কানন—বিল্ববন। শান্ত ও সুন্দর পরিবেশ। তোরণ ছাড়িয়েই দূর্বা-ছাওয়া একফালি ছায়াশীতল অঙ্গন। একপ্রান্তে মাঝারী আকারের মন্দির।

আমরা মন্দিরে এলাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দা। তারপরে গর্ভ-মন্দির। ভেতরে কালো পাথরের দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীমূর্তি। পাশেই একটি কৃষ্ণকায় গোপাল-বিগ্রহ। দেওয়ালে একখানি রাধাকৃষ্ণের ছবি। আমরা দণ্ডবত করি।

প্রণামের পরে বাইরে বেরিয়ে আসি। দেখি মূল-মন্দিরের পাশে আরেকটি ছোট মন্দির। কোন মূর্তি নেই। কেবল মন্দিরের মেঝেতে একজোড়া পায়ের ছাপ—লক্ষ্মীদেবীর চরণচিহ্ন। সহযাত্রী মহিলারা সেখানে সিঁদুর ছোঁয়াতে শুরু করলেন। তাঁরা এজন্য সিঁদুরের প্যাকেট সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

বিধবা বলেই হয়তো, জানকীর মা থলে থেকে সিঁদুরের প্যাকেটটি বের করে জানকীর হাতে দিলেন। জানকী যথারীতি সেটি মা-লক্ষ্মীর পায়ে ছুঁইয়ে নিজের হাতব্যাগে রেখে দিল।

দর্শন শেষে মন্দিরের পেছন দিকে আসি। যমুনাকে দেখা যাচ্ছে—জলহীন যমুনা। তার বুক জুড়ে শুধুই বালির বিস্তার।

সকলের দর্শন শেষ হলে আমরা তোরণ পেরিয়ে বাইরে আসি। এখানটাও ছায়া শীতল। আর সামনেই একটি কুয়ো রয়েছে।

কুয়োর পাড়ে ভিড় জমে উঠেছে। মন্দিরের জনৈক সেবাইত তৃষ্ণার্ত সহযাত্রীদের জলদান করছেন। আমিও তাঁর শরণাপন্ন হই। প্রাণভরে ঠাণ্ডাজল খেয়ে ওয়াটার বট্‌ল ভরে নিই। কয়েক পা হাঁটার পরেই তো সহযাত্রীদের জলদান শুরু করতে হবে।

ফিরে আসি গাছের ছায়ায়। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। সবাই যখন বিশ্রাম করছে, তখন একটু জিরিয়ে নেওয়াই ভাল।

চেয়ে চেয়ে বিল্ববনকে দেখি। চারিদিকেই গাছ-পালা। জানা-অজানা নানা নামের গাছ—তেঁতুল বট অশ্বত্থ কুল নিম তুলসী তমাল

কেলিকদম্ব, আরও কত রকমের গাছ। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও বেলগাছ দেখতে পাচ্ছি না! হয়তো বিল্ববন নাম বলেই বেলগাছ নেই। যেমন তালবনে নেই কোন তালগাছ।* তবে এখানে লক্ষ্মীর ওপর রাগ করে কৃষ্ণ তাঁর গায়ে বেলগাছ ছুঁড়ে মেরেছেন, এমন কোন ঘটনা জানা নেই আমার।

সহযাত্রীরা যথারীতি মথুরা মহারাজকে ঘেরাও করেছেন। সেই একই দাবী—বিল্ববনের কাহিনী বলতে হবে।

সন্ন্যাসী হলেও মথুরা মহারাজ গণতান্ত্রিক যুগের মানুষ। তাঁকে শুরু করতে হয়—

"নারায়ণের সাতগুণ আর কৃষ্ণের একাদশ গুণ। নারায়ণের ষাট রস কিন্তু কৃষ্ণের চৌষট্টি রস।..."

জনৈক অপরিচিত প্রবীণ এগিয়ে আসেন এদিকে। তিনিও বোধহয় দর্শনার্থী। ভদ্রলোক স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। পরনে ধুতি, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে ক্যানভাসের জুতো। কাঁধে ঝুলছে একটি কাপড়ের থলি। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাঁড়ি। কপালে নাকে কানে ও হাতে-পায়ে তিলক-সেবা করেছেন। তাঁর গলায় তুলসীর মালা ও হাতে জপের মালা। দেখে মনে হচ্ছে তিনিও একজন ভক্ত-বৈষ্ণব।

তিনি এগিয়ে এসেই বাধা দিলেন মথুরা মহারাজকে। বলে উঠলেন, "আপনারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব। আপনারা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিশ্বাসী, কিন্তু ভাগবতের কোথাও এ-সব কথা লেখা আছে কি?"

বিস্মিত মথুরা মহারাজ কোন উত্তর দিতে পারার আগেই ভদ্রলোক আবার বলেন, "আমি গৌড়ীয় না হলেও বৈষ্ণব। আমি বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত। আমার কাছে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক। কৃষ্ণের কাছে লক্ষ্মীর পরাজয়ের যে কল্পিত কাহিনী আপনারা প্রচার করে থাকেন, তা নিতান্তই নিম্নমানের।"

---

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য।

"আপনাদের উচ্চমানের গল্পটা একবার শুনতে পারি কি?" মথুরা মহারাজ রীতিমত চটে গিয়েছেন।

"নিশ্চয়ই।" ভদ্রলোক বলেন।

"বলুন তাহলে।"

ভদ্রলোক বলতে থাকেন, "লক্ষ্মীদেবীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিলেন এখানে। বললেন—বল, তুমি কি চাও?

"লক্ষ্মীদেবী উত্তর দিলেন—আমি তোমার সঙ্গলাভ করতে চাই।

"কৃষ্ণ তখন লক্ষ্মীদেবীকে বললেন—আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কেউ আমার শৃঙ্গার না করে দিলে তো আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারব না।

"—বেশ তো, আমি তোমায় সাজিয়ে দিচ্ছি।

"কৃষ্ণ মাথা নেড়ে বললেন—না, তোমার একার পক্ষে আমাব শৃঙ্গার রচনা করা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং তুমি বৃন্দাবন থেকে গোপিনীদের ডেকে নিয়ে এসো, তারা এসে আমাকে সাজিয়ে দিক।

"লক্ষ্মীদেবী গোপিনীদের দ্বারস্থ হবেন কেন? তিনি তখন মায়াবলে ষোল হাজার একশ' আটজন লক্ষ্মী সৃষ্টি করলেন। তারা গোপিনীদের মতো করেই সাজিয়ে দিলেন কৃষ্ণকে। তারপরে এখানে, এই পরমপবিত্র ক্ষেত্রে, শ্রী ও কৃষ্ণের মিলন হল। কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ হলেন।"

থামলেন ভদ্রলোক। মথুরা মহারাজ কোনরকম মন্তব্য না করে আমাদের নির্দেশ দিলেন, "চলুন, এবারে রওনা হওয়া যাক্।" আর বলেই তিনি চলতে শুরু করলেন। ভদ্রলোক একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপরে মৃদু হেসে এগিয়ে চললেন শ্রীমন্দিরের উদ্দেশ্যে।

শুধু মথুরা মহারাজ নন, আমার সহযাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই চটে

গিয়েছেন ঐ ভদ্রলোকের ওপর। তবে ভাগ্য ভাল, মুখে কেউ কিছু বলেন নি তাঁকে।

আমার কিন্তু মোটেই রাগ হচ্ছে না ভদ্রলোকের ওপর। বরং তাঁর কথাগুলো শুনতে ভালই লেগেছে। এই সঙ্গে আর একটা জিনিসও জানতে পারা গেল—ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ একই কাহিনীকে কেমন ভিন্ন রূপ দান করে থাকেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ রাধাভক্ত আর বল্লভীরা লক্ষ্মীর পূজারী।

আমরা বিল্ববন থেকে মান-সরোবরে চলেছি। বন-জঙ্গল ও ক্ষেত-খামারের ভেতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। কীর্তন করতে করতে পথ চলেছি আমরা।

না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন কলি নয়, শুধু নাম-কীর্তন হচ্ছে এখন—

'রাধে-গোবিন্দ, রাধে-গোবিন্দ···গোবিন্দ-রাধে···'

মথুরা মহারাজ সাধারণত কীর্তনে অংশ নেন না। তবে গল্প না বললে তিনি নীরবে পথ চলেন। বোধহয় তখন মনে মনে কীর্তন করেন।

কিন্তু এখন কীর্তনের দিকে কোন লক্ষ্যই নেই তাঁর। বল্লভী ভদ্রলোকের ওপর রাগ তাঁর মোটেই পড়ে নি। তিনি গম্ভীর হয়ে রয়েছেন।

সহসা আমার কাঁধ থেকে জলের বোতলটা তুলে নিলেন মথুরা মহারাজ। পিপাসা পেয়েছে বোধহয়, জল খাবেন।

না, জল খাবার জন্য জলের বোতল নেন নি মহারাজ। তিনি মুখ ধুচ্ছেন। বেশ কয়েকবার কুলকুচো করে জলের বোতলটা ফিরিয়ে দিলেন আমাকে। নীরবে আবার পথ-চলা শুরু করলেন। আমরা নিঃশব্দে অনুসরণ করি তাঁকে।

জানকী কিন্তু আমাদের মতো কৌতূহল দমন করতে পারে না। সে মথুরা মহারাজকে প্রশ্ন করে বসে, "হঠাৎ মুখ ধুলেন যে?"

"ধোব না! ঐ অর্বাচীনটার সঙ্গে কথা বলেছি যে। মুখটা অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল।"

মহারাজের বক্তব্যে বিস্মিত হই। এতদিন ধারণা ছিল তিনি একজন 'লিবার‍্যাল্‌' সন্ন্যাসী। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, ক্ষেত্র বিশেষে তিনিও তাঁর গুরুভাইদের মতই 'কনসারভেটিভ'।

নীরবে পথ চলতে থাকি। একটু বাদে মহারাজই সে নীরবতার অবসান করেন। তিনি জানকীকে বলেন, "কৃষ্ণের লীলা অদ্ভুত। অতুল মধুর ও অপরূপ তাঁর প্রেম। তাই তিনি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক হয়েও শ্রীরাধিকার চরণ ধরে তাঁর মান-ভঞ্জন করেছেন।"

জানকী চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকায়, কিন্তু চোখা-চোখি হতেই চোখ নামিয়ে নেয়। নীরবে পথ চলতে থাকে।

হঠাৎ জানকী অমন করে আমার দিকে তাকালো কেন? তার কি সকাল বেলার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল? কিন্তু আমি তো মান-ভঞ্জনের প্রয়োজনে তাঁর পদসেবা করি নি। আমি পদ-পরিক্রমার প্রয়োজনেই তার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি। আর দিয়েছি বলেই এখন হাঁটতে পারছে সে।

মথুরা মহারাজ বলে চলেছেন, "রূপমাধুরী বেণুমাধুরী প্রেমমাধুরী ও রসমাধুরীতে যিনি পরমশ্রেষ্ঠ, তিনিই কৃষ্ণ। সুতরাং গোপিনীদের কৃপা ছাড়া কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীও কোনদিন কৃষ্ণকে পান নি।"

কীর্তনীয়ারা অনেক পেছনে পড়ে গেছেন। সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। ক্রুদ্ধ মথুরা মহারাজ শুধু এগিয়ে এসেছেন সামনে। আমি ও জানকী তাঁর সঙ্গী হয়েছি। এবারে বোধহয় তাঁর রাগটা একটু কমেছে, সহযাত্রীদের কথা মনে পড়েছে। তাই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন পথের মাঝে।

মথুরা মহারাজের অনুমতি নিয়ে আমি এগিয়ে চলি। দক্ষিণ-

পশ্চিম দিকে চলেছি এখন। আমরা মান-সরোবরে যাচ্ছি। সেখানকার ধর্মশালাতেই আজ রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে।

সামনে খানিকটা দূরে যমুনার বেলাভূমি। ওপারে কেশীঘাট দেখা যাচ্ছে—প্রায় সোজাসুজি, যমুনার ওপারে। সেখান থেকে মানসীর বাসা মাত্র মাইলখানেক। কত কাছে, অথচ কত দূরে! আমার ও মানসীর মাঝে বিরহের যমুনা যাচ্ছে বয়ে।

"শুনছেন!"

জানকীর আকস্মিক আহ্বানে মানসী হারিয়ে যায়। ফিরে আসি বাস্তবে। পেছন ফিরি। দেখি জোরে জোরে পা ফেলে সে এগিয়ে আসছে।

সহযাত্রীরা সবাই পেছনে। আমি একা একা এগিয়ে এসেছিলাম। আপন মনে পথ চলছিলাম। জানকী প্রায় ছুটে এসে আমাকে ধরেছে।

সে কাছে আসে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে। বলি, "কি হয়েছে? এমন ছুটছো কেন?"

"আপনাকে ধরতে।" দম নিয়ে জানকী উত্তর দেয়। তারপরে বলে, "বাব্বা, কি জোরেই না হাঁটতে পারেন!"

"আমরা তো একই জায়গায় চলেছি। কিছুক্ষণ পরেই দেখা হত।"

"তখন যে সবার সামনে আমার কাজটা হত না!"

"কাজটা জানতে পারি কি?" বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করি।

কিন্তু জানকী সানন্দে উত্তর দেয়, "নিশ্চয়ই।" সে তার হাতব্যাগ খোলে। সেই সিঁদুরের প্যাকেটটা বের করে।

জানকী আবার আমাকে সিঁদুর পরাতে বলবে নাকি!

না। সেকথা বলে না সে। সিঁদুরের প্যাকেট খুলে তার অনামিকা দিয়ে আমার ললাটে একটি টিপ পরিয়ে দেয়।

সবিস্ময়ে বলে উঠি, "কি ব্যাপার ?"

"বিল্ববন দর্শন করে লক্ষ্মীর পা-ছোঁয়ানো সিঁদুরের টিপ পরতে হয়।"

হেসে বলি, "হয় তো বুঝলাম। কিন্তু লাভটার কথা শুনতে পারি কি ?"

"হ্যাঁ।" জানকী উত্তর দেয়, "মা-লক্ষ্মীর কৃপায় বিপদ-আপদ কাছে আসতে পারে না।"

চট ক'রে কোন উত্তর দিতে পারি না। আমাকে বিপদমুক্ত করবার জন্য এতগুলো মানুষের চোখের সামনে সে আমার পেছন পেছন ছুটে এসেছে! জানকী কলেজে পড়া বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে জানে, এই আসার জন্য তাকে হয়তো সহযাত্রীদের বিদ্রূপের বিষয় হতে হবে। তবু সে ছুটে এসেছে আমার ললাটে লক্ষ্মীর আশীর্বাদী সিঁদুরের টিপ পরাতে, আমাকে বিপদমুক্ত করতে। কিন্তু কেন ?

জানকী তো জানে আমি মানসীকে ভালোবাসি।

"কি ভাবছেন ?"

জানকীর প্রশ্নে চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি বলি, "না, এমনি চুপ করে আছি।"

"চুপ করে না থেকে একটা কাজ করুন দেখি!"

"কি কাজ ?"

"ক্ষেতের ওপাশটাতে দেখুন কত্ত বড় বড় কড়াইশুঁটি হয়েছে।"

"তা বেশ তো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকছি, তুমি তুলে নিয়ে এস না।"

"আমার ভয় করছে। দেখছেন না, জায়গাটা কি রকম ঢালু! যদি পড়ে যাই ?"

হেসে বলি, "তুমি তো ভারী স্বার্থপর! পড়ে যাবার ভয়ে নিজে যাচ্ছো না, অথচ আমাকে পাঠাতে চাইছো ?"

"এ আর নতুন কি বললেন ?" জানকী গম্ভীর হয়ে যায়।

বলতে থাকে, "স্বার্থপর বলেই তো সবার চোখের সামনে ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

"কেন এলে ?"

"বললাম যে লক্ষ্মীর আশীর্বাদী সিঁদুর পরাতে !"

"কিন্তু আমাকে তুমি কেন বিপদমুক্ত করতে চাইছো ?"

"আমি যে আপনার মঙ্গল চাই।"

"কারণ ?"

"আপনাকে ভাল লাগে আমার।" সহজ ও সতেজ স্বরে জানকী উত্তর দেয়।

কিন্তু আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি। কি বলছে জানকী ! সে তো জানে, আমি মানসীকে ভালোবাসি।

কি বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। চুপ করে থাকি।

জানকীও চুপ করে আছে। কি যেন ভাবছে সে। সহসা সে আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসে, "ঐ যে কীর্তন শোনা যাচ্ছে। সবাই এসে গেলেন প্রায়। বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে, কয়েকটা কড়াইশুঁটি নিয়ে আসুন দেখি !"

নাছোড়বান্দা মেয়ের পাল্লায় পড়েছি। ওর আবদার রক্ষা না করে নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং পথের ঢাল বেয়ে ক্ষেতে নেমে আসি—জানকী কড়াইশুঁটি খাবে।

কিছুক্ষণ বাদে জানকী ইশারায় কাছে ডাকে আমাকে। চেঁচিয়ে কি যেন বলছে সে। আমি রয়েছি পথ থেকে অনেকটা নিচুতে। ওর কথা শুনতে পাই না ঠিকমত। বোধহয় বলছে, আর দরকার নেই। এবার উঠে আসুন। শোভাযাত্রা এসে পড়ল—কীর্তন শোনা যাচ্ছে।

অতএব উঠে আসি। কাছে আসতেই সে আঁচল পাতে। আমি ঝোলা খুলে শুঁটিগুলো তার আঁচলে ঢেলে দিই।

খুশিভরা স্বরে জানকী জিজ্ঞেস করে, "আপনি খাবেন না ?"

"না।"

"কেন ?"

"এমনি।"

"রাগ করেছেন ?"

এবারে হাসি পায় আমার। একটু হেসে বলি, "বারে ! রাগ করব কেন ?"

"তাহলে কয়েকটা নিন।" বলেই সে একমুঠো শুঁটি আমার পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দেয়।

প্রতিবাদ না করে পথ চলতে থাকি।

ক্ষেতের ধারে ধারে বুনো ঝোপ। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে—বনফুল। দেখতে দেখতে পথ চলছি। সহযাত্রীদের এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে তাঁদের কীর্তনের শব্দ ভেসে আসছে।

জানকীর বোধহয় এসব দেখার কিংবা শোনার সময় নেই। ভারী ব্যস্ত সে। একহাতে কোঁচড় ধরে আরেক হাতে ক্রমাগত কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছে।

মনে পড়ছে মানসীর কথা। তার পাল্লায় পড়েও আমাকে একদিন আপেল চুরি করতে হয়েছিল। সৌভাগ্যের কথা সেদিন নাগর (কুলু) রেস্ট-হাউসের চৌকিদারের হাতে ধরা পড়েও হাজতে যেতে হয় নি।* আজও ভাগ্যটা ভাল বলতে হবে। ক্ষেতের মালিকরা বল্লম হাতে ছুটে আসে নি। না, আমি সত্যই একজন ভাগ্যবান চোর।

"দেখুন, দেখুন, কি সুন্দর !"

জানকীর চিৎকারে বর্তমানে ফিরে আসি। তাকিয়ে দেখি পথের পাশে একটি ঝোপের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে সে। যাক্ গে। এতক্ষণে তাহলে কড়াইশুঁটি থেকে ফুলের দিকে নজর পড়েছে।

* লেখকের 'উত্তরস্যাং দিশি' দ্রষ্টব্য

তবে এগুলি সাধারণ ফুল নয়, বুনো গোলাপ।' ভারি সুন্দর রঙ। না, জানকীর চোখ আছে বলতে হবে, একেবারে জহুরীর চোখ। বাজে জিনিসের দিকে নজর না দিয়ে খাঁটি জিনিসটির দিকে তাকায়।

"আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কি?" জানকী যেন ধমক লাগায় আমাকে। বলে, "যান, ভাল দেখে একটি ফুল তুলে নিয়ে আসুন।"

এ তো অনুরোধ নয়, এ যে আদেশ। আর জানকী সম্ভবত ভেবে বসে আছে, তার আদেশ লঙ্ঘন করবার সাধ্য নেই আমার। এ বিশ্বাস তার কেন হল, বুঝতে পারছি নে। জানকী তো সবই জানে। বৃন্দাবন আশ্রমে সে মানসীকে দেখেছে।

তবু আমি কোন আপত্তি করতে পারি না। নিঃশব্দে এগিয়ে যাই বুনো গোলাপগাছটির দিকে। ভাল দেখে দু'টি গোলাপ তুলে ফিরে আসি জানকীর কাছে।

জানকী আনন্দে একেবারে উপচে পড়ে। সকৃতজ্ঞ স্বরে বলে, "অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে যে!"

বিরক্ত হই। মেয়েটা কি পেল আমাকে? ওর ফরমাশ কি আর শেষ হবে না?

তাহলেও ভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করি, "কাজটা কি শুনি?"

"আগে কথা দিন আপত্তি করবেন না!"

"নেহাত অসম্ভব না হলে, তোমার কথা রাখবার চেষ্টা করব।"

"ব্যস ব্যস, এতেই হবে।" জানকী সোচ্চার স্বরে বলে ওঠে। একবার একটু থামে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আকস্মিক অভিযোগ করে, "দেখতে পাচ্ছেন না? আমার দু'টো হাতই আটকা —আমি কড়াইশুঁটি খাচ্ছি। ফুলদু'টো আমার খোঁপায় গুঁজে দিন। ভাল করে গুঁজবেন। দেখবেন, যেন পড়ে না যায়।"

॥ ষোল ॥

সবার সঙ্গে মান-সরোবরের তীরে পৌঁছলাম। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই আমরা সংকীর্তন-শোভাযাত্রার সামিল হয়েছিলাম।

এমন কি এ অঞ্চল সম্পর্কে মথুরা মহারাজের কিছু বক্তব্যও শুনে নিয়েছি ইতিমধ্যে। মহারাজ বলেছেন—যমুনার এই পূর্বতীর নাকি মাত্র বছর পঁচিশ আগেও জনহীন ছিল। জনবসতি অবশ্য আজও চোখে পড়ে নি। তবে শুনেছি খানিকটা দূরে গ্রাম আছে।

যাক্‌গে, যে কথা বলছিলাম। মহারাজ বলেছেন—মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে গভীর বন ছিল। প্রচুর চমরীগাই ও ময়ূর দেখা যেত এখানে। হিংস্র জন্তুও ছিল কিছু কিছু। তাই তীর্থযাত্রীদের বল্লম কিংবা বন্দুক কাঁধে নিয়ে মান-সরোবর দর্শনে আসতে হত।

সেকালের কথা শুনতে শুনতে একালের পথ দিয়ে আমরা এই মাত্র মান-সরোবরের তীরে এসে পৌঁছলাম। সত্যই সুন্দর। শুধু সরোবর নয়, তার পরিবেশ। এমন রমণীয় স্থান বড় বেশি দেখা যায় না।

সরোবরটি খুব বড় নয়। কিন্তু টলটলে জল—একেবারে তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অসংখ্য জলপদ্ম ফুটে আছে।

ফুলের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। ভয়ে ভয়ে জানকীর দিকে তাকাই। সে-ও সরোবর দেখছে। সর্বনাশ, আবার জলে নেমে পদ্ম তুলে এনে তার খোঁপায় গুঁজে দিতে বলবে না তো?

না, না, তা বলবে কেন? মনকে আশ্বস্ত করে তুলতে চাই। মনে মনে বলি—ঐ তো আমার দেওয়া বুনোগোলাপ এখনও তার কালো কেশে জ্বলজ্বল করছে। তাছাড়া জানকী চপলা হলেও চতুরা তো বটেই। সবার সামনে নিশ্চয়ই সে অমন অনুরোধ করবে না।

তাহলেও তাড়াতাড়ি জানকীর পাশ কাটিয়ে ঘাটে এসে দাঁড়াই। বাঁধানো ঘাট, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। ঘাটের পাশেই একটি কুয়ো—খাবার জল। জল তোলার জন্য পাম্প বসানো রয়েছে।

প্রাণভরে মিঠে ও ঠাণ্ডাজল খেয়ে নিই। এবারে মন্দিরে যেতে হবে। এটাই তীর্থ-দর্শনের রীতি। যত দূর-দুর্গমই হোক্, তীর্থে পৌঁছে প্রথমেই তীর্থ-দেবতাকে দর্শন করে নিতে হয়। তারপরে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা।

সহযাত্রীদের অনেকেই বোধহয় সেকথা ভুলে গেছেন। তাঁরা ঘাটের ওপর ভিড় করেছেন। আর তাঁদের মধ্যে চক্রবর্তীও একজন। সে ইতিমধ্যেই কাঁধের থলি থেকে ধুতি ও গামছা বের করেছে, ঘড়ি ও আংটি খুলে ফেলেছে।

তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "এখুনি স্নান করবে নাকি?"

"নিশ্চয়ই।"

"দর্শন না করেই?"

"হ্যাঁ। তাই তো নিয়ম।"

প্রতিবাদ করি না। একটু সরে এসে ঘাটের ওপর দাঁড়াই। জনৈক সহযাত্রীর জিম্মায় জিনিসপত্র রেখে চক্রবর্তী জলে নামে।

একজন অপরিচিত প্রবীণ স্নান করে ওপরে উঠে এলেন। আলাপ করি তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোক আগ্রার লোক। তীর্থ করতে আসেন নি, ব্যবসা করতে এসেছেন এই মান-সরোবরে। কাছেই কিছু জমি নিয়েছেন। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। বেশ ভাল ফসল নাকি হয় এখানে। চাষের কাজে জলের অভাব নেই। বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হয় এ অঞ্চলে।

চক্রবর্তী স্নান সেরে ধর্মশালায় চলে গেল। ওর অনেক কাজ। তিলকসেবা, সন্ধ্যা-আহ্নিক ও নামজপ করতে হবে। আমার ও-সব পাট নেই। আমি মন্দিরের দিকে পা বাড়াই।

"তোমরা কি আজ প্রসাদের পরে পরিক্রমা শুরু করেছো?"

কে ? চমকে উঠি! পেছন ফিরি।

হ্যাঁ। ভুল হয় নি আমার। সে-ই তো রয়েছে দাঁড়িয়ে, ঠিক আমার পেছনে, মান-সরোবরের তীরে। নিঃশব্দে কখন যেন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে মানসী।

আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে গিয়েছি।

মানসী বোধহয় বুঝতে পারে আমার মানসিকতা। তাই মৃদু হেসে আবার জিজ্ঞেস করে, "তোমরা নিশ্চয়ই দুপুরের প্রসাদ পেয়ে রওনা হয়েছো ?"

কোনমতে সামলে নিই নিজেকে। একবার ঘাড় নেড়ে পাল্টা-প্রশ্ন করি ওকে, "তুমি কখন এলে এখানে ?"

"আজ দুপুরে " সে উত্তর দেয়।

"খুকু কোথায় ?" জিজ্ঞেস করি।

"বৃন্দাবনে। আজ আর তাকে নিয়ে আসি নি।" একবার থামে মানসী। তারপরে বলে, "দূরের পথ বলে সেদিন রাধাকুণ্ডে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি বলে আজ একাই এসেছি।

কথাটা মিথ্যে নয়। যমুনার এপারে মান-সরোবর, ওপারে বৃন্দাবন। ওপারে মন-বৃন্দাবন আর এপারে বন-বৃন্দাবন। ওপারের মানসী এপারে এসেছে। এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, সমস্ত শঙ্কা ও লজ্জা বিসর্জন দিয়ে।

"তোমার বাসা থেকে মান-সরোবর কতটা দূর হবে ?"

"কি আর এমন দূর ? মাইল তিনেক।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "চল, মন্দির দর্শন করে আসবে।"

তাই ভাল। কয়েকজন সহযাত্রী তির্যক দৃষ্টিতে আমাদের দু'জনকে দেখছেন। কিন্তু জানকী কোথায় ? তাকে যে দেখতে পাচ্ছি না। এই তো একটু আগে ওখানে দাঁড়িয়ে সে মান-সরোবরের ফুল দেখছিল।

আমি মানসীর সঙ্গে পথ চলা শুরু করি। মান-সরোবরের পথ, মধু-বৃন্দাবনের বনপথ। চলতে চলতে ওর কথাই ভাবতে থাকি, মানসীর কথা—

আজ কিন্তু সে বড়ই বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কি দরকার ছিল এতটা পথ হেঁটে এসে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করার? এই তো সেদিন রাধাকুণ্ডে গিয়ে দেখা করে এলো। সেখানে তবু একটা বাহ্যিক কারণ ছিল। পরে সবাইকে বলতে পেরেছি—সে কার্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীর স্নান করতে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

মনে মনে বিশ্বাস না করলেও মুখে কেউ কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু আজ বিনা পার্বণে এখানে আসার জন্য আমি কি কৈফিয়ৎ দেব সহযাত্রীদের কাছে! তাঁরা যে অনেকে প্রায় প্রকাশ্যেই হাসাহাসি শুরু করেছেন। এর আগেই আমরা দু'জনে তাঁদের অবসর-বিনোদনের বিষয় হয়ে উঠেছিলাম, ওর আজকের কাণ্ডটা স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁদের আরও উৎসাহিত করে তুলবে।

"কি ভাবছো?" মানসী সহসা প্রশ্ন করে।

"ভাবছি," আমি উত্তর দিই, "তুমি আবার এত কষ্ট করে এতদূরে এলে কেন?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"ক'দিন পরেই তো আমার পরিক্রমা শেষ হচ্ছে। আমি নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে দেখা না করে কলকাতায় ফিরতাম না।"

"এভাবে আজ আমার এখানে আসাটা তোমার বোধহয় মোটেই ভাল লাগছে না, না?" মানসী আমার মনের কথাটি বলে দেয়।

চুপ করে থাকি।

গম্ভীর স্বরে মানসী আবার বলে, "আমি জানতাম এভাবে এখানে এলে তুমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে। তবু"...একবার থামে সে, "মানে এত কাছে তুমি আসছো জানতে পেরে, না এসে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, গতকাল সকালেও জানতাম না যে আজ আমি

এখানে আসব। আর কেনই বা আসব? আমি যে চিঠি না পেয়ে তোমার ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলাম। হঠাৎ গতকাল বিকেলে তোমার চিঠিটা এলো। আমার সব রাগ অনুরাগে রূপান্তরিত হল। জানতে পারলাম আজ তোমরা এখানে আসছো। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সারারাত ছটফট করলাম। বহু ভাবনা-চিন্তার পরে মনে হল তোমার সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই জানেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সুতরাং আমি এখানে এলে তাঁরা কিছুই মনে করবেন না। আর তাই চলে এলাম।"

"কিন্তু তাঁদের অনেকেই যে আড়চোখে আমাকে দেখছেন।" মৃদু হেসে ওকে বলি।

"তা তো দেখবেনই। ওঁরা যে তোমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত।"

"ঈর্ষান্বিত!" আমি বুঝতে পারি না।

"তা ছাড়া কি? আমার মতো একজন সুন্দরী ও বিদুষী বার বার এসে তোমার পায়ে মাথা ঠুকছে, এটা ওঁদের সহ্য হচ্ছে না।" কথাটা শেষ করেই মানসী সহসা প্রণাম করে আমাকে।

সহযাত্রীদের অনেকেই তাকিয়ে তাকিয়ে মানসীর কাণ্ড দেখছে। এখানে আর দেরি করা উচিত হবে না। তাই তাড়াতাড়ি মানসীকে বলি, "চলো, মন্দিরে যাওয়া যাক্।"

মাথা নেড়ে মানসী বলে, "চলো।"

ঝাউ আর তমাল গাছে ছাওয়া মানময়ী রাধারাণীর মন্দির— এখানকার মূল মন্দির।

দু'টি অংশে বিভক্ত নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির। নাট-মন্দিরটি গোলাকার—তিনদিক খোলা। কয়েকটি সুদৃশ্য স্তম্ভের ওপরে ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাট-মন্দিরের সঙ্গেই ক্ষুদ্র কিন্তু সুদৃশ্য গর্ভ-মন্দির। ভেতরে রাধারাণীর মানময়ী মূর্তি। শাড়ি-পরিহিতা দণ্ডায়মানা ভারী সুন্দর মূর্তি। আমরা দণ্ডবৎ করি।

আগেই বলেছি, দণ্ডবৎ মানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। ভক্ত-বৈষ্ণবরা কখনই দাঁড়িয়ে দেব-দেবীকে প্রণাম করেন না। মাটিতে শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। আমাকেও তাই করতে হয়। আমি যে ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমায় এসেছি।

তবে লজ্জার কথা, এতগুলি ভক্তের সঙ্গে কুড়িদিন কাটিয়েও দণ্ডবৎ করবার কায়দাটি রপ্ত করে উঠতে পারি নি।

প্রণাম ও প্রদক্ষিণের পরে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। এগিয়ে চলি ধর্মশালার দিকে।

ঘাটের পাশ দিয়েই ধর্মশালার পথ। আর সেখানেই রয়েছে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ। মন্দিরে যাবার সময় এরই তলা দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু তাড়াতাড়িতে তখন দেখতে পাই নি, এখনি দেখছি —বৃদ্ধ বটের ডালে ডালে বানর ঝুলছে।

ধর্মশালার চৌকিদার সাবধান করে—ভয়ানক বানরের উৎপাত এখানে। সুযোগ পেলেই তারা যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে গাছে উঠে বসে। তখন সেই ছিনতাইকারী ও তার সহকারীদের সন্দেশ ঘুষ না দিলে অপহৃত জিনিস উদ্ধার করা অসম্ভব।

যতদূর জানি, আমাদের আশ্রমের ক্যাশিয়ার-কাম-মার্কেটিং ম্যানেজার নরেনপ্রভু সে রকম কোন 'প্রভিশন' রাখেন নি। সুতরাং সবাইকে সাবধান হতে হয়।

নরেনপ্রভুকে আমি কলকাতায় বসে নরেনবাবু ডাকতাম। কিন্তু বৃন্দাবনে এসেই তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন—একটা কথা আপনারে কইয়া দেই ঘোষমশয়, আপনে ভক্ত-বৈষ্ণবগো লগে বন-ভ্রমণে আইছেন। যতদিন বেরজোমণ্ডলে আছেন, ততদিন কাউরে বাবু ডাকবেন না। এহানে কেউ বাবু নাই, সব্বাই প্রভু।

সুতরাং ব্রহ্মচারী থেকে বালক পর্যন্ত সবাইকে প্রভু ডাকতে হচ্ছে। সন্ন্যাসীদের কথা অবশ্য আলাদা। আশ্রমিক অনুশাসনে তাঁরা হলেন 'ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসারস'। তাঁদের

দেখলেই দণ্ডবৎ করতে হয়। এবং হাতজোড় করে বলতে হয় 'মহারাজ'।

বটগাছের বিপরীত দিকে দেওয়াল-ঘেরা দোতলা ধর্মশালা। গেট পেরিয়ে বাঁধানো উঠোন—এখন আমাদের অস্থায়ী মন্দির: শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিজয়-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ধর্মশালার চত্বরে। আর সেখানেই গল্পের আসর বসিয়েছেন মথুরা মহারাজ।

জানকীও রয়েছে তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে। আমাদের দেখেই সে বলে উঠল, "ওকি! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। মহারাজ মান-সরোবরের কাহিনী বলছেন।" জানকী ইসারায় মানসীকে কাছে ডাকে। মানসী তার পাশে গিয়ে বসে।

আমিও নিঃশব্দে বসে পড়ি। মথুরা মহারাজের কথা শুনি। তিনি বলছেন—

"আপনারা বৃন্দাবনে বসে রাসলীলার কথা শুনেছেন। তখন আমি বলেছি, শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিংশ থেকে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়ে সেই সুমধুর কৃষ্ণলীলার কথা বলা হয়েছে।"

আমরা মাথা নাড়ি।

মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন—

"ভক্তবৃন্দ! আপনারা সকলেই জানেন, প্রেমমাধুরী আস্বাদন করবার জন্য প্রেমিক শিরোমণি গোপীনাথ বৃন্দাবনের বংশীবটতলে গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা আরম্ভ করলেন। এক-কৃষ্ণ লক্ষ-কৃষ্ণের রূপ নিয়ে একই সময়ে লক্ষ গোপিনীকে সঙ্গদান করতে থাকলেন। প্রেম-যমুনার তীর তখন ভক্ত ও ভগবানের মিলন-বাসরে রূপান্তরিত: মধু-বৃন্দাবন তখন স্বর্গাদপি গরীয়সী।

"স্বভাবতই স্বর্গের দেব-দেবীরা বিচলিত বোধ করলেন। তাঁরা ছুটে এলেন মধু-বৃন্দাবনে।

"দেবতাদের সঙ্গে স্বয়ং শিবও এসে উপস্থিত হলেন রাসস্থলীতে। তিনি রাসলীলা দেখে লুব্ধ হলেন। রাস-মণ্ডলে প্রবেশ করতে

চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। কারণ, কৃষ্ণ ছাড়া আর কোন পুরুষ প্রবেশ করতে পারে না রাস-মণ্ডলে।

"ব্যর্থ শিব ক্ষুণ্নমনে বাইরে বসে রইলেন। স্বামীর দুরবস্থা দেখে দুর্গার দুঃখ হল। বৃদ্ধার রূপ নিয়ে তিনি এসে উপস্থিত হলেন স্বামীর সামনে। শিবকে প্রেম-যমুনায় ডুব দিতে বললেন।

"প্রেম-যমুনায় ডুব দিতে পারলেই ভক্ত গোপীত্ব লাভ করেন। শিবেরও তাই হল। গোপিনীর রূপ পেয়ে তিনি বিনা বাধায় রাস-মণ্ডলে প্রবেশ করলেন। ভগবানের সঙ্গে রাসলীলায় মগ্ন হলেন।

"গোপীশ্বর মহাদেবের প্রতি কৃষ্ণ হয়তো বা কিছু পক্ষপাতিত্ব করে থাকবেন। আর তাই দেখে রাধারাণীর ঈর্ষা হল। কৃষ্ণের প্রতি অভিমানে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। রাস-মণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসে যমুনায় ঝাঁপ দিলেন।

"কিন্তু কৃষ্ণপ্রিয়া কালিন্দী কেমন করে কৃষ্ণবল্লভাকে ভাসিয়ে নিয়ে যান? তাই যমুনা সযত্নে শ্রীমতীকে তুলে দিলেন এখানে—এই পুণ্যভূমিতে। বুকভরা ব্যথা নিয়ে বিরহিনী শ্রীরাধিকা বসে রইলেন কালিন্দীর কূলে। মানময়ী রাধারাণীর চোখের জলে সৃষ্ট হল এই সরোবর—মান-সরোবর।

"অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতে পারলেন। তিনি শিবকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন এখানে। সব কথা খুলে বললেন রাধারাণীকে। কৃষ্ণ রাধার পা ধরে ক্ষমা চাইলেন।

"মান-সরোবরের তীরে মানময়ী রাসেশ্বরীর মান ভঙ্গ হল। রাধারমণ পরম-সমাদরে কৃষ্ণবল্লভাকে বুকে টেনে নিলেন। রাধা-কৃষ্ণের মধুর মিলনে এই পুণ্যতীর্থ ধন্য হল।"

সভা ভঙ্গ হবার পরে মানসীর সঙ্গে জানকীও আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে সে-ই কথা বলে, "চলুন মানসীদির ঘরে। মানসীদি আমাকেও চা-য়ের নেমন্তন্ন করেছে।"

কে বলবে মাত্র কয়েক মিনিট আগে ওর সঙ্গে মানসীর প্রথম

আলাপ হয়েছে। মেয়েরা বড় তাড়াতাড়ি একে অপরকে আপন করে নিতে পারে।

হেসে বলি, "নেমন্তন্ন করেছে, না নিজেই আদায় করে নিয়েছো?"

"তা অনেকটা বলতে পারেন।" জানকী মানসীর দিকে তাকায়।

"ওরে দুষ্টু মেয়ে," মানসীর কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম ভৎর্সনা, "মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে!"

"তা বৈকি! আচ্ছা তুমি সত্যি করে বলো তো মানসীদি, আমি নিজে ডেকে তোমার সঙ্গে আলাপ না করলে, তুমি কখনও আমাকে চা-য়ের নেমন্তন্ন করতে?"

কথাটা মিথ্যে নয় বলেই মানসী হয়তো প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "কিন্তু তোমার বৌদি ও দাদারা কোথায়? তাঁদের ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলো। তোমরা সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছো। নিশ্চয়ই খুবই খিদে পেয়েছে।"

জানকী আর কথা না বাড়িয়ে ভিড়ের ভেতর থেকে চক্রবর্তী বোসবাবু সেনবাবু ও বৌদিকে ডেকে নিয়ে আসে। মানসীর সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেয়। তারপরে আমরা উঠে আসি ধর্মশালার দোতলায়—মানসীর ঘরে।

একেবারে শেষ ঘরখানি নিয়েছে মানসী। বলা বাহুল্য বাকি ঘরগুলো সবই এখন গোবর্ধন মহারাজের দখলে—আমার নারী-পুরুষ সহযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। ধর্মশালাটি ছোট এবং নিচের তলাটি রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত।

সহযাত্রীরা জায়গা দখলে ব্যস্ত। আমরা তাঁদের তির্যক দৃষ্টি এড়িয়ে মানসীর ঘরে এসে ঢুকি।

মানসী ইতিমধ্যেই ঘরখানি বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। একপাশে বিছানা, আরেক পাশে রান্নার সাজ-সরঞ্জাম। দু'টো টিফিন-ক্যারিয়ার রয়েছে। বুঝতে পারছি, বৃন্দাবন থেকে আমার জন্য

খাবার বানিয়ে এনেছে মানসী। এবং যেহেতু এখানে আমাকে একা খাওয়ানো সম্ভব নয়, তাই কয়েকজনের খাবারই নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে।

আমাদের বসতে বলে মানসী স্টোভ ধরায়। বৌদি সেনবাবু বোসবাবু ও চক্রবর্তীকে নিয়ে আমি মানসীর বিছানায় বসি। জানকী কিন্তু মানসীকে সাহায্য করতে লেগে যায়।

অনেক খাবার নিয়ে এসেছে মানসী। রাধাকুণ্ড ছাড়ার পরে আর এমন সুস্বাদু খাবার ভাগ্যে জোটে নি। পেটভরা জলখাবার ও চা পেয়ে আমরা পুলকিত হয়ে উঠি।

মানসী কিন্তু চা ছাড়া আর কিছুই খেল না। জানকী ও বৌদি বহু সাধ্য-সাধনা করলেন। কিন্তু তার সেই একই কথা—আপনারা আসার একটু আগে আমি সেদ্ধ-ভাত খেয়েছি। এখন কিছু খেলেই বমি হয়ে যাবে।

লাভ নেই জেনে আমি আর ওকে কোন অনুরোধ করি না। আর কেমন করেই বা অনুরোধ করি! আমি যে ওর কৃচ্ছ্রসাধনের কারণ জানি। আমি যে জানি বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করতে মানসী বৃন্দাবনবাসিনী হয়েছে।

কৌতূহলটা বোধ করি সকলের মনেই দানা বেঁধেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল শুধু জানকী। সে বলল, "আচ্ছা মানসীদি, আপনি তো খাওয়াতে এসেছেন একজনকে," সে আড়-চোখে একবার আমার দিকে তাকায়, "তা এত খাবার করে এনেছেন কেন?"

একটু হাসে মানসী। তারপরে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে বলে, "সবার সামনে তাকে একা খাওয়ানো সম্ভব নয় বলে।"

"আমাদের অশেষ ভাগ্য ঘোষ!" চক্রবর্তী এতক্ষণে কথা বলে, "তুমি সঙ্গে ছিলে বলে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশেও এমন উপাদেয় জলখাবার জুটে গেল।"

তার কথা বলার ধরন দেখে সবাই হেসে ওঠে। মানসীও বাদ যায় না।

কিন্তু আমি গম্ভীর স্বরে বলি, "একজন দীক্ষিত ভক্ত-বৈষ্ণব হয়ে তুমি এ-সব কি বলছো চক্রবর্তী!"

আমার কথা ও স্বর শুনে চক্রবর্তী রীতিমত ঘাবড়ে যায়। সহযাত্রীরাও তাড়াতাড়ি শান্ত হয়।

বিনীত কণ্ঠে চক্রবর্তী প্রশ্ন করে, "কেন? আমি কি অপরাধ করলাম প্রভু?"

"সাংঘাতিক অপরাধ করেছো।" আমি তাকে ধমক লাগাই।

সে হাতজোড় করে জিজ্ঞেস করে, "কি অপরাধ জানতে পারি!"

"তুমি রাধা-কৃষ্ণের এই পরম-পবিত্র লীলাস্থলের অমর্যাদা করেছো।"

চক্রবর্তী আর কোন প্রশ্ন করতে পারে না। কেবল করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। সহযাত্রীরাও তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখছে। আর দেরি করলে হয়তো হাসি চেপে রাখতে পারব না, তাই গম্ভীর স্বরে তাড়াতাড়ি বলে ফেলি, "তুমি এই পরম-রমণীয় তীর্থকে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ বলেছো!"

"আমার অপরাধ হয়ে গেছে প্রভু!"

"তা আমাদের কাছে অপরাধ কবুল করে তো লাভ নেই কিছু, আমরা সকলেই ভক্তিহীন অ-বৈষ্ণব।"

"তাহলে আমাকে কি করতে হবে?" চক্রবর্তী কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"মন্দিরে গিয়ে রাধারাণীর কৃপা প্রার্থনা কর।"

"আমি তাহলে যাই!"

"হ্যাঁ, যাও।"

আর কোন কথা না বলে চক্রবর্তী ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আর তারপরেই আমরা প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

সন্ধ্যাটা আনন্দেই কাটল। মানসীকেও রান্না করতে হল না। চক্রবর্তী গুরুমহারাজকে বলে আমাদের সঙ্গেই তার প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করেছে।

একে পদ-পরিক্রমা, তার ওপরে পাঠ-কীর্তন। কোনটিই কম শ্রমসাপেক্ষ নয়। কাজেই প্রসাদের পরেই সকলে শয্যা নিলেন।

আমিও পরিশ্রান্ত। তবু হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে আসি ধর্মশালা থেকে। সপ্তমীর চাঁদ অস্তাচলগামী। কিন্তু তার রুপোলী আভায় মধু-বৃন্দাবন মধুময় হয়ে উঠেছে। সহযাত্রীদের জন্য দুঃখ হচ্ছে। মান-সরোবরের এই মধুর রূপটি তাঁদের অজানাই রয়ে গেল।

হেমন্তের শিশিরে ঘাট ভিজে আছে। তবু বসে পড়ি ঘাটের ধাপে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেরিয়ে এসেছি ঘর থেকে। আসার সময় আলোয়ানখানি সঙ্গে নিতে ভুলে গেছি। বেশ শীত-শীত করছে।

করুক্ গে। নিস্তব্ধ নিশীথে বন-বৃন্দাবনের এই নির্জন রূপটি বড় ভাল লাগছে। শীতের ভয়ে এখুনি চলে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।

আমি বসে থাকি। বসে বসে মান-সরোবরের অপরূপ রূপ দেখতে থাকি। আমি রূপ-সাগরে ডুব দিই। নিজের অলক্ষ্যেই বলে উঠি—

'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি॥

যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি॥'

"ওয়াণ্ডারফুল···অদ্ভুত, চমৎকার······"

চমকে পেছন ফিরি। মানসী মৃদু হাসছে। কখন সে এখানে এসেছে, টের পাই নি। বোধহয় তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আমার বেরিয়ে আসা লক্ষ্য করে থাকবে। তাই নিজেও বেরিয়ে এসেছে বাইরে। কিন্তু বৌদি আর জানকী যে ওর ঘরে শুয়েছে! তাদের সামনে এত রাতে···

"তোমার এ গুণটার কথা জানতাম না তো!" আমার পাশে বসতে বসতে মানসী বলে।

সে আমার আবৃত্তির তারিফ করছে। একটু হেসে জবাব দিই, "তোমার কি ধারণা, আমার সব দোষ-গুণের কথাই তুমি জেনে ফেলেছো?"

"হুঁ!"

"এতখানি আত্মবিশ্বাস কিন্তু বিপজ্জনক।"

"আত্মবিশ্বাস কম থাকলেও যে বিপদ।"

"কি রকম?"

"এই যেমন, সবার চোখের সামনে দিয়ে এত রাতে তোমার কাছে আসতে পারতাম না।"

"কাজটা কিন্তু সত্যই ভাল করো নি।"

"ভাল ও মন্দ শব্দ দু'টো আপেক্ষিক।"

"যেমন?"

"তোমার সহযাত্রীদের কাছে যেটা মন্দ, আমার কাছে সেটা ভাল হতে পারে।"

"তাহলে, সেদিন বৃন্দাবনে বসে যখন তোমাকে এই যাত্রার সঙ্গী হতে বলেছিলাম, তখন আপত্তি করেছিলে কেন?"

"আমি সঙ্গে থাকলে তোমার কাজের অসুবিধে হবে বলে।"

"তখন কিন্তু বলেছিলে, তোমাকে সঙ্গে নিলে আমার দুর্নাম রটবে।"

"সেটাও মিথ্যে নয়, তবে তার চাইতেও একটি বড় সত্যি ছিল।"

"কি ?"

"আমি সঙ্গে থাকলে তোমার মন সর্বদা আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত, তুমি পরিক্রমায় মন দিতে পারতে না।"

চুপ করে থাকি, কথাটা মিথ্যে নয়। মানসী সঙ্গে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে সর্বক্ষণ আমার সারা মন জুড়ে থাকত, আমি কৃষ্ণলীলাস্থলের দিকে মন দিতে পারতাম না।

মানসী নীরবতার অবসান করে। বলে, "সেদিন রাতে রঙ্গজীর বাগানে বসে তোমাকে বলেছি সখা—আমি কিছুতেই অমন স্বার্থপর হতে পারব না। আমার কত আশা, তুমি চুরাশি ক্রোশ ব্রজ-পরিক্রমা পূর্ণ করে ব্রজমণ্ডলের কথা লিখবে। যে কৃষ্ণলীলাস্থল বাঙালীর অবদান অথচ বাঙালী আজ ভুলতে বসেছে, তোমার বই পড়ে আবার বাঙালীর তা মনে পড়বে। আবার দলে দলে বাঙালী বৃন্দাবনে আসবেন, বন-যাত্রায় অংশ নেবেন। আবার বন-ভ্রমণ জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তুমি আমার এ আশা পূর্ণ কর সখা!"

একবার থামে মানসী। তারপরে বলে, "আমার স্থির বিশ্বাস, আমি সঙ্গে থাকলে তুমি কিছুতেই আমার এ আশা পূর্ণ করতে পারতে না।"

"জানি না," আমি কথা বলি, "কিন্তু জানি, তুমি সঙ্গে থাকলে আমার মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা আরও বেশি মধুময় হয়ে উঠত!"

"না।" মানসী প্রতিবাদ করে, "কেবল মিলনই মধুময় নয়, বিরহের মাঝেও যে মধু মিশে থাকে।"

ভাবি তাহলে সেদিন চিঠিতে ও-সব কথা লিখেছিলে কেন? কিন্তু এখন তাকে সে চিঠির কথা মনে করিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কি বলা উচিত তাও বুঝে উঠতে পারি না। চুপ করে থাকি।

মানসীও নীরব। নীরব এই আলো-আঁধারী রাত। নীরব এই মান-সরোবর আর মধু-বৃন্দাবন।

সহসা মানসী সে নীরবতার অবসান ঘটায়। মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আজ এমন পাগলের মতো তোমার কাছে ছুটে এলাম কেন বলতে পারো?"

"আমরা বৃন্দাবনের এত কাছে এসেছি বলে!"

"আরও একটি কারণ আছে।"

"কি?"

"এসেছি তোমাকে প্রণাম করতে।"

"হ্যাঁ, তুমি তখন সবার সামনেই আমাকে প্রণাম করলে, কিন্তু কেন?"

"আজ আমার জন্মদিন।"

আমি মানসীকে কাছে টেনে নিই। সে আমার বুকে মুখ লুকোয়। আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি।

না, মানসী নীরব থাকে না। সে মৃদুকণ্ঠে বলে চলে, "সখা, বহুকাল বাদে আজ আবার নিজেকে বড় বেশি সৌভাগ্যবতী বলে মনে হচ্ছে। এমন দিনে আমি আজ তোমাকে এত কাছে পেলাম।"

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে যায়। তারপরে সহসা মানসী আমার বুক থেকে মুখ তোলে। সে আমাকে ছেড়ে দেয়। সোজা হয়ে বসে।

আমার দিকে তাকিয়ে চড়া স্বরে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, তুমি একটা কি বলো তো?"

"হঠাৎ এ প্রশ্ন!" আমি বিস্মিত।

"তুমি একটা আস্ত পাগল।"

"তুমি যখন বলছো, তখন হয়তো তাই।" হাসতে হাসতে বলি, "কিন্তু তোমার এই সিদ্ধান্তের কারণটা জানতে পারি কি?"

"আমার একার সিদ্ধান্ত হবে কেন, সবাই বলবে।"

"কিন্তু কেন?"

"এই শীতে কেউ একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি ও জহরকোর্ট পরে ঘরের বাইরে বের হয়!"

কাজটা সত্যি ঠিক হয় নি। বেশ শীত পড়েছে। তার ওপর ক'দিন আগেও আমার জ্বর হয়েছিল। শরীরটা এখনও সুস্থ হয়ে ওঠে নি। এভাবে ঠাণ্ডা লাগানো উচিত হচ্ছে না। অপরাধীর কণ্ঠে বলি, "মানে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি কিনা, আসার সময় আলোয়ান নিয়ে আসার কথাটা খেয়াল হয় নি।"

"পাগলদের চিরকালই খেয়াল একটু কম থাকে।"

ওর মন্তব্যের কোন উত্তর দিই না—আগুনে ঘি দেওয়া ঠিক নয়।

মানসী চট করে নিজের চাদরটা গা থেকে খুলে আমার পিঠের ওপর দিয়ে দেয়।

জানি প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না, তবু বলি, "তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে!"

"লাগুক।"

আমি অসহায়। সুতরাং চুপ করে থাকি।

মানসীও কোন কথা বলছে না। নীরব কিছুক্ষণ। মৃদু হেসে প্রস্তাব করি, "তার চেয়ে সেদিন রাধাকুণ্ডের তীরে যেমন একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে দু'জনে রাত কাটিয়েছিলাম, আজ এই মান-সরোবরের তীরে কি তেমনি একখানি চাদর গায়ে দিয়ে আমরা দু'জনে কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারি না?"

"না।"

"কারণ?"

"চাদরটা ছোট।"

"তা হোক্ গে, কথায় বলে—যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন।" একখানি হাত বাড়িয়ে আমি তাকে কাছে টেনে নিই। সে কোন আপত্তি করে না।

কিন্তু চাদরটা সত্যই ছোট, কিছুতেই কুলোতে চাইছে না।

অবশেষে মানসী আমার গা ঘেঁষে বসে আধশোয়া ভঙ্গীতে আমার কোলে মাথা রাখে। আমি চাদরের এক প্রান্ত দিয়ে ওকে ঢেকে দিই। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

মনে হচ্ছে আমাদের চারিপাশের এই পৃথিবী আর দূর-আকাশের ঐ সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্রের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। দূরে ও কাছে কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। শুধু আমাদের দু'জনকে নিয়ে একটি মাত্র প্রাণ—একটি অনন্ত জীবন।

অতীত মিলিয়ে গেছে। ভবিষ্যতের ভাবনা গিয়েছি ভুলে। শুধু বর্তমানকে সম্বল করে বেঁচে রয়েছি দু'জনে।

নিস্তব্ধ নিশীথের প্রহর গড়িয়ে চলে। আমরা দু'জনে জেগে থাকি। আমরা ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন—আমাদের ঘুম নেই। সব মিথ্যে, শুধু আমি আর মানসী সত্য।

কতক্ষণ আমরা দু'জনে দু'জনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলতে পারব না। হঠাৎ কেন যেন কাছেই কোথাও একটি নাম-না-জানা পাখি গান গেয়ে উঠল। আমরা চমকে উঠলাম। সম্বিত ফিরে পেলাম।

সপ্তমীর চাঁদ কখন যেন মিলিয়ে গেছে। আঁধার নেমে এসেছে মধু-বৃন্দাবনের মাটিতে আর মান-সরোবরের বুকে।

মানসী ঠিক হয়ে বসে। সে কথা বলে, "চলো, এবারে ঘরে ফেরা যাক্।"

"না।" আমি আপত্তি করি।

"তোমার ঠাণ্ডা লাগছে।"

"তোমার লাগছে না বুঝি?"

"আমি তো বলেছি সখা, তোমার চেয়ে আমার সহ্যশক্তি অনেক বেশি। তাছাড়া আমি কাল কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হেলে-দুলে বাসায় ফিরে যাব, যতক্ষণ ইচ্ছে বিশ্রাম করতে পারব। আর তোমাকে যে সকাল হতেই পরিক্রমায় বেরুতে হবে।"

"হোক্ গে। আর একটু বসি!" আমি তার অনুমতি চাই।

সে চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে কিছুক্ষণ। তারপরে বলে, "সখা, ভুল-ভ্রান্তি, আশা ও নিরাশা নিয়েই মানুষের জীবন। তবু বিচিত্র বিধাতার নিয়ম—মানুষ ইপ্সিতকে বার বার কাছে পেতে চায়, পেতে চায় একান্ত আপন করে। একবারও ভেবে দেখে না, এই পাওয়ার জন্য তাকে আরও বেশি দুঃখ পেতে হবে।"

"হঠাৎ একথা বললে কেন?" আমি তাকে প্রশ্ন না করে পারি না।

মানসী উত্তর দেয়, "আমার চোখের জল যে তোমার মনে কোন দাগ কাটতে পারে না।"

"এ কি তোমার অভিযোগ, না অভিমান?"

"দুই-ই। আমি জানি, তোমার কাছে ভালোবাসার চেয়ে ঔদাসীন্য বড়। তবু…" মানসী একবার থামে, বোধহয় চোখ মুছে অবুঝ অশ্রুকে সংযত করতে চায়। তারপরে আবার বলে, "তবু অবাধ্য মন বার বার তোমাকেই কাছে পেতে চায়। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েও আমি তোমাকে পেতে চাই সখা!"

"তুমি তো আমাকে পেয়েছো মানসী!"

"জানি না।" সে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে, "এ পাওয়া আর আমার চাওয়া এক কি না, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। তবু কাল তোমার চিঠি পাবার পর থেকে কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে আমি তোমাকে পেয়েছি। তাই সব লজ্জা ও ভয় বিসর্জন দিয়ে তোমাকে জন্মদিনের প্রণাম করতে ছুটে এসেছি এখানে। বলতে এসেছি—চিরদিনের জন্য তোমাকে কাছে পাবার অধিকার আমার নেই, তবু আমি চিরকাল তোমাকে ভালোবাসব। আমার শুভেচ্ছা সর্বদা তোমাকে ঘিরে থাকবে। এমন কি দূরের ঐ সপ্তর্ষির দেশ থেকেও আমি প্রীতিভরা চোখে তাকিয়ে থাকব তোমারই দিকে।"

॥ সতেরো ॥

মানসী মান-সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখেই বিদায় দিল আমাকে। গতরাতের সেই উদ্বেলিতা মানসীর সঙ্গে আজকের মানসীর মিল নেই কোন। আজকের মানসী একেবারে অন্য মানুষ। আজ আবার সে তেমনি উদাসী, তেমনি স্থির, তেমনি অচঞ্চল।

বৃন্দাবন কিংবা রাধাকুণ্ডের মতো আজ বিদায় বেলায় কিন্তু আমাকে একবারও সাবধানে থাকতে বলে নি মানসী। সে আমাকে জুতো পরতে বলে নি, ওষুধ খেতে বলে নি। শুধু সুযোগ পেয়ে একবার মনে করিয়ে দিয়েছে—কাল রাতে কিন্তু কথা দিয়েছো, পরিক্রমা শেষে বৃন্দাবনে ফিরে আসবে। সাতদিন আমার বাসায় থাকবে।

হেসে বলেছি—মাত্র সাতদিন?

—হ্যাঁ। মানসী গম্ভীরস্বরে জবাব দিয়েছে—সেই সাতদিন একদম আমার কথার অবাধ্য হতে পারবে না।

—অর্থাৎ সাতদিন শুধু বসে বসে খেতে হবে এবং শুয়ে শুয়ে ঘুমোতে হবে, এই তো?

—হ্যাঁ। কারণ, তোমার কিছুদিন ভাল খাওয়া ও বিশ্রামের প্রয়োজন।

—এবং তোমার সঙ্গে একমত না হয়েও আমি তোমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছি।

—সুতরাং তুমি আবার বৃন্দাবনে ফিরে আসছো?

—নিশ্চয়ই!

—আশ্রমবাসী না হয়ে আমার বাসায় উঠছো?

—হ্যাঁ!

একটা পরম-প্রশান্তির প্রলেপ প্রকট হয়ে উঠেছে মানসীর

মায়াভরা মুখখানিতে। সকৃতজ্ঞ চোখে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তারপরে বলেছে—এবারে রাধারমণের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। তিনিই নিরাপদে রাখবেন তোমাকে। হাতজোড় করে সে তার রাধারমণকে প্রণাম করেছে। তখন ওর চোখের দৃষ্টি বোধহয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে আঁচলে চোখ মুছেছে।

কেন যেন আমার কণ্ঠস্বরটাও কেঁপে গিয়েছিল। তাই কোনমতে বলেছি—আমি তাহলে চলি!

—এসো! মানসী একমুহূর্ত অপেক্ষা করেছে সেখানে। তারপরেই প্রায় ছুটে চলে গিয়েছে জানকী ও বৌদির কাছে। হাসিমুখেই তাদের বিদায় জানিয়েছে। সে বিদায় জানিয়েছে সেনবাবু বোসবাবু চক্রবর্তী ও আমার অন্যান্য সহযাত্রীদের। প্রণাম করেছে গুরুমহারাজ এবং সন্ন্যাসীদের।

আমরা এসেছি এগিয়ে, মানসী রয়েছে দাঁড়িয়ে। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে মান-সরোবরের তীরে—মানময়ী রাধারাণীর চোখের জল দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে যে সরোবর, যে সরোবরের তীরে বসে মানসী কাল রাতে চোখের জল ফেলেছিল।

আচ্ছা, মানসী কি এখনও চিনতে পারছে আমাকে? আমি যে তাকে পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আমি তো এখন আর আলাদা করে চিনতে পারছি না তাকে। মান-সরোবরের তীরে অপেক্ষমান বৃন্দাবনবাসীদের মাঝে মিশে গিয়েছে মানসী। তাই তো যাবে—সে যে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করছে।

আশ্চর্য, গতকাল এমন সময়ে ভাবতেও পারি নি, মান-সরোবরে মানসী আমার প্রতীক্ষায় বসে আছে। আবার কিছুক্ষণ আগেও যে মানসী ছিল আমার কাছে, সেকথাও এখন যেন ভাবতে পারছি না। মানসীর সান্নিধ্যে যে সামান্য সময়টুকু কেটে গেল তাকে এখন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে আমার। মাত্র একটি রাত। কিন্তু জীবনের বহু

রাতের সঙ্গে এ-রাতের কোন মিল নেই। বহু সহস্র রাত্রির স্বপ্ন হয়ে সে জেগে রইবে আমার মনে। ভালই হল, গতরাতের স্বপ্নময় স্মৃতি আমার আগামী পথ-পরিক্রমার পাথেয় হয়ে রইল।

সংকীর্তন-শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। আমি চলেছি একেবারে শেষ সারিতে। আমার কীর্তনে মন নেই, আমি ভেবে চলেছি মানসীর কথা। এটি ঠিক নয়। তীর্থপথে পদচারণার সময় তীর্থের ভাবনা দিয়েই মনকে ভরে রাখতে হয়, নইলে তীর্থদেবতা রুষ্ট হন।

মানসী-ভাবনা ছেড়ে তীর্থের কথা ভাববার চেষ্টা করি। এখন আমরা পানিগাঁও চলেছি। সেখানেই হবে আজ দুপুরের প্রসাদ। দর্শন ও প্রসাদের পরে আবার শুরু হবে পদ-পরিক্রমা। সন্ধ্যার আগেই পৌঁছব লোহবন—মান-সরোবর থেকে ৮ মাইল।

ওপারে মন-বৃন্দাবন, এপারে বন-বৃন্দাবন। আমি এখন বন-বৃন্দাবনের যাত্রী। কিন্তু মানসী কিছুক্ষণ পরেই ফিরে যাবে মন-বৃন্দাবনে। এতক্ষণে হয়তো তার কুলি এসে গিয়েছে। হয়তো সে এখন মান-সরোবর থেকে রওনা হয়েছে বৃন্দাবনের পথে।

ওপারের মতো বাড়ি-ঘর আর বাঁধানো পথ নেই এপারে। জনবসতিও চোখে পড়ছে না। এ অঞ্চলটিও মাট তহশিলের অন্তর্ভুক্ত। ছাতা, মথুরা, সাদাবাদ ও মাট—এই চারটি তহশিল নিয়ে মথুরা জেলা। মাট আয়তনে তৃতীয়—৩৩১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা আড়াই লক্ষের মত। কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে জনবসতির কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। যমুনার বেলাভূমি ছাড়িয়ে আমরা উঠে এসেছি ক্ষেতে—কড়াইশুঁটির ক্ষেত। আমরা অনেক ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ভাগ্যিস কাঁটা নেই। আগেই বলেছি ব্রজমণ্ডলের কাঁটা বিখ্যাত। হবেই তো—ধর্মের পথ যে চিরকালই কন্টকময়।

এখন আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাচ্ছি। বলা বাহুল্য, নিঃশব্দে নয়। সমানে কীর্তন চলেছে। কীর্তন ছাড়া পরিক্রমা হয় না।

আমাদের ডাইনে যমুনা। যমুনার ওপারে বৃন্দাবন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা গেলেও এখন আর যাওয়া যাবে না ওখানে। মানসীর সঙ্গে ক্রমেই আমার দূরত্ব বাড়ছে।

না, মানসীর কথা নয়, বৃন্দাবনের কথাও আর নয়, আমি ভেবে চলি এই পরিক্রমার কথা। বন-পরিক্রমা পূর্ণপ্রায়। আর মাত্র দু'টি দিন। আগামীকাল সকালে আমরা লৌহবন থেকে যাত্রা করব গোকুল-মহাবনের পথে। সেখান থেকে শুরু হবে প্রত্যাবর্তনের পালা। ফিরে যাব মথুরা। দর্শন করব ভূতেশ্বর মহাদেবকে। পূর্ণ হবে চুরাশি ক্রোশ বিস্তৃত মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা।

তারপরে বিদায়ের পালা। শুধু মধু-বৃন্দাবনের কাছ থেকে নয়, আমার শতাধিক সহযাত্রীর কাছ থেকেও। ভাবলেই মনটা ভারী হয়ে ওঠে। অপরিচিত এই মানুষগুলির সঙ্গে সুখে-দুঃখে জীবনের প্রায় পঁচিশটি দিন কেটে গেল। হাওড়া থেকে সেদিন যখন মথুরা রওনা হয়েছিলাম, তখন এঁদের কাউকেই চিনতাম না। অথচ আজ এই মুহূর্তে আমার কাছে এঁদের চেয়ে বেশি চেনা, বেশি আপন কেউ নেই। অথচ জানি অদূর ভবিষ্যতে এঁদের অধিকাংশই, হয়তো বা সকলেই, হারিয়ে যাবেন বিস্মৃতির অন্ধকারে।

তাই মনটা আজ সকাল থেকে ভারী হয়ে আছে। উপরন্তু আজ আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে জ্বর হবে। হতে পারে বৈকি। কাল রাতে খুবই ঠাণ্ডা লেগেছে। তাহলেও সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে আমাকে। আমি যে পথিক। সকল কালের সকল দেশের শ্রান্তিহীন পথিক। আমাকে যে পথের কথা বলতেই হবে।

পানির্গাও মান-সরোবর থেকে ২ মাইল। বৃন্দাবনের মাত্র সওয়া মাইল দক্ষিণ-পূর্বে যমুনার পূর্বতীরে অবস্থিত এই গ্রাম।

কথিত আছে, দুর্বাসা মুনি একবার একাদশীর পারণ করতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন। কৃষ্ণ তখন সখীদের সঙ্গে রাসলীলায়

ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্বাসাকে জানতেন। তাই রাসবিহারী তাড়াতাড়ি মহামুনির অভিপ্রায় জানতে চাইলেন।

মুনি বললেন—আমি একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করতে চাই। অতএব তোমার কাছে এসেছি।

বাধ্য হয়ে গোপীজনবল্লভকে গোপিনীদের শরণ নিতে হল। কৃষ্ণের নৌকোয় করে ব্রজাঙ্গনাগণ ব্রজে চলে গেলেন। দুর্বাসার জন্য উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁরা আবার ফিরে এলেন কৃষ্ণের কাছে। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বাসাকে ভূরিভোজন করালেন। সন্তুষ্টচিত্তে মহামুনি বিদায় নিলেন।

ব্রজবধূরা যে ঘাট দিয়ে যমুনা পেরিয়ে দুর্বাসার জন্য খাবার নিয়ে এসেছিলেন, সেই ঘাটই এখন পানিঘাট বলে পরিচিত। আর যেখানে বসে তাঁরা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্রব্য দিয়ে দুর্বাসা মুনিকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়েছিলেন, সেই জায়গাটি এখন পানিগাঁও। বৎসকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড আছে পানিগ্রামে। দুর্বাসা নাকি সেই কুণ্ডের তীরে বসেই তাঁর একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করেছিলেন।

জানি না গোবর্ধন মহারাজ ঐ কুণ্ডের তীরেই আমাদের প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন কিনা? করলেও এই র‍্যাশনিং-য়ের যুগে যে আমাদের তেমন উপাদেয় খাদ্য জুটবে না, সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। হায় রে কবে কেটে গেছে দুর্বাসার কাল!

আগেই বলেছি পানিগ্রাম-পরিক্রমা নিয়ে মান-সরোবর থেকে লোহবন হাঁটাপথে ৮ মাইল। হ্যাঁ, মোটরে চড়েও আসা যায় বৈকি। মধু-বৃন্দাবনের সব বনই এখন শহর হয়ে গেছে। মথুরা থেকে নিয়মিত বাস-চলাচল করে সর্বত্র। কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে বন-পরিক্রমা করছি। সুতরাং হাঁটা-পথের হিসেবই দিতে হবে।

পানিগ্রামের ৫ মাইল দক্ষিণে লোহবন। লোহবনের কেতাবী নাম লোহজঙ্ঘবন। কৃষ্ণ-বলরাম এই বনে গোচারণ করতেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে লোহজঙ্ঘ নামে জনৈক অসুরকে বধ করে-

ছিলেন। ভক্তরা বলেছেন, এই বন দর্শন করলে নাকি সর্বপাপ ক্ষয় হয়। তবু আমার সহযাত্রীরা কেন সে বন দর্শন করবেন বুঝতে পারছি না। কারণ এর আগেই অসংখ্য দর্শনের ভেতর দিয়ে তাঁরা এত পুণ্য অর্জন করেছেন যে, আজ তাঁদের আর কোন পাপই অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। অতএব আমার বিশ্বাস তাঁদের লৌহবন দর্শনের পুণ্যটুকু মাঠে মারা যাবে।

তাহলেও তাঁরা দর্শন করবেন এবং আমিও তাঁদের সহযাত্রী হব। শরীর খারাপ নিয়েও দর্শন করব গোপীনাথজীর মন্দির, স্পর্শ করব কৃষ্ণকুণ্ডের পুণ্যবারি। জানকী হয়তো তখন কুণ্ডের খানিকটা জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দেবে। কেন তা সে-ই জানে।

কৃষ্ণকুণ্ডের দক্ষিণে, একটু ওপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দির।

শুনেছি মন্দিরটি ছোট এবং জরাজীর্ণ। ভেতরে বেদির ওপরে শ্রীরাধাগোপীনাথের বিগ্রহ। একটু নিচে, মন্দিরের মেঝেতে ললিতা-সখীর দণ্ডায়মানা মূর্তি। আমরা দর্শন করব।

মন্দিরের চারিদিকে বড় বড় গাছ—নিমগাছই নাকি বেশি। নিম যে নিমাইয়ের বড়ই প্রিয়। বর্তমান ব্রজমণ্ডল তো ন'দের নিমাইয়েরই অবদান।

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে রয়েছে একফালি উঠোন। উঠোনের অপর প্রান্তে হনুমান মন্দির। পাশেই একখানি পাথর—তারই ওপরে নাকি শ্রীকৃষ্ণ লৌহজঙ্ঘ অসুরকে বধ করেছিলেন।

লৌহবন জায়গাটি শুনেছি বড়ই সুন্দর—শ্যামল-কোমল ছবির মতো একখানি গ্রাম। কেবল গ্রাম নয়, গ্রামের মানুষরাও নাকি ভারী সুন্দর, বিশেষ করে মেয়েরা—গৌরবর্ণা সুশ্রী ও স্বাস্থ্য-বতী। কিন্তু বলাই বাহুল্য তাদের দিকে তাকানো যাবে না। অপরিচিতাদের দিকে তাকালে পরিচিতারা যে বড়ই ক্ষুব্ধ হয়। জানকীকে ক্রুদ্ধ করা কোনমতেই সমীচীন হবে না আমার।

কেবল গ্রামের মেয়েদের দেখতে পাব না এমন নয়, আমরা যেতে পারব না বান্দীগ্রামে। কারণ লৌহবনে পৌঁছতেই আজ প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বান্দীগ্রাম সেখান থেকে অনেকটা দূর। শুনেছি সেখানে বান্দীকুণ্ডের পূর্বতীরে মন্দির। ভগবতীরূপিনী বান্দী ও আনন্দীর মূর্তি আছে মন্দিরে। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে তাঁরা দু'বোন ছিলেন মা-যশোদার দাসী। নন্দরাজের গো-শালা পরিষ্কার করা এবং ঘুঁটে দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ। সাধারণতঃ বোবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাপ-মা সেই মন্দিরে যান। তাঁরা ভক্তিভরে বান্দী ও আনন্দীর পুজো দেন। মূক ছেলে-মেয়েদের মুখে কথা ফোটে।

শুধু বান্দীগ্রাম নয়, লৌহবন থেকে যাওয়া যায় গড়ুই, আয়রে ও কৃষ্ণপুর, যেমন নন্দঘাট থেকে যাওয়া যেত জয়েতপুর, হাজরা, বারারা, বাজনা ও জেওলাই প্রভৃতি আরও বহু জায়গায়। এর প্রত্যেকটি কৃষ্ণলীলাস্থল। কিন্তু সময়াভাবের জন্য আমরা যেতে পারি নি। আমরা শুধু প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শন করছি।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী তাঁর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ব্রজমণ্ডলের ৩৩৪টি তীর্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—বারোটি বন, বারোটি উপবন, বারোটি প্রতিবন, বারোটি আদিবন, বারোটি তপোবন, বারোটি মোক্ষবন, বারোটি কামবন, বারোটি অর্থবন, বারোটি ধর্মবন ও বারোটি সিদ্ধবন নিয়ে ব্রজমণ্ডল।

ভক্তিরত্নাকর রচিত হয়েছে প্রায় আড়াই শ' বছর আগে। স্বাভাবিকভাবেই নরহরির উল্লেখিত বহু তীর্থ ইতিমধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মহাকালের করালস্পর্শ বাঁচিয়ে যে-সব তীর্থ আজও প্রকট রয়েছে, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। এবং মাত্র পঁচিশ দিনের পরিক্রমায় তাঁর প্রত্যেকটি দর্শন করা সম্ভব নয়।

বল্লভাচার্যের শিষ্যরা প্রতিবছর শরৎ-হেমন্তকালে দু'মাস ধরে ব্রজ-পরিক্রমা করেন। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ দেড়মাস সময় নেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরিক্রমাই সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত। তাহলেও তাঁরা

সাধারণতঃ একমাস সময় নিয়ে পরিক্রমায় বের হন। আর আমরা সেখানে মাত্র পঁচিশ দিনে পূর্ণ করব এই পরিক্রমা। সুতরাং সমস্ত তীর্থ দর্শন করা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে।

ভক্তিরত্নাকর ব্রজ-পরিক্রমার ওপরে রচিত প্রথম ভক্তিগ্রন্থ হলেও আমরা এইসব কৃষ্ণলীলাস্থলের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও ভক্তমাল (হিন্দী) গ্রন্থে। শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম দ্বাদশ-বন-পরিক্রমা করেছিলেন।* তাঁরই আদেশে শ্রীরূপ-সনাতন ও তাঁদের সতীর্থগণ লুপ্ত ব্রজমণ্ডলকে প্রকট করে তোলেন। মথুরার ব্রিটিশ জেলা-শাসক ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক এফ. এস. গ্রাউস (১৮৭২ খ্রীঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'Till the close of the sixteenth century except in the neighbourhood of the great thoroughfare there was only here and there a scattered hamlet in the midst of unclaimed woodland. The Vaishnava culture there first developed into the present form under the influence of Rupa and Sanatana, the celebrated Bengali Gosains of Vrindabana.'

অবশ্য গ্রাউসের এই মন্তব্যের মানে এ নয় যে, ব্রজমণ্ডলের সমস্ত তীর্থই ষোড়শ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। আলবিরুণি† তাঁর বিবরণে মথুরার উল্লেখ করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লক্ষ্মীধর মথুরামণ্ডলের যে পঁচিশটি তীর্থের কথা বলে গিয়েছেন, তার মধ্যে গোবর্ধন, বৃন্দাবন, ভাণ্ডীরবন, যমলার্জুন কুণ্ড, যমুনা ও রাধাকুণ্ড প্রভৃতির নাম রয়েছে।

যাক্ গে, যে কথা ভাবছিলাম—লৌহবন থেকে যেমন যাওয়া যায়

---

* মহাপ্রভুর আগে কবি জয়দেব ব্রজ-পরিক্রমা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সব কয়টি বন ভ্রমণ করেন নি।

† খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

গড়ুই আয়রে ও কৃষ্ণপুর, তেমনি বান্দীগ্রাম থেকে যাওয়া যায় বলদেব। স্থানীয়রা বলেন বলদেও বা দাউজী। কৃষ্ণের দাদা বলরামের লীলাভূমি বলে তাঁর নামেই জায়গার নাম হয়েছে।

বান্দীগ্রাম থেকে ৩ মাইল ও মহাবন থেকে ৫ মাইল দূরবর্তী সেই স্থানটি একটি সুপ্রাচীন শহর। ২৭°২৪´ উঃ অক্ষরেখা ও ৭৭°৪৯´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত ঐ জনপদ। মথুরা থেকে দূরত্ব প্রায় ১৪ মাইল। শহরটি সদাবাদ তহশিলের অন্তর্গত।

বলরামের বিখ্যাত মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঐ জনপদ। বর্তমান মন্দিরটি শ্যামদাস নামে দিল্লীর জনৈক ধনী ভক্ত শ'দু'য়েক বছর আগে নির্মাণ করে দিয়েছেন। মন্দিরের মূল-বিগ্রহ বলরামের সুদীর্ঘ দণ্ডায়মান মূর্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা বলেন মস্তবলাই। বলরামের পাশে রেবতী—ভারী সুন্দর মূর্তি।

মন্দিরের পশ্চিমে সুবিখ্যাত সঙ্কর্ষণকুণ্ড বা ক্ষীরসাগর—একটি বাঁধানো জলাশয়। কথিত আছে, বজ্রনাভ নাকি খনন করিয়েছেন সেই কুণ্ড। বলরাম তীর্থ-দেবতা হলেও সেখানে রয়েছে হরিদেব জগন্নাথ ও ব্রহ্মার মন্দির।

হাজার পাঁচেক স্থায়ী অধিবাসী নিয়ে বলদেব একটি ছোট শহর। থানা পোস্ট-অফিস ইন্‌সপেকশন-হাউস ধর্মশালা ও স্কুল প্রভৃতি সবই রয়েছে সেখানে।

একবার বলদেব মূর্তিটিকে গোকুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি।

শুনেছি সেকালে কয়েকজন ধর্মান্ধ আক্রমণকারী নাকি দাউজী মূর্তিটি ভাঙতে গিয়েছিল। কিন্তু তারা বলদেব মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র অন্ধ হয়ে যায়। তারপরে আর কোন পরধর্মদ্বেষী ভয়ে সে মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহস পায় নি। ফলে মধু-বৃন্দাবনে যে সামান্য কয়েকটি অক্ষত প্রাচীন মূর্তি আছে, ঐ দাউজী মূর্তিটি তাঁদের অন্যতম।

সুতরাং জানকী বলেছে—দাউজী-মূর্তি দর্শন করতেই হবে।

প্রশ্ন করেছি—কেমন করে?

জানকী উত্তর দিয়েছে—ব্রহ্মাণ্ডঘাটে তো আমরা দু'রাত থাকছি। দ্বিতীয়দিন সকালে সেখানকার দর্শন বাদ দিয়ে আমরা দু'জনে বাসে চড়ে বলদেব চলে যাব। বলদেব ব্রহ্মাণ্ডঘাট থেকে মাত্র ছ'মাইল।

—তাহলে তুমি ক্ষীরসাগরের পুণ্যবারি আমার শিরে সিঞ্চন করছো? আমি মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেছি।

জানকী গম্ভীর স্বরে জবাব দিয়েছে—নিশ্চয়ই।

আচ্ছা, জানকী তো আমার অধিকাংশ সহযাত্রীদের মতো ভক্ত কিংবা শিষ্যা নয়। তাহলে সে কেন কুণ্ডে নেমে আমার জন্য কুণ্ডবারি নিয়ে আসে, মন্দিরের প্রসাদী-ফুল কিংবা সিঁদুর এনে আমাকে দেয়? আর আমিই বা কেন তা গ্রহণ না করে পারি না?

পারি না, কারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপরে থাকে সংস্কারের প্রলেপ। সেই প্রলেপের মাঝেই মিশে আছে আমাদের কৃষ্ণভক্তি। যুক্তি-তর্ক দিয়ে কখনই সংস্কারমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমি বৈষ্ণব না হয়েও কৃষ্ণভক্ত। আর একথা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, এ-দেশের যে-কোন নাস্তিকের পক্ষেই সমান সত্য।

মনে পড়ছে এই পরিক্রমায় আসার কয়েকদিন আগে জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে যখন শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়াশুনা করেছিলাম, তখন পড়েছিলাম—

'Before the rise of Sankaracharya, the Vaishnava mystics and saints, known as Alvars in the south, had invested *bhakti* with the attributes of earthly love. When *Bhagavata Purana*, one of the literary masterpieces of the world, recreated Sri Krishna as the supremely loveable child, youth, lover-God Himself—*Sri Krishnastu Bhagavan Svayam*, out

of the statesman, World Teacher and *avatara* of Epic and the earlier Puranas, it was accepted as the gospel of *bhakti* throughout the country···

'When Radha came to be associated with Sri Krishna in the popular imagination, the *bhakti* movement received a still more powerful impetus. About A. D. 1150, Nimbarka founded a new school in Andhradeṣa, stressing the *bhakti* both of Srikrishna and Radha···'*

'The Radha cult preached by him was further stressed by Caitanya in the sixteenth century and it is still the most popular aspect, of the North Indian Vaishnavism.'†

ঐ বইতেই† শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'Whatever may be the value of explanation offered by Vaishnavas, it is impossible to ignore the vulgar elements in these erotic pictures and their influence upon the morals of the common people. This is sufficiently indicated by the fate which overtook Vaishnavism at no distant date in future, when a class of this sect came to be a byword for sexual immorality···'

অথচ শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'চিত্রে জয়দেব ও গীত-গোবিন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায় এই একই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'সমাজ যখন

---

* Dr. K. M. Munshi

† History & Culture of Indian People (Vol. 5) General Editor : Dr. R. C. Majumder.

ধীরে ধীরে ভেতর থেকে নির্বীর্য হয়ে আসতে থাকে, তার সমস্ত কর্ম উৎসগুলো শুকিয়ে আসতে থাকে, তখন অবনতির মুখে সমাজে আর একবার দেখা দেয় কাব্য আর সাহিত্য-প্রতিভার উন্মেষ, সমাজের যা কিছু অবশিষ্ট শক্তি তখন কাব্য আর রসানুভূতির মধ্যে খোঁজে আত্মপ্রকাশের পথ।'

তাঁর মতে মহাকবি জয়দেব যখন 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন তখন 'ঠিক এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বাংলার সমাজে। ধর্ম তখন বিকৃত হয়ে সমাজের অধোগতিকে সংগোপনে সাহায্য করে চলছিল। সেই প্রতিক্রিয়া থেকে ভাঙ্গনধরা সমাজকে রক্ষা করে তার মধ্যে নতুন ধর্মোন্মাদনার জোয়ার আনার মতো শক্তি বল্লাল সেন বা তাঁর পুত্রের ছিল না। সে কাজের জন্যে দরকার বিরাট পুরুষের, অবতার পুরুষের। এবং সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের উদার পুনরুত্থান নিয়ে এলেন পরবর্তী যুগে শ্রীচৈতন্য। কবি জয়দেব তাঁর অপরূপ প্রেম-সাধনায় সেই মহাপুরুষের আবির্ভাব-পথকে তৈরি করে গেলেন। দেহ-সাধনার ব্যভিচারের মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ দেহসর্বস্ব যে অধোগতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, কবি জয়দেব সেখানে দেহাতীত দিব্য প্রেমের আদর্শে সমাজের চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন।'

তাই আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থ আজও পরমশ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করি এবং বৈষ্ণব না হয়েও কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করতে আসি।

আসি কারণ, শ্রীকৃষ্ণ কেবল বৈষ্ণবদের আরাধ্য নন, তিনি ভারতীয় জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে গিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়েও আমরা মনে করি :

'The concepts of the life and teachings of Krsna have probably exerted a more profound influence on the shaping of Indian art, literature, religion and philosophy than any other single idea···

'It is difficult for the present writer* to subscribe to the views of those historians who refuse to believe anything to have existed on earth until and unless its remains have been unearthed by excavations…'

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন—

'কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র আমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন ;—"the Wisest and Greatest of the Hindus."

আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি, যুক্ত করে, বিনীতভাবে…আমার সঙ্গে বলুন—

"নাকারণাৎ কারণাদ্ধা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম" ॥'

রাধা ছাড়া কৃষ্ণ-চিন্তা অপরাধ। অতএব এবারে একটু রাধার কথা ভাবা যাক্। শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ রাধা সম্পর্কে বলেছেন, 'শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ও পদ্মপুরাণে

* Dr. Bimanbehari Majumdar—'Krshna in History & Legend.'

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তথায় শ্রীরাধাই রাসেশ্বরী। "এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বাংলার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙালী বৈষ্ণব-কবিগণ, বাংলার জাতীয় সঙ্গীত, বাংলায় যাত্রা-মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ।" কিন্তু এই পুরাণে উচ্চতর তত্ত্বকথার সঙ্গে সঙ্গে এমন কামায়ন-প্রচুর বর্ণনা-বাহুল্য প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহার মধ্য হইতে 'মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী'কে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। প্রকৃত রাধাঠাকুরাণীকে আমরা পাইয়াছি—শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় এবং তদনুগত গোস্বামিপাদগণের অপূর্ব লীলাব্যাখ্যায়—

রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে,
যদি গৌর না হ'ত।'*

* 'শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম'

॥ আঠারো ॥

যাত্রার যতি আসন্ন। আজ আমাদের বন-পরিক্রমার দ্বাবিংশ দিবস। কিছুক্ষণ আগে আমরা লৌহবন থেকে গোকূল-মহাবনের পথে যাত্রা করেছি। পথে দর্শন করব রাবেল—শ্রীরাধিকার জন্মভূমি।

মধু-বৃন্দাবনে দু'টি গোকুল। একটি শুধুই গোকুল, আর একটি গোকুল-মহাবন। দু'য়ের মাঝে পার্থিব দূরত্ব সামান্য—মাত্র মাইল-খানেক। কিন্তু নৈতিক দূরত্ব বহু যোজন। গোকুল বল্লভী-বৈষ্ণবদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। আর গোকুল-মহাবন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবরা আমাদের যাত্রার আয়োজন করেছেন। অতএব আমরা বল্লভীদের গোকুলে প্রবেশ করব না। পাশ কাটিয়ে চলে যাব।

কিন্তু মনে মনে গোকুলের কথা ভাবতে বাধা নেই কোন। আমি তাই ভেবে চলি —

গোকুল ও গোকুল-মহাবন অর্থাৎ নতুন ও পুরনো গোকুল মথুরার বিপরীত দিকে যমুনার পূর্বতীরে অবস্থিত এবং সদাবাদ তহশিলের অন্তর্গত। সদাবাদ মথুরা জেলা পূর্ব-প্রান্তিক তহশিল। এই তহশিলের পর থেকেই এটওয়া জেলা আরম্ভ।

যমুনার বাঁ তীরে গোকুল। ২৭°২৭´ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭°৪৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহরটি যমুনার ওপার অর্থাৎ মথুরার দিক থেকে বড়ই সুন্দর দেখায়। মথুরা থেকে গোকুল মাত্র ৪ মাইল। মথুরা-এটওয়া পাকা রাস্তার ওপরে অবস্থিত এই শহরটি। হাজার আড়াই লোকের বাস।

বর্তমান গোকুল শ্রীবল্লভাচার্যের (১৪৭৯ —১৫৩১ খ্রীঃ) অবদান। তাঁর আগে ওখানে কোন জনপদ ছিল না। তিনি কিছুকাল বাস

করেছেন সেখানে। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথ গোকুলকে বল্লভী-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেন।

গোকুলের প্রাচীনতম মন্দির হল গোকুলনাথ মদনমোহন ও বিঠ্‌ঠলনাথজী। বিঠ্‌ঠলনাথ মন্দিরটি সম্ভবত ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে। আরও দু'টি বিখ্যাত মন্দির আছে সেখানে। ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি দ্বারকানাথ মন্দির ও ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বালকৃষণ মন্দির। মহাদেবের দু'টি মন্দিরও আছে গোকুলে। যোধপুরের রাজা বিজয় সিং ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করে দিয়েছেন। তাছাড়া গোকুলে দু'টি বেশ বড় কুণ্ড আছে।

গান্দিপুরা দরওয়াজা বা তোরণ দিয়ে গোকুল শহরে প্রবেশ করতে হয়। আমরা সে তোরণ অতিক্রম করছি না। অতএব গান্দিপুরার কথা থাক্।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গোকুল ধ্বংস করবার জন্য আহম্মদ শাহ্ আবদালী তাঁর সৈন্যদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোকুল-মঠের চার হাজার নিরস্ত্র নাগা-সন্ন্যাসী সদর্পে বাধা দিয়েছিলেন তাদের।

যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা সেদিন প্রমাণ করেছিলেন, প্রাণের চেয়ে আদর্শ বড় এবং নৈতিক বল পশুশক্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁরা সেদিন ত্রিশূল ও চিমটার সাহায্যে দুরানীর কামানের শব্দকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। দু'হাজার সন্ন্যাসী নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে দুরানীর ছ'হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যকে হত্যা করেছিলেন। তাঁরা সেদিন নাদির শাহের সুযোগ্য অনুচর আহম্মদ শাহ আবদালীর সকল অহঙ্কার ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীদের এর চেয়ে বড় গৌরবময় যশো-গাঁথা আর কিছু আছে বলে জানা নেই আমার।*

গোকুল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শহরের মর্যাদা লাভ করেছে। ডাক ও তারঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, ছেলে-মেয়েদের স্কুল, পুলিশ ফাঁড়ি ও

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য

আটটি ধর্মশালা আছে গোকুলে। আশ্বিন মাসে বেশ বড় মেলা হয় —রামলীলার মেলা।

বল্লভীরা বলেন তাঁদের গোকুলই আদি-গোকুল। আর গৌড়ীয়রা বলেন গোকুল-মহাবনই নন্দ-যশোদার প্রকৃত গোকুল। অর্থাৎ নবদ্বীপ এবং মায়াপুরের সেই কলহটি বৃন্দাবনেও প্রকট।

যে মোটর-পথটি দিয়ে আমাদের সংকীর্তন-শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে, সে পথটি যমুনা পেরিয়ে চলে গেছে মথুরা। যমুনার ঐ পুল পেরিয়েই আগামীকাল আমরা মথুরা ফিরে যাব।

কিন্তু না, ফেরার কথা এখন নয়। ফেরার কথা ভাবলেই মনে পড়ে গুরুমহারাজ মথুরা মহারাজ কেষ্টপ্রভু নরেনপ্রভু ও জানকীর কথা। সেনবাবু বৌদি বোসবাবু চক্রবর্তী দিদিমা ও আরো অনেকের কথা। এদের সবার কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়। শুধু এই পঁচিশ দিনের স্মৃতি কিছুকাল আমার মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তারপরে ধীরে ধীরে সেই উজ্জ্বলতা কমতে থাকবে। অবশেষে একদিন তা একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

"একি! ওদিকে কোথায় চললেন?"

জানকীর প্রশ্নে যেন সম্বিৎ ফিরে পাই। সামনে তাকাই। তাই তো, কেউ যে নেই সামনে। সবাই মোটর-পথ ছেড়ে পাশের পায়ে-চলা পথে নেমে গিয়েছে।

ঢোঁক গিলে কোনমতে জবাব দিই, "একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চলো, যাওয়া যাক্।" আমি পথ পরিবর্তন করি।

"আপনার কি হয়েছে?" আমার সঙ্গে চলতে চলতে বিনা প্রস্তাবনায় প্রশ্ন করে জানকী।

একটু হেসে বলি, "কি হবে আবার? কিছুই হয় নি তো!"

"তাহলে আপনার মুখখানি এমন শুকনো লাগছে কেন? চোখ-দু'টি লাল? আর আজ আপনি এমন আস্তে আস্তেই বা পথ চলছেন কেন?"

সংসারে মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বোধহয় সবচেয়ে কঠিন। জানকী যত চঞ্চল আর অস্থিরই হোক্, সে মেয়ে। সুতরাং তার চোখে আমার শারীরিক অবস্থাটা ঠিক ধরা পড়েছে।

তবু ধরা দিতে চাই না। একটু হেসে বলি, "রোদের জন্য আমার মুখখানাকে তোমার শুকনো বলে মনে হচ্ছে। কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি, তাই হয়তো বা আমার চোখদু'টো একটু লাল হয়ে থাকবে। আর আমি আজ ইচ্ছে করেই একটু আস্তে হাঁটছি। আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে।"

"ঠাকুর করুন, তাই যেন থাকে।" জানকী আশ্বস্ত হয়। সে এগিয়ে যায়। আমি তাকে অনুসরণ করি।

শুধু জানকীকে নয়, আমি সহযাত্রীদের সকলকেই অনুসরণ করছি। সবাই এগিয়ে গেছে, আমি একা পড়ে রয়েছি-পেছনে।

কেন এমন হল? শরীরটা তো ক'দিন থেকেই খারাপ। কিন্তু আজ হঠাৎ জ্বরটা বেড়ে গেল কেন? আর যে মাত্র দু'টি দিন। বৃন্দাবনচন্দ্র এই দু'টো দিন আমাকে ভাল রাখতে পারলেন না! তিনি কি আমাকে শেষ পথটুকু পরিক্রমা করতে দেবেন না? কেন? আমি ভক্ত নই, আমি বৈষ্ণব নই—তাই কি তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন?

কিন্তু আমি তো কখনও তাঁকে অবিশ্বাস করি নি, অশ্রদ্ধা করি নি। পূজারী ও পাণ্ডাদের অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশ্বাস না করেও আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। ভক্তরা তাঁকে বলেন ভগবান, আমি বলি পরমপুরুষ। তাঁরা বলেন নারায়ণ, আমি বলি নর-নারায়ণ। তাঁদের কাছে তিনি মানুষরূপী ভগবান, আমার কাছে তিনি ভগবান-রূপী মানুষ এবং বিশ্ব-ইতিহাসের মহোত্তম মহামানব। তাহলে তিনি কেন আমার প্রতি বিরূপ হবেন?

না, না, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হন নি আমার ওপরে। কেন ক্রুদ্ধ হবেন? লোভ মোহ কাম ক্রোধকে বিসর্জন দিয়েছিলেন বলেই

তো তিনি পতিত-পাবন হরি, তিনি বিপদভঞ্জন, গোকুলরঞ্জন। তিনি অগতির গতি, বাঞ্ছাকল্পতরু, জীবের জীবন। তিনি পরমকরুণাময়।

অত্যধিক পরিশ্রম ও অনিয়মের জন্য আমার একটু জ্বর হয়েছে, শরীরটা দুর্বল লাগছে। কিন্তু করুণাময় কৃষ্ণের কৃপায় আমি নিশ্চয়ই সুস্থ হয়ে উঠব, নির্বিঘ্নে পূর্ণ করতে পারব আমার মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা।

কোন পথই অন্তহীন নয়। দুর্বল শরীর নিয়েও এক সময় আমি সেই পায়ে-চলা পথের প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। এলাম রাবেল গ্রামের শেষ-সীমায়—যমুনার তীরে। লৌহবন থেকে রাবেল ২ মাইল।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন রাবেলই শ্রীরাধিকার জন্মস্থান। বর্ষাণার পণ্ডিতসমাজ অবশ্য একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, বর্ষাণাই রাধারাণীর জন্মস্থান। অথচ শ্রীরূপ গোস্বামী এবং রঘুনাথ তাঁদের কোন গ্রন্থে বর্ষাণার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মনে করেন যে, রাধা যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মহারাজা বৃষভানু রাবেল নগরীর অধীপতি ছিলেন। পরে কংসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নন্দরাজ যখন গোকুল থেকে নন্দগ্রামে চলে যান, তখন তিনিও বর্ষাণায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।

সেদিন রাবেল সম্পর্কে ভক্তি মহারাজ আমাকে বলেছেন—এখন যেখানে রাধারাণীর মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই নাকি ছিল বৃষভানুর রাজপ্রাসাদ। একদিন মহারাণী কীর্তিদা যখন যমুনার ঘাটে স্নান করছিলেন, তখন একটি পদ্মের ওপর ভেসে শিশু-রাধা তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু রাধা তখন মুদ্রিত-নয়না।

তাঁর সেই চোখ বুজে থাকার কারণ, কীর্তিদা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—প্রভু, তুমি আমাকে একটি কন্যা দাও, আমি তাকে তোমার ভোগে লাগাব।

তাই ভগবান কীর্তিদাকে একটি কন্যা দান করলেন, কিন্তু সে কন্যা জন্মলাভের পরে জগতের আলো দেখতে পেলেন না।

এদিকে কীর্তিদার মেয়ে হয়েছে শুনে মা-যশোদা গোপালকে নিয়ে গোকুল থেকে রাবেলে এলেন। গোপালকে মেঝেতে বসিয়ে যশোদা কীর্তিদার সঙ্গে গল্প করতে থাকলেন। সেই ঘরেরই অপর প্রান্তে মুদ্রিত-নয়না শিশু-রাধিকা শায়িতা ছিলেন। যশোদার অলক্ষ্যেই গোপাল হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছলেন রাধার কাছে। তিনি রাধাকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেললেন রাধারাণী। জন্মলাভের পরে কৃষ্ণবল্লভা প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন।

যমুনার কোল ঘেঁষে মন্দির---রাবেলের রাধারাণীর মন্দির। এপারে রাবেল ওপারে মথুরা। এপারে শ্রীরাধার জন্মস্থান, ওপারে শ্রীকৃষ্ণের। দু'য়ের মাঝে যমুনা—প্রেমযমুনা, অনন্তকাল ধরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গান গেয়ে চলেছে।

এখানেও যমুনার বুক জুড়ে বালি। কিন্তু ক্ষীণ একটি টল্‌টলে ধারা কলকল ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে মন্দিরের পাশ দিয়ে। এ ধারার ক্ষয় নেই। প্রেমলীলার লয় নেই।

খুব বড় নয়, তবে ভারী সুন্দর মন্দির—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। কুশল শেঠ নামে জনৈক গুজরাটী বণিক নির্মাণ করে দিয়েছেন এই মন্দির। মাত্র কয়েক বছর আগে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। তাই এমন ঝক্‌ঝকে।

সহযাত্রীদের অনেকেই ইতিমধ্যে দর্শন সেরে নিয়েছেন। তাঁরা এখানে-ওখানে গাছের ছায়ায় কিংবা মন্দির-চত্বরে বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন। হেমন্তের দিন হলেও খুব কড়া রোদ উঠেছে, বেশ গরম লাগছে।

বাঁধানো চত্বর পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠে আসি। গর্ভ-মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণ বৃষভানু ও কীর্তিদার মূর্তি। দর্শন ও দণ্ডবৎ করি। তারপরে মন্দির প্রদক্ষিণ করে নেমে আসি চত্বরে।

যমুনার তীরে একটি কেলিকদম্ব গাছের ছায়ায় আসন পেতেছেন মথুরা মহারাজ। বোসবাবু চক্রবর্তী বণিকপ্রভু জানকী—অনেকেই রয়েছে। মথুরা মহারাজ বোধহয় বলছেন কিছু।

ওখানেই যাওয়া যাক্। বিশ্রামও হবে, আবার পুণ্যকথাও শোনা যাবে। আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াই সেই কদম্বতলে।

জানকী তাকায় আমার দিকে। বসতে ইশারা করে। আমি বসে পড়ি বোসবাবুর পাশে।

মথুরা মহারাজ বলে চলেছেন—

"এখানেই ছিল রাধারাণীর পিতা বৈশ্যরাজ বৃষভানুর রাজপ্রাসাদ। কংসের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে গোকুলরাজ নন্দ যখন নন্দগ্রামে চলে যান, তখন তিনিও এখান থেকে বর্ষাণায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। আপনারা বর্ষাণা দর্শন করেছেন।"

আমরা মাথা নাড়ি। মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "এই হচ্ছে শ্রীরাধিকার পুণ্য জন্মভূমি। এই পরমতীর্থ দর্শন করে আজ ধন্য হল আমাদের জীবন।"

"আপনি রাধারাণীর জন্ম-বৃত্তান্ত বলুন মহারাজ!" জানকী তাগিদ দেয়।

"বলব রে বলব।" মথুরা মহারাজ হেসে জানকীকে বলেন, "বলব বলেই তো সবার সঙ্গে কীর্তন না করে, তোর সঙ্গে চলে এলাম এখানে।" একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি বলতে শুরু করেন—

"তোরা সকলেই জানিস, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধিকার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত দেবীভাগবত ও পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে রাধারাণীর কথা আছে।

"ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোলকের রাসমণ্ডলে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন সহসা তাঁর দেহের বাঁ-দিক থেকে এক ষোড়শবর্ষীয়া মনোহারিণী কন্যা আবির্ভূতা হলেন। তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে পুজো করলেন। তারপরে গিয়ে রত্নসিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসলেন।

"আবির্ভূতা হয়েই এই কন্যা কৃষ্ণের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন বলে, দেবতারা তাঁর নাম রাখলেন রাধা। তিনি কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী। প্রাণ থেকে উৎপন্না বলেই তিনি কৃষ্ণের প্রাণাধিকা। রাধারাণী জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর চেয়েও সৌন্দর্যবতী।"

মথুরা মহারাজ থামতেই জানকী ফরমাশ করে, "এ তো গেল গোলকের কাহিনী, এবারে ভূলোকের কথা বলুন।"

জানকীর দিকে তাকিয়ে মথুরা মহারাজ মৃদু হাসেন। তারপরে বলেন, "সেকথাও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেই বলা হয়েছে।"

"কি বলেছেন পুরাণকার?"

"বলেছেন যে—গোলকের রাধাই বৃন্দাবনের রাধারাণী। পুরাণকার বলেছেন, একদিন গোলকবিহারী কৃষ্ণের বৃন্দাবনের রম্যবনে রমণ করবার ইচ্ছে হল। তাই তিনি দু'টি রূপে বিভক্ত হলেন—দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণরূপ, বামাঙ্গে রাধারূপ। পরম-রমণীয়া রাধারাণী রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সঙ্গে রমণ করতে শুরু করলেন। হরিপ্রিয়া রমণোৎসুক পতির মনোবাসনা পূর্ণ করতে রাসমণ্ডলে ধাবিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর নাম রাধা। কারণ ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণ করলেই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়, আর 'ধা' শব্দ উচ্চারণ করলে হরি-পদে ধাবমান হয়।"

"হয়ে গেল!" জানকীর কণ্ঠে বিস্ময়।

মথুরা মহারাজ বলেন, "না, আরও একটি কাহিনী আছে।"

"বলুন না মহারাজ!"

"বলছি রে বলছি। বুড়োমানুষ, একটু দম নিতে দে।"

জানকী বোধহয় লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে।

একটু বাদে মথুরা মহারাজ আবার বলতে শুরু করেন—

"আপনারা সবাই জানেন, আমাদের কৃষ্ণ-ভগবান বড়ই ভক্ত-বৎসল। কোন ভক্ত তাঁর সঙ্গলাভ করার কামনা করলে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তিনি কুব্জা ত্রিবক্রাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি, প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি চন্দ্রাবলীকে।"

আমরা মাথা নাড়ি।

মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "একবার বিরজা নামে এক পরমাসুন্দরী ব্রজগোপী তাঁর সঙ্গলাভ করতে চাইলেন। স্বভাবতই তিনি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বিরজাকে নিয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনের শতশৃঙ্গ পর্বতে গমন করলেন। সেখানে তিনি বিরজার সঙ্গে বিহার করতে থাকলেন।

"খবরটা কিন্তু রাধার অজানা রইল না। চারজন দূতী গিয়ে তাঁকে কৃষ্ণ-বিরজা বিহারের সংবাদটি দিলেন।

"আর যায় কোথায়? রাধা রেগে আগুন হলেন। তিনি অষ্টসখীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শতশৃঙ্গ পর্বতে ছুটে এলেন।

"কৃষ্ণের দূতরাও তো আর কম চতুর নন তাঁরাও তাড়াতাড়ি গিয়ে কৃষ্ণকে জানালেন, রাধা আসছে।

"বিরজা-বিহার মাথায় উঠল। বিরজাকে সেখানেই একা ফেলে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে গা-ঢাকা দিলেন। রাধার ভয়ে বিরজা আত্মহত্যা করলেন।

"সেদিন কৃষ্ণ কোনমতে পালিয়ে বাঁচলেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে চিরকাল তো আর রাধার কাছ থেকে পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই একদিন তিনি অষ্টসখাকে সঙ্গে করে রাধার সামনে উপস্থিত হলেন।

"রাধা অশ্রাব্য ভাষায় কৃষ্ণকে তিরস্কার করতে থাকলেন। কৃষ্ণ কোন প্রতিবাদ করলেন না। তিনি নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"ভক্ত-সুদাম কিন্তু কৃষ্ণনিন্দা সইতে পারলেন না। তিনি প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"আগুনে ঘি পড়ল। রাধা আরও রেগে গেলেন। এবং তাঁর সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সুদামের ওপরে। তিনি তাঁকে অভিশাপ দিলেন—অসুরযোনি লাভ কর।

"সুদামও ছেড়ে দেবার পাত্র নন, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে রাধাকে শাপ

দিলেন—তুমিও গোলক থেকে ভূলোকে গিয়ে গোপকন্যা রূপে জন্মগ্রহণ কর।

"এই সেই ভূলোক।" একবার থামলেন মথুরা মহারাজ। তারপরে আবার বলেন, "এখানে, এই রাবেল নগরীতে এক ভাদ্র-শুক্লাষ্টমীতে বৈশ্যবর বৃষভানুর পত্নী কীর্তিদার গর্ভে রাধারাণী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই এখনও সেই পুণ্যতিথিতে এখানে মেলা বসে। দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা সমবেত হন এই পুণ্যতীর্থে। আজ সেই মোক্ষক্ষেত্রে পদার্পণ করতে পেরে আমাদেরও পরমপুণ্য সঞ্চয় হল।"

রাবেল থেকে আমরা মহাবনে এলাম—গোকুল-মহাবেন। শ্রীরাধার জন্মভূমি থেকে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-নিকেতনে।

এসেছি বটে, কিন্তু পথ চলতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে আমার। জ্বরটা জেঁকেই এসে গেছে। কপালের শিরাগুলো দপ দপ করছে। উষ্ণ নিঃশ্বাস বইছে। তবু ধীরে ধীরে পথ চলেছি।

আর কতটুকুই বা পথ? এখানকার দর্শন শেষ হলেই আমরা রওনা হব ব্রহ্মাণ্ডঘাট। মাত্র মাইলখানেক পথ। সেখানেই শেষ হবে আজকের পদযাত্রা। শুধু আজকেরই বা বলছি কেন? প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডঘাটেই শেষ হবে আমাদের ব্রজমণ্ডল দর্শন। তারপরেই প্রত্যাবর্তনের পালা। তাই কষ্ট করেও পথ চলি আর মনে মনে ভাবতে থাকি মহাবনের কথা—

মহাবন একটি ছোট শহর। ব্রহ্মাণ্ডঘাট সে শহরের উপকণ্ঠে। ২৫°২৭´ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৭°৫৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় যমুনার বামতীরে এই শহর অবস্থিত। মথুরা থেকে দূরত্ব মাত্র সাড়ে আট মাইলের মতো। হাজার পাঁচেক লোকের বাস। নিয়মিত বাস চলাচল করে।

কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কিছু আগে নন্দরাজ এখানে প্রথম জনপদের পত্তন করেন। পরবর্তীকালে নন্দরাজ নন্দগ্রামে চলে

যাবার পরে সম্ভবত সেই জনপদ গভীর বনে পরিণত হয়। আর তখন থেকেই মহাবন নামটি প্রচলিত হয়েছে।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদ মহাবন আক্রমণ করেন। দু'হাজার বছর ধরে অসংখ্য শিল্পী ও স্থপতির সাধনায় গড়ে ওঠা মহাবন তখন একটি মন্দিরময় সমৃদ্ধ নগরী। মহাবনের রাজা কুলচন্দ্র জন্মভূমি ও ধর্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ষাট হাজার বৈষ্ণবী সেনা জীবন উৎসর্গ করেও মহাবন রক্ষা করতে পারলেন না। সত্যাশ্রয়ী কুলচন্দ্র প্রিয়তমা মহিষীকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করলেন। শতাধিক হাতির পিঠে মহাবনের মহামূল্যবান ধন-রত্ন বোঝাই করে মাহমুদ মথুরার দিকে অগ্রসর হলেন। মহাবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

মহাবনের সংগ্রামী মানুষ কিন্তু সেই ধ্বংসলীলার কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁরা তাঁদের প্রিয়নগরীকে আবার গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন। এবং তাঁদের সে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা বিফল হল না। মহাবন আবার ধনে-জনে পূর্ণ হয়ে উঠল।

১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিস বিদ্রোহী কলিঞ্জরের-এর বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তারা এই মহাবনে এসে জড়ো হয়েছিল। সম্ভবত ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মারঘুব নামে সম্রাট বাবরের একজন ক্রীতদাস মহাবনের সুবেদার ছিলেন। অর্থাৎ তখন মহাবন মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত।

১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাজাহান শিকার করতে এ অঞ্চলে আসেন এবং চারটি বাঘ মারেন। অর্থাৎ তখনও মহাবনের কোন কোন অংশ হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ আহমদ শাহ আবদালী যমুনা অতিক্রম করে মহাবনে আসেন এবং কিছুকাল এখানে বাস করেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে

করতে যশোবন্ত রাও হোলকারকেও যমুনা পেরিয়ে মহাবনে আসতে হয়েছিল।

মহাবন শহরের অনেকটা জুড়েই পাহাড়। তবে সে পাহাড়-গুলিকে টিলা বলাই ভাল। সবগুলো টিলা কিন্তু প্রাকৃতিক নয়; মানুষের তৈরি টিলাও আছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে মাটি দিয়ে তৈরি তেমনি একটি টিলার ওপরেই নির্মিত হয়েছিল কেল্লা। মেবাররাজ রাণা কাটিরা নাকি নির্মাণ করেছেন সেই দুর্গ।

কথিত আছে, মুসলমানদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাটিরা মেবার থেকে মহাবনে পালিয়ে আসেন। দিগপাল তখন মহাবনের রাজা। কাটিরা ছিলেন চতুর লোক। তিনি তাঁর ছেলে কান্ত কানওয়ারের সঙ্গে পুত্রহীন দিগপালের কন্যার বিবাহ দেন। কাটিরার উদ্দেশ্য সফল হয়। যথাসময়ে কান্ত মহাবনের সিংহাসনে বসেন। কান্ত খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর পারিবারিক পুরোহিতকে সমস্ত মহাবন শহর দান করে দেন। এই পুরোহিত ছিলেন চৌধুরী বংশীয়। আজও তাঁর বংশধরগণ মহাবনের বাসিন্দাদের কাছ থেকে খাজনা পেয়ে থাকেন। এই খাজনাকে বলে 'থোক্ চৌধিয়ান'।

সম্রাট আলাউদ্দিন খিল্‌জি (খ্রীঃ ১২৯৬-১৩১৬) বহু চেষ্টা করেও যখন মহাবনের প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না, তখন তিনি সেনাধ্যক্ষ সঈদ ইয়াহিয়া ও কয়েকজন সৈন্যকে হিন্দু তীর্থযাত্রিণীর ছদ্মবেশে এখানে পাঠিয়ে দিলেন। রাণা যখন শ্যাম-লালা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পুজো দেখছিলেন, তখন অতর্কিতে তারা নিরস্ত্র ও অপ্রস্তুত রাণাকে হত্যা করে মহাবন দখল করে। সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট ইয়াহিয়াকে মহাবন শহরের এক-তৃতীয়াংশ দান করেন। আজও সেই অংশ থেকে ইয়াহিয়ার বংশধরগণ খাজনা পেয়ে থাকেন। এই খাজনাকে বলে 'থোক্ সঈদত্'।

গোকুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্যাম-লালা। বল্লভীরা বলেন সেখানেই মা-যশোদা যোগমায়াকে কন্যারূপে জন্মদান করেছিলেন।

আর বসুদেব সেখানেই নবজাত কৃষ্ণকে রেখে যোগমায়াকে নিয়ে মথুরায় ফিরে গিয়েছিলেন। আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মায়েরা তাঁদের ছ'দিনের সন্তানকে নিয়ে সেখানে আসেন। সন্তানের কল্যাণ কামনায় শ্যাম-লালার মন্দিরে পুজো দেন। তাই এই মন্দিরের স্থানীয় নাম 'ছঠি পালনা' অর্থাৎ ছঠি পূজার স্থান।

বলা বাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্যাম-লালার স্থান-মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। আর শুধু তাঁদের কথাই বা বলি কেন, শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক নন্দলাল দে পর্যন্ত বলেছেন—'Mahavana or Purana Gokula is six miles from Mathura, and contains places associated with the early life of Krishna.' তিনি বল্লভীদের গোকুলকে বলেছেন, 'New Gokula.'*

মহাবনের বৃহত্তম ও অন্যতম মন্দির হল মথুরানাথের মন্দির। প্রসাদের পরে আমাদের সেখানে যাবার কথা আছে। কিন্তু আমি পারব কি? শরীরটা যে বড়ই খারাপ লাগছে।

না, না, শরীরের ভাবনা কিছুতেই নয়। মনকে বিশ্বাস নেই। সে সুবিধে পেলেই আমাকে আরও দুর্বল করে তুলবে। যেভাবেই হোক্ আমাকে পরিক্রমা পূর্ণ করতে হবে। কোনমতে পরশু পর্যন্ত সুস্থ থাকতেই হবে। পরশু সকালেই এখান থেকে আমরা মথুরা রওনা হব। সাড়ে আট মাইল পথ। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাব সেখানে—দর্শন করব ভূতেশ্বর মহাদেবকে। পূর্ণ করব চুরাশী ক্রোশ-বিস্তৃত মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা।

আমরা ব্রহ্মাণ্ডঘাটে যে ধর্মশালায় থাকব, তার পাশেই যমুনার তীরে অনেকটা জায়গা জুড়ে রমণীয় এক বনভূমি রয়েছে। সেখানে বালক-কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে খেলা করতেন। তাই জায়গাটার নাম রমণ-রেতি। একটি মন্দিরও আছে সেখানে।

---

* 'The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India.'

আমরা বৃন্দাবনের রমণ-রেতি দেখেছি, আজ ব্রহ্মাণ্ডঘাটের রমণ-রেতি দেখব।

বিখ্যাত মুসলমান-কবি রাস্‌খান (Raskhan) বহুকাল মহাবনের রমণ-রেতিতে বাস করেছেন। সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি শেষ জীবনে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

রমণ-রেতিতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ শিশুদের সেখানে বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখানো হয়।

আশ্বিন মাসে রামলীলার মেলা মহাবনের সবচেয়ে বড় মেলা। কিন্তু শিবরাত্রির সময় রমণ-রেতিতে যে মেলা বসে তাও খুব ছোট নয়। তখন এখানে চারদিন ধরে গোপাল-জয়ন্তী পালন করা হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ সেই ধর্মসভায় যোগদান করেন।

মহাবন ছোট হলেও শহর। এখানে বৈদ্যুতিক আলো আছে। আছে ডাক ও তার অফিস, পুলিস ফাঁড়ি, বাজার, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই।

আমরা একটি তৃণাচ্ছাদিত উঁচু প্রান্তরের ওপর দিয়ে পথ চলেছি। প্রান্তরটি প্রায় সমতল। বড় গাছ-পালা নেই, রৌদ্রদগ্ধ শ্যামল প্রান্তর।

আমাদের দু'পাশে এক অভিনব মূকাভিনয় অভিনীত হচ্ছে। নারীচরিত্র-বর্জিত একাঙ্ক নাটক নয়। সে নাটকের পাত্র-পাত্রী অসংখ্য, প্রায় সকলেই কিশোর-কিশোরী। অঙ্কের পরে অঙ্ক অভিনীত হয়ে চলেছে। আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সে নাটক দেখে যাচ্ছি, তবে তার জন্য দর্শনী দিতে হচ্ছে বৈকি।

পরিক্রমা পথের দু'পাশে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে বসে কিংবা শুয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই নাচের ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে! তাদের হাতের আঙুলে নৃত্যের বিভিন্ন মুদ্রা। প্রত্যেকেরই চোখদু'টি নিমীলিত। এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ

পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে না জীবন্ত বালক-বালিকা, যেন প্রাণহীন প্রতিমূর্তি দেবতার আরাধনায় রত। বলা বাহুল্য এখন আমরাই ওদের সেই দেবতা। সুতরাং প্রত্যেকের সামনেই দু-তিনটি করে পয়সা ফেলে পথ চলতে হচ্ছে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর, পয়সা দেবার পরেও ওরা স্থির এবং অবিচলিত থাকছে। কিন্তু যেই আমাদের শোভাযাত্রার শেষ যাত্রীটি ওদের এক-একজনকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, অমনি সেই ছেলেটি কিংবা মেয়েটি পাশে পড়ে-থাকা পয়সাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে, কোচড়ে কিংবা পকেটে রাখছে। তারপরেই সে শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে ছুটে সামনে চলে যাচ্ছে। অনেকটা সামনে গিয়ে আপন-আপন ভঙ্গিতে আবার তেমনি পথের পাশে স্থির হয়ে থাকছে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—ওখানে পৌঁছে আবার আমরা তাকে পয়সা দেব।

তাই দিই—খুশিমনেই আমরা ওদের আবার পয়সা দিই। ভারতের কোন তীর্থেই যে ছেলে-মেয়েরা এমন অভিনব পদ্ধতিতে পয়সা চায় নি।

যে রাজপথ দিয়ে আমরা এতক্ষণ পথ চলেছি, সেটি শেষ হয়ে গেল। এখান থেকে একটি ইট-বাঁধানো সংকীর্ণ পথ আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়েছে। সেই পথ বেয়ে আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকি।

একটি সুপ্রাচীন মন্দিরের সামনে এসে থামল আমাদের সংকীর্তন-শোভাযাত্রা। সুবৃহৎ তোরণের ওপরে হিন্দীতে মন্দিরের পরিচয়পত্র—

'প্রাচীন জন্মস্থান।

শ্রীনন্দভবন—চৌরাশী খম্বা।

শ্রীধাম পুরানী গোকুল-মহাবন।'

চুরাশী নয়, আশীটি খাম্বা আছে এ মন্দিরে। আর চুরাশীটি স্তম্ভ কেনই বা থাকবে? চুরাশী হল বল্লভীদের বৈশিষ্ট্য। নন্দভবন তো

তাঁদের নির্মিত নয়। তাঁরা তো মহাবনকে গোকুল বলেই স্বীকার করেন না, তাঁরা কেন মন্দির বানাতে আসবেন এখানে ?

বল্লভীরা তো নয়ই, কোন বৈষ্ণব বা হিন্দুও এ মন্দির তৈরি করেন নি। নন্দভবন নির্মাণ করেছেন মুসলমানরা। মন্দির নয়, মসজিদ-রূপে। তৈরি হয়েছে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে।

বলা বাহুল্য মথুরা-বৃন্দাবনের মতো মহাবনও ধর্মান্ধ আওরঙ্গজেবের রুদ্ররোষ থেকে পরিত্রাণ পায় নি। গজনীর সুলতান মাহমুদের ধ্বংস-লীলার পরে মহাবনের ধার্মিক মানুষ আবার সুদৃশ্য স্তম্ভযুক্ত কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা সে-সব মন্দির ভেঙে ফেলে। তারপরে বিভিন্ন মন্দিরের আশীটি স্তম্ভ নিয়ে নির্মাণ করে একটি মসজিদ। কালক্রমে সেটি আবার হিন্দু-মন্দিরে পরিণত—নন্দভবন নামে পরিচিত। পাঁচ সারিতে সন্নিবিষ্ট আশীটি স্তম্ভযুক্ত সেই নন্দভবন দর্শন করতে এসেছি আমরা। এটিই মহাবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন।

শুনেছি এই মন্দিরের একাংশ থেকে বৌদ্ধধর্মের কিছু স্মারক আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এখানেই চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বর্ণিত বৌদ্ধস্তূপগুলি অবস্থিত ছিল। তাঁদের মতে মহাবনই এরিয়ান (Arrian)* এবং প্লিনী (Pliny)** বর্ণিত পুরাকালের ক্লিসোবোরা (Clisobora) বা কৃষ্ণপুর নগরী।

---

* ARRIAN (FLAVIUS ARRIANUS—A. D. 96–180) গ্রীসদেশীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। তাঁর বই থেকেই আমরা আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কথা বিশদভাবে জানতে পেরেছি। তিনি 'Indica' নামে একখানি গ্রন্থে সেকালের ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখে গেছেন।

** PLINY, THE ELDER (GAIUS PLINIUS SECUNDUS—A. D. 23 or 24—79) রোমের বিখ্যাত পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক (Natural Historian). তাঁর বই পড়েও সেকালের ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারা যায়।

এই মন্দিরটি নাকি শ্রীকৃষ্ণের নাড়ীশ্ছেদন, ষষ্ঠীপূজা ও দধিমন্থন স্থল। হয়তো বা হবে। কিন্তু এটি কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান হতে পারে না। কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায়। আমরা সে পুণ্যভূমি দর্শন করে এসেছি।*

পথ থেকে ছয় ধাপ শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দির-তোরণ—লোহার শিকের দরজা। তারপরে তিন ধাপ শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি।

ভেতরে ঢুকেই শ্বেত-পাথরের 'টাইল্‌স' বসানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। অধিকাংশ টাইল্‌স-য়ে ভক্তদের নাম খোদিত। ডানদিকে সেবাইতদের বাসগৃহ, বাঁদিকে মন্দির।

গড়নটি কিন্তু একেবারেই মসজিদ কিংবা মন্দিরের মতো নয়, অনেকটা দরবার-কক্ষের মতো। চারিদিক দেওয়াল-ঘেরা আয়তক্ষেত্রাকার মন্দির। চওড়া খুবই কম, তবে লম্বা মন্দ নয়। একতলা মন্দির। ছাদটা খুবই নিচু।

ভেতরটা ভারী সুন্দর। চারিদিকের দেওয়ালেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাল্যলীলার রঙিন ছবি। চার সারিতে আশীটি স্তম্ভ। প্রত্যেকটিতে সুন্দর কারুকার্য।

মন্দিরটি দু'টি অংশে বিভক্ত—নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির। গর্ভ-মন্দিরের মেঝেটা একটু উঁচু। দরজায় ভারী পর্দা ঝুলছে।

একজন তিলকধারী সুদর্শন যুবা পর্দার সামনে বসে রয়েছেন। তিনি হাত নেড়ে আমাদের মেঝের ওপরে বসে পড়তে বলছেন।

একটু দ্বিধা করি। সুদর্শন সেবাইত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আপনারা বসে পড়ুন, দাঁড়িয়ে থাকলে কৃষ্ণ-ভগবানের গায়ে আপনাদের ছায়া পড়বে। না বসলে দর্শন হবে না।"

ব্যস, সহযাত্রীদের মধ্যে বসে পড়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। পাগল নাকি, শেষে সেবাইত যদি সত্যি সত্যি দর্শন বন্ধ করে দেন! এতদূর এসেও দর্শন না করতে পারলে যে দুঃখ রাখার

---

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য।

আর জায়গা থাকবে না। কি দরকার বাবা ঝুঁকি নেবার? তার চেয়ে বাধ্য ছেলে-মেয়ের মতো বসে পড়াই ভাল।

সেবাইত যে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন, সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। দর্শন না করে ফিরে গেলে, তাঁর লোকসানটাও কিছু কম হবে না। আমরা সংখ্যায় শতাধিক। প্রণামীর পরিমাণটা মোটেই খারাপ হবে না। তবু সবার সঙ্গে আমিও মন্দিরের মেঝেতে বসে পড়ি।

বসে বসে ভাবতে থাকি কথাটা। ভারতের বহু পুণ্যতীর্থ দর্শনের সুদুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে আমার। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা কোথাও শুনি নি। সব মন্দিরেই দাঁড়িয়ে দর্শন করেছি। ভগবানের সামনে ভক্ত বসবে কেন? মানুষ তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেবতার করুণা ভিক্ষা করবে।

সহযাত্রীদের আনুগত্য দেখে খুশি হলেন সেবাইত। তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর স্বরে শুরু করলেন, "আপনারা আজ ধন্য হলেন—ব্রজ-মণ্ডলের পুণ্যতম মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হল আপনাদের। কিন্তু কেবল দর্শন করলেই তো কৃষ্ণকৃপা লাভ করা যায় না। ভগবানকে পেতে হলে ভক্তিভরে ভগবানের আপন স্থলে তাঁর পুজো করতে হয়।"

একটু থেমে গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে সেবাইত আবার বলে যেতে থাকেন, "ভগবানের এই পরম প্রিয় স্থানে প্রতিদিন কৃষ্ণ-ভগবানের পুজো হয়। তবে দৈনিক পুজোটা হল সাধারণ পুজো। এ মন্দিরে বিশেষ পুজো হয় ঝুলন-পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী ও দোল-পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে। পুজোর খরচ খুবই সামান্য—সওয়া পাঁচ টাকা ও সাড়ে দশ টাকা। পুজোর সময় ভক্তদের এখানে উপস্থিত থাকবার প্রয়োজন নেই। ঠিকানাসহ নামগোত্র লিখিয়ে মন্দিরের গদিতে পুজোর খরচ জমা দিয়ে গেলে, ডাকযোগে পুজোর প্রসাদ আপনার বাড়ি চলে যাবে। যিনি যে তিথিতে পুজো দিতে চান, সেই তিথিতেই তাঁর পুজো দেওয়া হবে।......"

বড্ড খারাপ লাগছে। মনেই হচ্ছে না আমি শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-স্মৃতিধন্য মহাবনের নন্দভবনে বসে আছি। মনে হচ্ছে শেয়ালদা থেকে লোক্যাল ট্রেনে চড়ে নৈহাটি কিংবা নিউ-ব্যারাকপুর যাচ্ছি। কোন ক্যানভাসার কবিরাজ কালিপদ দে-র আশ্চর্য মলম অথবা বালিগঞ্জ কেমিক্যালের হাতকাটা তেলের গুণাগুণ বর্ণনা করছেন।

তাহলেও আমি নিরুপায়। আমি ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে মহাবনের নন্দভবনে এসেছি। অতএব নীরবে সেবাইতের বক্তৃতা শুনতে হয়। সেবাইত বলে চলেছেন, "এখানকার দর্শন শেষ হলে আপনারা তোরণের ডানদিকে গদিতে চলে যাবেন। পুজোর খরচ জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নেবেন।"

বক্তৃতা বোধহয় শেষ হল এবারে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। সেবাইত চুপ করেছেন। তিনি পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সহকারীর হাত থেকে পর্দার দড়িটা হাতে নিয়েছেন। থিয়েটার হলে 'ড্রপ-সীন্' বা যবনিকা উন্মোচনের জন্য যেমন ব্যবস্থা থাকে, এখানেও তেমনি ব্যবস্থা।

হাতের দড়িটা দোলাতে দোলাতে সেবাইত আবার শুরু করেন, "এবারে আপনারা ভক্তিসহকারে পরম-করুণাময় কৃষ্ণ-ভগবানের কথা চিন্তা করুন, আমি শ্রীমন্দিরের আবরণ উন্মোচন করছি—আপনারা দর্শন করুন, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে দর্শন করুন। ভগবানের এমন অনিন্দ্যসুন্দর মনোহর মূর্তি আপনারা এর আগে আর কখনও দেখেন নি।"

সেবাইতের ঘোষণা শেষ হয়, কিন্তু মন্দিরের নীরবতা শেষ হয় না। পুণ্যার্থীরা প্রত্যেকেই পুলকিত অন্তরে সেই ঈপ্সিত মুহূর্তটির প্রতাক্ষা করছেন।

পর্দা সরে যায়। সত্যই সুন্দর। গর্ভ-মন্দিরটি অবিকল একটি মঞ্চের মতো। মঞ্চের মধ্যস্থলে রুপোর দোলনায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহ। কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। দোলনার দু'পাশে নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণ-বলরামের দণ্ডায়মান মূর্তি। বেশ বড় বড় মূর্তি। নন্দ ও

যশোদার মূর্তি দু'টি শ্বেত পাথরের। রাম ও কৃষ্ণ কালো পাথরের। প্রত্যেকটি মূর্তি অপূর্ব সুন্দর। যেমন সুন্দর গড়ন, তেমনি সাজ-সজ্জা।

মঞ্চের এককোণে একটি 'মিনি' উনুন ও রান্নার ছোট ছোট সাজ-সরঞ্জাম রয়েছে। উনুনের সামনে একজন মহিলা বসে আছেন—অপেক্ষাকৃত ছোট মূর্তি। সেবাইত বুঝিয়ে দেন, "রাধারাণী রান্না করছেন।"

শ্রীরাধিকা কোনদিন নন্দভবনে এসে রান্না করেছেন কিনা জানা নেই আমার। কিন্তু করলেও তিনি বোধহয় কোন অন্যায় করেন নি। তাঁর সে অধিকার নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং সশ্রদ্ধ অন্তরে দর্শন ও দণ্ডবৎ করি।

যে দোলনায় রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি রয়েছে, তার সঙ্গে একটি রুপোর শেকল বাঁধা আছে। সেবাইত সেই শেকলের শেষ প্রান্তটি ধরে মাঝে মাঝে মৃদু টান দিচ্ছেন, ঝুলনটি ধীরে ধীরে দুলছে।

সেবাইত আবার আরম্ভ করেন, "আপনাদের মধ্যে যে কোন পুণ্যার্থী ইচ্ছে করলে আমার হাতের এই শেকলটি ধরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে দোলা দিতে পারেন।"

"আমি দেব।" গুরুমশারাজের নবতম শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্তী চেঁচিয়ে ওঠে।

"আমি" প্রবীণা শিষ্যা দিদিমা বলে বসলেন।

"আমি" প্রৌঢ় শিষ্য কৃষ্ণচন্দ্র খাণ্ডা আবদার করেন।

"আমি···আমি···আমি" সহযাত্রীরা অনেকেই অক্ষয়পুণ্য অর্জন করতে চান। তাঁরা উঠে দাঁড়ান।

কিন্তু দৌড় শুরু করতে পারেন না। সেবাইত হাত তুলে তাঁদের নিরস্ত করেন। তিনি শান্তস্বরে রাধা-কৃষ্ণকে দোলা দেবার সর্তটি ঘোষণা করেন। বলেন, "যাঁরা যাঁরা দোলা দিতে চান, তাঁরা প্রত্যেকে পাঁচসিকে করে পয়সা হাতে নিয়ে লাইন করে এগিয়ে আসুন। ঠিক

ঠিক পাঁচসিকে করে আনতে পারলে ভাল হয়, ভাঙ্গানি দিতে গেলে আপনাদেরই দেরি হয়ে যাবে।"

চার্জটা একটু বেশি। কিন্তু তাতে পুণ্যার্থীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে না, তাঁরা পয়সা হাতে নিয়ে সেবাইতের সামনে সারি বেঁধে দাঁড়ান। সেবাইতের সহকারী কালেক্টারের কাজ করছেন। এক-একজনের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছেন, তারপরে তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছেন সেবাইতের সামনে।

যথাসময়ে বন্ধুবর গোবিন্দ চক্রবর্তীর পালা এলো। বড় আশা নিয়ে সে এগিয়ে গেল সেবাইতের সামনে। তিনি চক্রবর্তীকে শেকলের শেষ প্রান্তটি ধরতে দিলেন, কিন্তু নিজে শেকলটি ছেড়ে দিলেন না।

চক্রবর্তী শেকলে টান দিল। কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের ঝুলন-মঞ্চ তাতে সামান্যই দুলে উঠল, কারণ সেবাইত শেকলের মাঝখানটা ধরে 'মুভমেণ্ট কন্‌ট্রোল' করছেন— যাতে ঝুলনটি বেশি না দুলতে পারে। আর তারপরেই সেবাইত চক্রবর্তীর হাত থেকে শেকলটি ছিনিয়ে নিয়ে সহকারীকে আদেশ করেন, "দুসরা আদমী ভেজো।"

শেকলটানার তৃপ্তি অনুভব করতে পারার আগেই চক্রবর্তীকে শেকল ছেড়ে দিতে হল। সে ফিরে এলো আমাদের কাছে।

আমি তার দিকে তাকাই। আর যায় কোথায়, ক্ষিপ্তকণ্ঠে চক্রবর্তী মন্তব্য করে, "শালা ফোর্-টুয়েন্টি।"

তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিই। বলি, "ছিঃ ছিঃ, মন্দিরে দাঁড়িয়ে পূজারীকে এমন কথা বলতে আছে!"

"পূজারী!" খাটো স্বরে চক্রবর্তী বলে, "পূজারী না ছাই! ব্যাটা আমার থেকেও বড় দালাল।"

চুপ করে থাকি। চক্রবর্তী 'ইঞ্জিনিয়ারিং গুড্‌স'-এর 'রেজিস্টার্ড ব্রোকার'।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে চক্রবর্তী বোধহয় একটু মর্মাহত

হয়। তবু সে আবার বলে, "কলকাতায় হলে আমি ওর 'ব্ল্যাক-মেইলিং' ঘুচিয়ে দিতাম।"

আর নীরব থাকা সম্ভব নয়। তাই একটু হেসে বলি, "দেখো, আবার মন্দিরের গদীতে গিয়ে পুজোর জন্য সওয়া পাঁচটাকা জমা দিও না যেন।"

"পাগল হয়েছো!" চক্রবর্তী গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আর ঐ সব গ্যাঁড়াকলের মধ্যে যাই!"

আমিও আশ্বস্ত হই। চক্রবর্তীর তাহলে অল্পেতেই শিক্ষা হয়েছে। অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃপা করেছেন তাকে।

ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণকে আবার প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে আসি নন্দভবন থেকে। আসার সময় কৃষ্ণের কাছে প্রশ্ন রেখে এসেছি—ঠাকুর, তোমাকে মূলধন করে সেবাইতদের এই ব্যবসা তুমি আর কতদিন চালাতে দেবে? এদের পাপের বোঝা কি আজও পূর্ণ হয় নি?

উনিশ

আবার শুরু হয়েছে কীর্তন। কিন্তু কীর্তনে অংশ নেবার মতো শারীরিক অবস্থা এখন আমার নয়। পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু কোনমতে সবার শেষে এগিয়ে চলেছি। আমি যে পথিক। পথে বেরিয়ে অচল হবার উপায় নেই আমার।

কয়েক পা চলেই কিন্তু থামার সুযোগ পাওয়া গেল। পথের বাঁদিকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভজনস্থলী। ওপরে নয়, নিচে। বিশ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমরা মাটির নিচে নেমে এলাম। সশ্রদ্ধ-চিত্তে প্রণাম করলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌড়ীয় গোস্বামীকে।

আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। সহযাত্রীদের পেছনে পেছনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি মহাবনের পথে। শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-নিকেতন গোকুলের পথে পদচারণা করছি আমি।

আমরা বালগোপালের মন্দিরে এলাম। ভেতরে নন্দ-যশোদা ও গোপালের মূর্তি। হয়তো এখানেই ছিল বিখ্যাত বালগোপালের মন্দির। আওরঙ্গজেবের আক্রমণের আগে সেই মন্দির থেকে বাল-গোপালের বিগ্রহটিকে সুরাটে নিয়ে যাওয়া হয়। আওরঙ্গজেবের আশাহত সৈন্যগণ সেদিন বিগ্রহ বিনষ্ট করতে না পেরে, মন্দিরটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। বালগোপালের সেই মূর্তিটি ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটি অপরূপ নিদর্শনরূপে আজও সুরাটকে গৌরবান্বিত করে রেখেছে।

ঢালু পথের দু'পাশে মাটি ও খড়ের ছোট-ছোট কুড়ে। স্থানীয় পাণ্ডাজী বলছেন মন্দির—এগুলো বিভিন্ন কৃষ্ণলীলাস্থল। বড়-বড় মাটির মূর্তি তৈরি করে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা একে একে হনুমান পাতালদেবী ও সাক্ষীগোপাল মন্দির দেখে তৃণাবর্ত

অঘাসুর ও পুতনা-বধের স্থান দর্শন করলাম। দর্শন করি শকট-ভঞ্জন স্থল। দর্শন শেষে আবার সবার পেছনে এগিয়ে চলি।

কিছুদূর এগিয়ে ধর্মরাজ ও যমুনার মন্দির। তারপরে যোগমায়ার মন্দির। গৌড়ীয় মতে যোগমায়া নাকি এখানেই মা-যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বল্লভীরা অবশ্য বলেন গোকুলের শ্যাম-লালা মন্দিরই যোগমায়ার জন্মস্থান। কিন্তু আমার সহযাত্রীরা সে বক্তব্য মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং তাঁরা সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রবেশ করেছেন এই মন্দিরে। আর আমিও দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁদের সামিল হই।

ক্ষুদ্র মন্দিরের ক্ষুদ্রতর গর্ভগৃহ। সেখানেই সিংহাসনের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছেন। যোগমায়া দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর সামনে। মনে পড়ছে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সেই কাহিনী। আমি ভেবে চলি—

কংস একে একে দেবকীর ছ'টি পুত্র-সন্তানকে হত্যা করলেন। কংসের পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছে দেখে বাসুদেবের কলাভূত স্বয়ং বলদেব দেবকীর সপ্তম গর্ভে আবির্ভূত হলেন। বলরাম আসছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচররূপে। অতএব তাঁকে হারালে চলবে না। তাহলে যে কৃষ্ণলীলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই শ্রীহরি যোগমায়াকে আদেশ করলেন—তুমি ব্রজে যাও। সেখানে গোকুলের নন্দালয়ে বসুদেবের অপর পত্নী রোহিণী রয়েছেন। শেষ নামক আমার যে অংশ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত, তুমি তাঁকে আকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। তারপরে আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হব। তুমি সেই একই সময়ে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে।

তারপরে দ্বাপরের শেষে এক ভাদ্রমাসের বিজয় বেলায়, রোহিণী নক্ষত্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী-তিথিতে কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করলেন।

ভগবানের নির্দেশে বসুদেব সদ্যোজাত কৃষ্ণকে বুকে তুলে নিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে বন্দী বসুদেবের পায়ের শেকল খসে পড়ল, কারাগারের লৌহকপাট খুলে গেল। বাইরে প্রহরীরা মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন, আকাশ মেঘে ঢাকা। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

শিশু-বাসুদেবকে বুকে নিয়ে বসুদেব কারাগারের বাইরে এলেন। অনন্তদেব নিজের সহস্র ফণায় বসুদেবের সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে থাকলেন।

বসুদেব যমুনার তীরে এলেন। কৃষ্ণস্পর্শলোভাতুরা উদ্বেলিতা ও আবর্তসঙ্কুলা কালিন্দী বসুদেবকে পথ ছেড়ে দিলেন। বসুদেব নির্বিঘ্নে যমুনা অতিক্রম করে গোকুলে এলেন—পৌছলেন এখানে।

এখানেও সেই একই দৃশ্য—যোগমায়ার প্রভাবে সবাই মায়া-নিদ্রায় আচ্ছন্ন। নিশ্চিন্ত বসুদেব নিদ্রিতা যশোদার শয্যাপাশে শিশু-কৃষ্ণকে রেখে, তাঁর সদ্যোজাতা কন্যাকে নিয়ে কংস-কারাগারে ফিরে এলেন। আর তারপরেই কারাগারের লৌহকপাট আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ জানতে পারলেন না এই সন্তান-বদলের কথা, এমন কি মা-যশোদা পর্যন্ত নয়।

কিছুক্ষণ বাদে শিশু-যোগমায়া হঠাৎ ভীষণ জোরে কেঁদে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের মায়া-ঘুম ভেঙে গেল। তারা তাড়াতাড়ি কংসকে সংবাদ দিল। কংস ছুটে এলেন কারাগারে। তিনি দেবকীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিলেন শিশুকন্যাকে। তাঁর কোমল ও পিচ্ছিল পা দু'টি ধরে পাথরের ওপর ছুঁড়ে মারলেন।

মুহূর্তে যশোদার শিশুকন্যা যোগমায়ার রূপ ধারণ করে বলে উঠলেন—রে মূঢ় কংস, আমাকে বধ করতে পারলেই বা তোর কি লাভ হত? তোকে যে বিনাশ করবে, তোর পূর্বজন্মের সেই শত্রু অন্য স্থানে রয়েছেন। অতএব অসহায় বসুদেব ও দেবকীর প্রতি আর তোর অত্যাচার করা সমীচীন নয়।

অনুতাপানলে দগ্ধ কংস দেবকী ও বসুদেবকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁরা কংসকে ক্ষমা করলেন—তাঁরা যে প্রেমময় ভগবান-শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী।

দর্শন শেষে সবার পেছনে বেরিয়ে আসি যোগমায়া মন্দির থেকে। ধীরে ধীরে সহযাত্রীদের অনুসরণ করতে থাকি।

কয়েক মিনিট বাদে পৌঁছলাম একজোড়া অর্জুনগাছের সামনে। পাশেই জরাজীর্ণ একটি অন্ধকার মন্দির। মন্দিরে কোন মূর্তি নেই, রয়েছে পাথরের একটি ছোট উদূখল—কৃষ্ণের যমলার্জুন-ভঞ্জনলীলার প্রতীক। উদূখলটিকে প্রণাম করে আমরা আবার সেই জোড়া অর্জুনগাছের কাছে ফিরে আসি। আমাদের ভাগবতকার মথুরা মহারাজকে ঘিরে দাঁড়াই।

কেউ কোন অনুরোধ করার আগেই মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করেন, "আপনারা সকলেই ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের দাম-বন্ধন ও যমলার্জুন-ভঞ্জনের কথা জানেন। দশম স্কন্ধের নবম ও দশম অধ্যায়ে ভাগবতকার সে কাহিনী কীর্তন করেছেন। আমি বৃন্দাবনে বসে আপনাদের কাছে বলেছি সে কাহিনী।" একবার থামেন মথুরা মহারাজ। তারপরে যমলার্জুন বৃক্ষদু'টিকে দেখিয়ে তিনি আবার বলেন, "এই হচ্ছে কৃষ্ণলীলার সেই বৃক্ষদ্বয়ের প্রতিনিধি যমলার্জুন।"

চুপ করলেন মথুরা মহারাজ। মনে করবার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, দাম-বন্ধন লীলার কথা বলেছিলেন মথুরা মহারাজ। বলেছিলেন—মা-যশোদা যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকালের জননী! তাঁর কাছে তো কৃষ্ণ চিরবাঁধা। তাহলেও সেদিন বন্ধনরজ্জু দু' আঙুল ছোট রয়ে গিয়েছিল। কারণ কেবল তো বাৎসল্যরস দিয়েই কৃষ্ণকে বাঁধা যায় না। মায়ের ভালোবাসায় দু' আঙুল ফাঁক থেকে গিয়েছিল।

সেদিন মহারাজ আরও বলেছিলেন—ভগবান আনন্দঘন বস্তু। সবাই আনন্দকে বাঁধতে চায়। কিন্তু ভক্তের সঙ্গে তাঁর দু' আঙুলের ব্যবধান থেকে যায়। ভক্ত যদি সাধনায় এক আঙুল অগ্রসর হতে

পারেন, ভগবান তখন করুণা করে আরেক আঙুলের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। তাহলেই ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলন হয়।

মা-যশোদা সেদিন যখন কিছুতেই গোপালকে বাঁধতে পারলেন না, তখন গোপাল নিজেই বাঁধা পড়লেন। ভক্ত-বাৎসল্য প্রদর্শনের নিমিত্ত ভগবান বন্ধনদশা স্বীকার করে নিলেন। ভক্ত-বন্ধনে আবদ্ধ দামোদর মানবের মুক্তিদাতা। তাই ভক্ত-বৈষ্ণবদের দামোদরব্রত পালন। আমার অধিকাংশ সহযাত্রী এখন সেই ব্রত পালন করছেন।

"আপনি কিন্তু সেদিন বলেছিলেন মহারাজ, এখানে এসে নলকুবর ও মণিগ্রীবের ঘটনাটা বলবেন।"

চক্রবর্তীব কথায় আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। মথুরা মহারাজ মৃদু হাসছেন। হয়তো বা ভাবছেন—আমরা সবাই ভুলে যেতে পারি, কিন্তু গোবিন্দ চক্রবর্তী দালালী কবে খায়, সে ভুলবার পাত্র নয়।

মথুরা মহারাজ উত্তরীয় দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখখানি একবার মুছে নিয়ে বলতে শুরু করেন, "আমি সেদিন আপনাদের বলেছি, গোপালকে বেঁধে রেখে মা ঘরের কাজে চলে গেলেন। উদূখলে বাঁধা কৃষ্ণ তাকিয়ে দেখলেন উঠোনে একজোড়া অর্জুনবৃক্ষ। ধীবে ধীরে তিনি সেদিকে এগোতে থাকলেন। তিনি বৃক্ষদু'টিব ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। উদূখলটি জোড়া-অর্জুনবৃক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হল। বৃক্ষদু'টি দুলে উঠল। কেঁপে উঠল তাদের শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব। কৃষ্ণ তবু এগিয়ে চললেন। প্রচণ্ড শব্দ করে যমলার্জুন মাটিতে পড়ে গেল। তাদের ভেতব থেকে দু'জন অগ্নিময় উজ্জ্বল পুরুষ বেরিয়ে এলেন।"

"জানি মহারাজ! তাঁবাই নলকুবর ও মণিগ্রীব।" চক্রবর্তী মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "তাঁরা নারদের অভিশাপে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমরা সেই ঘটনাটাই বিস্তারিতভাবে শুনতে চাইছি।"

"বেশ, বলছি শুনুন!" মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "নলকুবর ও মণিগ্রীব হলেন কুবেরের তুই ছেলে। যক্ষরাজের সন্তান বলে তাঁদের অহঙ্কারের সীমা ছিল না। তাঁরা বারুণী মদিরা পান করে মন্দাকিনীর তীরে কুসুম-কাননে সুন্দরী রমণীদের সঙ্গে সঙ্গসুখ উপভোগ করতেন।

"একদিন যখন তাঁরা বিবস্ত্র হয়ে বিবসনা নারীদের নিয়ে জলকেলি করছিলেন, তখন দৈবক্রমে নারদ সেখানে উপস্থিত হলেন।

"তাঁকে আসতে দেখে বিবস্ত্রা রমণীরা তাড়াতাড়ি তীরে উঠে লজ্জা নিবারণ করলেন। কিন্তু নগ্ন নলকুবর ও মণিগ্রীব বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না।

"দেবর্ষির তুঃখ হল। মাতাল ও অহঙ্কারী দেবপুত্রদের কৃপা করার ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি তাঁদের বললেন—রজঃগুণজাত মত্ততা জীবের বুদ্ধিনাশ করে। তার মধ্যে আবার ঐশ্বর্যের মত্ততা হল সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ সে মত্ততার আনুষঙ্গিক হচ্ছে মদ. জুয়া এবং মেয়েমানুষ।

"সর্বশেষে নারদ তাঁদের বললেন—আমি তোমাদের ঐশ্বর্যমত্ততা নাশ করব। আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তোমরা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হও। তাহলে তোমরা আর এমন অন্যায় আচরণ করতে পারবে না। তবে আমার প্রসাদে তোমাদের এই সব কথা সর্বদা স্মরণ থাকবে। এবং দৈবশত বৎসর পরে বাসুদেবের সান্নিধ্যে তোমরা পুনরায় দেবত্বলাভ করে ভক্তিধনে ধনী হবে।

"নারদের শাপে নলকুবর ও মণিগ্রীব যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হয়ে গোকুলে বাস করতে থাকলেন।

"মা-যশোদা যেদিন গোপালকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধলেন, সেদিন তাঁদের স্থাবরত্ব প্রাপ্তির দৈবশত বৎসর পূর্ণ হল। তাই উদূখলে বাঁধা ভগবান শ্রীহরি যখন সেই অর্জুন বৃক্ষতু'টির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন উদূখলে বেঁধে গাছ তু'টি মাটিতে পড়ে গেল। আর

সেই গাছ দু'টি থেকে নলকুবর ও মণিগ্রীব দু'জন অগ্নির মতো উজ্জ্বল সিদ্ধপুরুষরূপে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা অখিল-লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। তারপরে দু'ভাই রজঃ ও তমোগুণশূন্য হয়ে যুক্ত-করে শ্রীকৃষ্ণের স্তব শুরু করলেন।

"বললেন—হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগি! আপনি নিখিল বিশ্বের আদি পরমপুরুষ। আপনি বিশ্ববিধাতা ভগবান বাসুদেব, আপনাকে স্তব করবার সামর্থ্য নেই আমাদের। তাই আমরা শুধু আপনাকে নমস্কার করছি।

"হে ভগবন্! আমরা দেবদেহ পেয়ে সেই দেহেন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহার করেছিলাম, তাই দেবর্ষি আমাদের ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষে পরিণত করে-ছিলেন। আজ আপনার পাদস্পর্শে যখন আবার দেহেন্দ্রিয় ফিরে পেলাম, তখন আমরা যেন আমাদের দেহ ও মনকে কেবল আপনার গুণকীর্তনেই সার্থক করে তুলতে পারি। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যেন সর্বদা আপনার কথা শ্রবণেই আসক্ত থাকে। আমাদের হাতদু'টি যেন নিয়ত আপনার সেবাতেই নিযুক্ত থাকে। আমাদের মন যেন সর্বক্ষণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণেই মগ্ন থাকে। আমাদের মাথা যেন কেবল আপনার প্রণামেই ধন্য হয়। জগতের সর্বজীবে আপনি আছেন, এই কথা জেনে আমরা যেন সর্বত্র নতশির হয়ে থাকতে পারি। আমাদের চোখদু'টি যেন আপনার মূর্তিস্বরূপ সাধু সন্দর্শনে ধন্য হয়। আমরা যেন সর্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্বদা আপনার অনুশীলন করতে পারি।"

'শ্রীবন দেখি পুন গেলা লোহবন।
মহাবন গিয়া জন্মস্থান-দরশন॥
যমলার্জুন ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল॥

গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে।
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্রঘরে॥'

আবার শুরু হয়েছে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা। যমলার্জুন-ভঞ্জন স্থান দর্শনের পরে কেষ্টপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকে কীর্তন ধরেছেন। বনপরিক্রমাকালে মহাপ্রভুও আমাদেরই মতো এসেছিলেন গোকুল-মহাবনে। তিনিও বিল্ববন এবং লৌহবন দর্শন করে এসেছিলেন এখানে। দর্শন করেছিলেন যমলার্জুন-ভঞ্জন স্থান। তারপরে ফিরে গিয়েছিলেন মথুরা। আমরাও তাই যাব।

পারব কি? সহযাত্রীরা যে সবাই এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে। আর আমি ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছি।

জ্বরটা আরও বেড়েছে মনে হচ্ছে। বেশ দুর্বল লাগছে। আজ আমরা ব্রহ্মাণ্ডঘাটে রাত কাটাব। এখনও অনেকটা পথ।

পারব কি? প্রখর রোদ উঠেছে। চোখ মেলতে কষ্ট হচ্ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। এ অবস্থায় এতটা পথ হেঁটে যাওয়া সম্ভব হবে কি?

না হলে যে আমার পদ-পরিক্রমা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মাত্র মাইলখানেক পথের জন্য আমার একশো আটষট্টি মাইল পথ-পরিক্রমা বিফল হয়ে যাবে? এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

সহযাত্রীরা সকলেই ক্লান্ত। কম তো নয়, দীর্ঘ বাইশ দিন ধরে তাঁরা এই কষ্টকর পদযাত্রায় সামিল হয়েছেন। তাই প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। হয়তো বা লক্ষ্যই করেন নি যে, তাঁদের একজন সহযাত্রী পেছিয়ে পড়েছেন। তবে তাঁদের কাছে তো আমি বলিও নি আমার অসুস্থতার কথা। একমাত্র জানকী মনে হয় কিছুটা টের পেয়েছে।

আর তাই বোধহয় জানকী আবার পেছিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, ঐ যে সে এদিকেই আসছে। এতগুলো লোকের চোখের সামনে বার বার এভাবে আমার কাছে তার ছুটে আসা সমীচীন নয়।

তাহলেও জানকী আসছে। সে আমার কাছে আসে। একবার আমার দিকে তাকায়। আমি একটু হাসি।

কিন্তু জানকী গম্ভীর। আমি কিছু বুঝতে পারার আগেই সে তার একখানি হাত আমার কপালে রাখে। আর তারপরেই তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, "এ যে দেখছি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে!" একবার থামে সে। তিরস্কারের স্বরে আবার বলে, "আচ্ছা আপনি কি মানুষ! এত জ্বর নিয়ে এই রোদে হাঁটছেন!"

"না হেঁটে উপায় কি?" ক্লান্তকণ্ঠে বলি, "এ-পথে তো গাড়ি ঘোড়া চলে না।"

"চললেও আপনি হেঁটেই যেতেন।" জানকী যেন বিরক্ত। সে অভিযোগ করে, "রাবেলে যখন জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে—তখন তো বললেন, শরীর বেশ ভাল আছে।"

জানকী থামে। আমি কোন কথা বলি না। কি বলব?

জানকী আবার বলে, "আমি না হয় পর। কিন্তু বোসদা সেনদা চক্রবর্তীদা—তাঁদের কাউকেও তো বলতে পারতেন, আপনার জ্বর হয়েছে।"

"সংসারে কে আপন আর কে যে পর, তা আজও নিশ্চয় করে বুঝে উঠতে পারি নি জানকী। তাই আপন-পর ভাবার জন্য নয়, আমি অন্য কারণে কথাটা তখন গোপন করেছিলাম তোমার কাছে।"

"কারণটা কি?"

"প্রথমত তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠতে। আর ঐটুকু পথের জন্য রাধারাণীর জন্মস্থানটি দর্শন করব না! যাকৃগে, তুমি ভেবো না কিছু। আর কতটুকুই বা পথ? এইভাবে ধীরে ধীরে হেঁটে আমি ঠিক চলে যাব ব্রহ্মাণ্ডঘাট।"

"হেঁটেই যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"নইলে বন-যাত্রার পুণ্য কমে যাবে, এই তো ?" জানকীর স্বরে শ্লেষ।

"পাপ-পুণ্যের কথা নয় জানকী। কোন পদযাত্রীর পক্ষেই যন্ত্রযানের শরণ নেওয়াটা গৌরবের নয়।"

"তা তো বটেই, গৌরব অর্জনের জন্য এর চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করার অসংখ্য নজির রয়েছে আমাদের সমাজে।" একবার থামে সে। তারপরে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে, "তাহলেও আপনাকে আমি এই রোদে আর হাঁটতে দেব না।"

চুপ করে থাকি।

জানকী দু'হাত দিয়ে আমার একখানি হাত ধরে বলে, "একটু কষ্ট করে বাস-রাস্তা পর্যন্ত চলুন, সেখান থেকে যা-হোক্ একটা ব্যবস্থা করব।"

জানকী যুবতী। কাজেই এভাবে পথ-চলা শোভনীয় নয়। সহযাত্রীরা দেখতে পেলে দুর্নাম রটাবেন। কিন্তু সেকথা বলা সম্ভব নয় ওকে। তাছাড়া ওর সাহায্য নিয়ে পথ চলতে সুবিধাই হচ্ছে। আমি নিঃশব্দে হাঁটতে থাকি।

সহযাত্রীরা সম্ভবত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা বাস-রাস্তায় উঠে আসি। জানকী আমাকে একটি গাছের নিচে বসায়। গুরুমহারাজ বোসবাবু সেনবাবু বৌদি চক্রবর্তী মথুরা মহারাজ কেষ্টপ্রভু বণিকপ্রভু নরেনপ্রভু এবং আরও অনেকে ছুটে আসেন আমার কাছে। জানকী অকম্পিত কণ্ঠে তাঁদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারপরে সে গুরুমহারাজকে বলে, "ওঁর জন্য একটা টাঙ্গার ব্যবস্থা করা যায় না ?"

"যাবে না কেন, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই টাঙ্গা পেয়ে যাবেন। কিন্তু সারা ব্রজ-মণ্ডল পায়ে হেঁটে এইটুকু পথের জন্য উনি গাড়িতে চড়বেন ?"

"উপায় কি বলুন মহারাজ! ওঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখুন, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু গুরুমহারাজ হাত দেবার আগেই নরেনপ্রভু আমার কপালে হাত রাখেন। খুবই স্বাভাবিক, তিনি কেবল আশ্রমের ক্যাশিয়ার-কাম্-মার্কেটিং ম্যানেজার নন, তিনি গুরুমহারাজের বাল্যবন্ধু। তাঁর সে অধিকার আছে।

আমার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করে নরেনপ্রভু মন্তব্য করেন, "হু, খুব জ্বর। কিন্ত মশয়, আপনে একলা টাঙ্গায় যাইবেন ক্যামন কইরা?"

আমি তাঁর প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়ার আগেই জানকী বলে, "একলা যাবেন কেন? কাউকে সঙ্গে যেতে হবে।"

"কে ওনার লইগা পরিক্রমাটা মাটি করব? দ্যাখো চেষ্টা কইরা, কারোরে যদি রাজী করাইতে পারো।"

কথাটা মিথ্যে বলেন নি নরেনপ্রভু। সত্যই তো দীর্ঘদিন ধরে এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে সবাই পদ-পরিক্রমা করলেন। আমার জন্য কেন তাঁরা পরিক্রমার পুণ্যফল থেকে বঞ্চিত হবেন?

তাই শ্রান্তস্বরে নরেনপ্রভুকে বলি, "আপনি ঠিকই বলেছেন প্রভু! অনেক বেলা হল, আপনারা এখন রওনা দিন। আমি বসছি এখানে, টাঙ্গা পেলেই চড়ে বসব, একাই যেতে পারব আমি।"

"না।" কেউ কিছু বলবার আগেই জানকী বলে ওঠে। সবাই তার দিকে তাকায়। সে আমাকে বলে, "এই প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে আপনি একা যেতে পারবেন না।"

গম্ভীর স্বরে উত্তর দিই, "আমি যেতে পারব জানকী। তাছাড়া আমার জন্য কে পরিক্রমা নষ্ট করতে রাজী হবেন?"

"আর কেউ রাজী না থাকেন, আমি রাজী আছি।" জানকী শেষ কথাটি বলে দেয়।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করছে আমার চারদিকে।

আমরা দু'জনে রীতিমত দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠেছি। তবু আমি জানকীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করি না। তাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমি নিঃসন্দেহ—প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না। সুতরাং নতমস্তকে নীরব থাকি।

একটু বাদে গুরুমহারাজ নীরবতার অবসান করেন। বলেন, "তাহলে তাই হোক্। আমরা এবারে রওনা দিই। তোমরা গাড়ি পেলেই চলে এসো। আমাদের আগেই তোমরা ব্রহ্মাণ্ডঘাটে পৌঁছে যাবে। সেখানে গোবর্ধন রয়েছে। তার সঙ্গে দেখা করলেই সে তোমাদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেবে।"

জানকী মাথা নাড়ে। গুরুমহারাজ এগিয়ে যান। সমবেত সহযাত্রীরা তাঁকে অনুসরণ করেন। শুরু হয় কীর্তন—

'গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥'...

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে গোকুলের দিকে। কেবল আমরা দু'জনে বসে আছি রাবেল ও গোকুল পথের ধারে—রাধা-কৃষ্ণের মিলনপথের সঙ্গমে।

জানকী তাকিয়ে রয়েছে পথের দিকে। দেখছে কোন খালি টাঙ্গা আসছে কিনা।

আর আমি? আমি ভাবছি জানকীর কথা। আমার জন্যে কেন তার এই আকুলতা? শুধুই কি সহযাত্রী বলে?

আচ্ছা, অন্য কোন সহযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেও কি জানকী এমনি আকুল হত? আমার প্রতি তার এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কারণ কি? কেন সে অপবাদের ভয় ভুলে সবাইকে ছেড়ে আমার সঙ্গে একা রয়ে গেল এখানে? তাহলে কি সে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে?

কিন্তু জানকী যে আর একজনকে ভালোবাসার ঋণ শোধ করতে বন-পরিক্রমায় এসেছে। তার সে ঋণ কি শোধ হয়ে গেছে?

তার ভয় করল না? সে তো জানে, আমি মানসীকে ভালোবাসি। জেনে-শুনেও জানকী কেন এ ভুল করল?

ব্রহ্মাণ্ডঘাটের সামনে এসে থামল আমাদের টাঙ্গা। বাঁধানো পথ শেষ হয়ে গেছে এখানে। শুরু হয়েছে ঘাটের পাথর—বাঁধানো প্রাঙ্গণ।

জানকী আমাকে হাত ধরে নামায়। আমি পকেটে হাত দিতে চাই। জানকী বাধা দেয়। বলে, "আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

"তুমি দেবে কেন?" আমি প্রতিবাদ করি।

জানকী শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "আমার ইচ্ছে।"

চুপ করে থাকি। জানকী নিজের হাতব্যাগ খুলে টাঙ্গা-ভাড়া মিটিয়ে দেয়। তারপরে একটু হেসে বলে, "না হয় আমার কাছে আপনার কিছু ঋণ রয়েই গেল।"

"তোমার কাছে তো এমনিতেই আমার অনেক ঋণ হয়ে গেছে, সেগুলো শোধ করা সম্ভব নয় বলেই এটা আর বাড়াতে চাইছিলাম না।"

"বাজে বক্-বক্ না করে ওখানে একটু বসুন তো! দেখি গোবর্ধন মহারাজ কোথায় গেলেন?" জানকী ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

আমিও আর পুরনো কথায় ফিরে যাই না। তার নির্দেশমত পথের পাশে খোলা বারান্দায় বসে পড়ি।

আমরা মন্দির-এলাকার ভেতরেই এসেছি। সামনে যমুনা। বাঁয়ে মন্দির। ডাইনে রমণ-রেতিতে সংস্কৃত বিদ্যালয়। জায়গাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। বিশেষ করে বিদ্যালয়টি। অনেকটা

জায়গা জুড়ে সুবিরাট এলাকা। জানা-অজানা নানা ছোট-বড় গাছে ছাওয়া শান্ত সুন্দর পরিবেশ। যমুনার কোল ঘেঁষে বেশ একটি দোতলা বাড়ি। ঐ বাড়িতে রাত কাটাতে পারব —ভাবতেও ভাল লাগছে।

জানকী তোরণ পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যায়। গোবর্ধন মহারাজ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অশক্ত সহযাত্রীদের নিয়ে সকালেই মালপত্রসহ বাসে করে লৌহবন থেকে এখানে চলে এসেছেন। শুনেছি এখানে মন্দিরের কাছে ছোট একটি একতলা ধর্মশালা আছে। কিন্তু আমরা সেখানে থাকব না। আমরা ঐ বিদ্যালয়ে রাত্রিবাস করব।

খবর পেয়েই গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে দিদিমা এবং জানকীর মা ছুটে এলেন। তাঁরাও বাসে করে এসেছেন।

জানকী বলে, "চলুন, এবারে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। মহারাজ ঘর দেখিয়ে দিয়েছেন।"

গোবর্ধন মহারাজ মৃদু আপত্তি করেন, "এখুনি শুইয়ে দিবি? তীর্থের নিয়ম হল, প্রথমে তীর্থ-দেবতাকে দর্শন করে নিতে হয়।"

"কিন্তু জ্বরে যে ওঁর গা পুড়ে যাচ্ছে মহারাজ!"

"তুই কোন চিন্তা করিস না মা! এ হচ্ছে পরম-করুণাময় কৃষ্ণ-ভগবানের কৃপা-ক্ষেত্র। কৃপা করে তিনি এখানে মা-যশোদাকে ব্রহ্মাণ্ড-দর্শন করিয়েছিলেন। এখানে কারও কোন অমঙ্গল হয় না।"

জানকী কিছু বলতে পারার আগেই আমি তাকে বলি, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক জানকী। দর্শনটুকু সেরে নিতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি পারব, ঠিক পারব।"

জানি না জানকী আমার আশ্বাসে আশ্বস্ত হয় কিনা, তবে সে আর বাধা দেয় না। আমি গোবর্ধন মহারাজের সঙ্গে এগিয়ে চলি ঘাটের দিকে—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। জানকী আমার পাশে পাশে পথ চলে। দিদিমা ও জানকীর মা নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করেন।

আমরা ঘাটের সামনে এসে গাছের ছায়ায় দাঁড়াই। একটি নয়, পাশাপাশি কয়েকটি গোড়া বাঁধানো গাছ—তেঁতুল ও কদমগাছ। যমুনার দিকটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। শুনেছি শ্রাবণ মাসে এখানে মহাসমারোহে রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়। রাসলীলার উপযুক্ত পরিবেশই বটে।

প্রকাণ্ড ঘাট। শুধু বিশাল নয়, ভারী সুন্দর। আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি যমুনার দিকে। যমুনার এমন রমণীয় রূপ এ যাত্রায় আর দেখি নি। সুদীর্ঘ নদীখাত। ওপারে চড়া পড়েছে। সেখানে বালির ছড়াছড়ি। কিন্তু এপারে অনেকটা দূর অবধি জল আছে— বেশ জল। ঘাটের কাছেই ভেসে আছে বিরাট বিরাট কয়েকটা কচ্ছপ। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা হাঁটু-জলে নেমে তাদের সঙ্গে খেলা করছে।

"আমি বাবা এ-ঘাটে স্নান করতে পারব না।" জানকী হঠাৎ বলে ওঠে।

গোবর্ধন মহারাজ বলেন, "না রে না, এরা মানুষকে কিছু বলে না।"

"উঁহু। সেদিন নন্দঘাটে যমুনা পার হতে গিয়ে প্রায় মারা পড়েছিলাম। আর নয়।"

কথাটা মনে পড়ে আমার। তারপরেই জানকীকে কোলে করতে হয়েছিল আমাকে। তাই ভাল, ওর আর যমুনায় নেমে দরকার নেই।

জানকীর সঙ্গে অসুস্থ শরীরে ব্রহ্মাণ্ডঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এমনটি যে হতে পারে সেদিন কিন্তু একবারও ভাবি নি, যেদিন বৃন্দাবনে বসে মানসী আমার কাছে ব্রহ্মাণ্ডঘাটের কাহিনী বলেছিল। ঠিক কথা, মানসী যে বার বার বলে দিয়েছে—দরকার হলেই আমাকে খবর দিও।

আমি অসুস্থ। আজও কি মানসীকে আমার প্রয়োজন নয়?

কি প্রয়োজন? এখানে তো জানকীই রয়েছে। আর পরশু-দিনই যে আমি ফিরে যাচ্ছি মথুরা। তার পরের দিন বৃন্দাবন—মানসীর কাছে।

আজ ব্রহ্মাণ্ডঘাটে দাঁড়িয়ে বরং মানসীর সেদিনকার সেই কথা-গুলি ভাবা যাক্। কথা নয়, কাহিনী—ব্রহ্মাণ্ডঘাটের কাহিনী। মানসী সেদিন বলেছিল—

মনুসংহিতার মতে ভগবানের সৃষ্ট বীজ থেকে একদা একটি অণ্ড উৎপন্ন হল। সর্ব-লোকের পিতামহ ব্রহ্মা প্রথম সেই অণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তারপরে তিনি ধ্যান-বলে অণ্ডটিকে চারটি অংশে বিভক্ত করলেন—স্বর্গ আকাশ সমুদ্র ও মাটি। আর এই চার অংশ নিয়ে যে বিশ্বগোলক, তার নাম হল ব্রহ্মাণ্ড।

বিষ্ণু-পুরাণেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা প্রথমে একটি অণ্ড উৎপন্ন করলেন। সেই অণ্ড থেকেই সৃষ্ট হল মাটি মানুষ সমুদ্র ও পর্বত। তাই বিশ্বের অপর নাম ব্রহ্মাণ্ড।

"আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাবেন?"

জানকীর প্রশ্নে মানসীর কথা হারিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি তার দিকে তাকিয়ে বলি, "হ্যাঁ, এবারে মন্দিরে চলো।"

ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত সমস্ত তীরভূমি পাথর-বাঁধানো। সেই প্রস্তর-প্রাঙ্গণের ওপর দিয়ে আমরা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি।

ঘাটের উল্টোদিকে ধর্মশালা, ডাইনে মন্দির—ব্রহ্মাণ্ডবিহারীজীর মন্দির। মন্দিরের বাঁদিকে গোপালের মৃত্তিকা-ভক্ষণস্থল। সেখানেও একটি ছোট মন্দির। আমরা প্রথমে সেই মন্দিরে আসি।

এ মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। রয়েছে একখানি ছবি। ছবিতে গোপাল মাটিতে বসে রয়েছেন আর বলরাম দাম সুদাম ও মা-যশোদা দাঁড়িয়ে আছেন।

পাণ্ডাজী বুঝিয়ে দেন, "বলরাম ও দাম মা-যশোদাকে বলছেন —গোপাল মাটি খেয়েছেন। কিন্তু গোপাল বলছেন—না মা, আমি মাটি খাই নি। সুদাম তাঁকে সমর্থন করছেন।"

প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি মূল-মন্দিরের দিকে। ঘাটের তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডবিহারীর মন্দিরটি ছোট। তাহলেও একতলা মন্দিরটি বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দু'টি অংশে বিভক্ত। সামনের অংশ নাট-মন্দির, পেছনে গর্ভ-মন্দির। মাঝখানে একটি কাঠের দরজা।

গর্ভ-মন্দিরে কাঠের সিংহাসনে ব্রহ্মাণ্ডবিহারী শ্রীকৃষ্ণের একক মূর্তি। তাঁর গলায় একটি সাদা উজ্জ্বল মালা। পাণ্ডাজী বলেন, "মোতির মালা।"

সিংহাসনের সামনে তিনটি গোপাল মূর্তি—নাড়ুগোপাল। তাঁদের সামনে মন্দিরের মেঝেতে আটটি শালগ্রাম শিলা। পেছনের দেওয়ালে—বাঁদিকে মা-যশোদার ছবি আর ডাইনে দাম সুদাম ও বলরামের ছবি।

রাধার কোন মূর্তি নেই এ মন্দিরে। না, গোকুলবাসীরা দেখছি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আজও তেমন করে কান পাতলে এখানকার আকাশে-বাতাসে যাঁর বিরহগীতি শুনতে পাওয়া যায়, তাঁর কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন নি এখানে। সবচেয়ে বিস্ময়কর, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও এ তীর্থে এটি কেমন করে সম্ভব হল?

আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করি। মানুষের ভগবানের কাছে মানুষের মঙ্গল-কামনা করি।

গোবর্ধন মহারাজ আমাকে বলেন, "একটু বসুন এখানে, বিশ্রাম নিন।"

"একেবারে ধর্মশালায় গিয়ে বিশ্রাম নিলে হত না?" জানকী জিজ্ঞেস করে।

গোবর্ধন মহারাজ উত্তর দেন, "কিন্তু মা, এখানে যে একটু বসতেই হবে, সংক্ষেপে শুনতে হবে ভগবানের সেই অপরূপ লীলার কথা—তীর্থের নিয়ম।" তিনি পাণ্ডাজীকে দেখিয়ে দেন।

"কিন্তু ওঁর যে খুব জ্বর মহারাজ!" জানকী যেন অসহায়।

"তাঁর ওপরে বিশ্বাস রাখো মা! এখানে কারও কোন অমঙ্গল হয় না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া কতক্ষণই বা লাগবে?" পাণ্ডাজী ভরসা দেন।

বসে পড়ি নাট-মন্দিরের মেঝেতে। বলি, "আপনি বলুন পাণ্ডাজী. আমি শুনব। আমার কোন কষ্ট হবে না।"

জানকী অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আমার পাশে বসে পড়ে। দিদিমা এবং জানকীর মা-ও আমাদের পাশে বসেন।

পাণ্ডাজী বলতে শুরু করেন, "ব্রজ-মণ্ডলের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ গোকুলের এই ব্রহ্মাণ্ডঘাট। শিশুরূপী ভগবান এখানেই যশোমতাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে সেই অপূর্ব লীলার কথা বলা হয়েছে। আগের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শকট-ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত-বধ লীলা করেছেন।"

আমি ও জানকী মাথা নাড়ি। ইতিমধ্যে কয়েকজন অপরিচিত দর্শনার্থী এসে আমাদের পাশে বসেছেন। তাঁরাও পাণ্ডাজীর কথা শুনছেন।

পাণ্ডাজী বলে চলেছেন, "ভাগবতের এ অধ্যায়টিকে বলা হয় ভগবানের বিশ্বরূপ। এই অধ্যায়ে নন্দরাজের অনুরোধে গুরুদেব গর্গাচার্য—বলরাম ও কৃষ্ণের নামকরণ করলেন। তারপরে তিনি রাজা নন্দ ও মা-যশোদাকে নানা উপদেশ দিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন। নন্দ-যশোদা বড়ই আনন্দিত হলেন। তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

"কয়েকদিনের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিতে শিখলেন।

তাঁরা এই গোকুলের ঘরে ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের সরীসৃপসদৃশ চলন দেখে ব্রজনারীরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতেন।

"গোকুলের ধুলো-কাদায় রাম-কৃষ্ণ মাখামাখি হতেন। রোহিণী ও যশোদা ছুটে এসে তাঁদের কোলে তুলে নিতেন। মায়েরা পরমানন্দে শিশুপুত্রদের স্তন্যদান করতেন। স্তন্যপানরত পুত্রদের হাসি দেখে তাঁরা মোহিত হতেন।

"কিছুদিনের মধ্যেই রাম ও কৃষ্ণ হাঁটতে শিখলেন। তাঁরা সমবয়সী বালক-বালিকাদের সঙ্গে খেলাধূলা শুরু করে দিলেন।

"দু'ভাইয়ের, বিশেষ করে বালক কৃষ্ণের দুষ্টুমি দেখতে ব্রজবধূদের বড়ই ভাল লাগে। তবে মাঝে মাঝে কৃষ্ণ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যান। তখন তাঁরা বিরক্ত হয়ে মা-যশোদার কাছে নালিশ করেন—আজ সকালে গাই দোয়াবার সময় কৃষ্ণ হঠাৎ সেখানে গিয়ে বাছুরের বাঁধন খুলে দিয়েছে, আর যেমনি আমি বাছুর ধরতে বনে গেছি, কৃষ্ণ আমার ঘরে ঢুকে সব দৈ খেয়ে ফেলেছে।

"মা যশোদা জিজ্ঞেস করেন—তোমরা তাকে ধমক দিতে পারো না?

"—না। ব্রজনারীরা উত্তর দেন—তাকে তিরস্কার করলেও, সে কেবল খিলখিল করে হেসে ওঠে। আর সেই হাসি দেখলে আমরাও হেসে ফেলি।

"যশোদা বলেন—তোমরা তাহলে তোমাদের জিনিসপত্র সামলে রাখো না কেন?

"—রাখি না আবার! ব্রজাঙ্গনাগণ বলেন—অনেক উঁচুতে শিকেয় তুলে রাখি। কিন্তু তোমার ছেলে যে পাকা চোর। কোথায় কোন্ জিনিসটি আছে, সবই তার জানা। তাই ঠিক জায়গাটিতে গিয়ে প্রথমে একখানি পিঁড়ি পাতে, তার ওপরে উদূখলটি রেখে পাত্রটি পেড়ে আনে। যদি তাতেও নাগাল না পায়, তাহলে লাঠি

দিয়ে মাটির পাত্রটি ফুটো করে তার নিচে হাঁ-করে বসে থাকে। নিজেদের খাওয়া হলে, বানরদের ডেকে এনে খাওয়ায়।

"সব শুনেও মা-যশোদা কিন্তু কৃষ্ণকে কিছুই বলতে পারেন না। এদিকে কৃষ্ণের দুষ্টুমি দিন দিন বেড়েই চলে।

"একদিন কৃষ্ণ যখন ওখানে", পাণ্ডাজী হাত দিয়ে মৃত্তিকা-ভক্ষণ স্থলটি দেখিয়ে দেন, "ঐ মন্দিরের কাছে বসে খেলা করছেন, তখন বলরাম ও অন্যান্য বালকরা ছুটে এসে যশোদাকে জানালেন—কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।

"যশোদা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন উঠোনে। কৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার একখানি হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে, তুই নাকি মাটি খেয়েছিস? তোর দাদা পর্যন্ত তাই বলছে!

"কৃষ্ণ নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—না মা। ওরা মিথ্যে কথা বলছে। আমি মোটেই মাটি খাই নি। বিশ্বাস না হয়, তুমি আমার মুখের ভেতরটা একবার দেখো।

"—বেশ, তুই হাঁ কর দেখি! মা ছেলেকে বলেন।

"ভগবান শ্রীহরি তখন মুখব্যাদান করলেন। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য সবই রয়েছে সেখানে। কেবল সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশ-সাধনের জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু বাৎসল্য ও মধুর রস আস্বাদন করবার জন্যই তিনি নন্দ-যশোদার ঘরে এসেছেন।" একবার থেমে পাণ্ডাজী সুর করে বলতে থাকেন,

'সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রি-দ্বীপাব্ধি-ভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দু-তারকম্॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ॥
এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকাল-স্বভাব-কর্মাশয়-লিঙ্গ-ভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্॥'

পাণ্ডাজী থামতেই দিদিমা বলে ওঠেন, "ও কি, চুপ করলেন ক্যান্? অর্থটা এ্যাকবার কইয়া দেবেন তো!"

"হ্যাঁ, মা, বলব বৈকি, নিশ্চয়ই বলব।" পাণ্ডাজী বলতে শুরু করেন, "মা-যশোদা পুত্র কৃষ্ণের মুখ-বিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। দেখতে পেলেন স্থাবর জঙ্গম অন্তরীক্ষ ও দশ দিক, পর্বত দ্বীপ ও সসাগরা ধরিত্রী, বায়ু অগ্নি ও তারা সহ সমুদয় জ্যোতিশ্চক্র, জল তেজ ও আকাশ। দেখতে পেলেন মহৎ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, মন ও শব্দকে, এবং সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—তিন গুণকে। এই সমস্ত নিয়ে যে মহাজগৎ, মা-যশোদা দেখলেন সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে।

"যশোদা একই সময়ে তাঁর পুত্রের মুখ-বিবরে জীব কাল স্বভাব কর্ম সংস্কার ও নানা বাসনার বৈচিত্র্যে ভরা বিশ্বজগৎকে দেখতে পেলেন। আবার একই সঙ্গে তিনি দেখতে পেলেন নিজেকে ও তাঁর ব্রজধামকে। স্বভাবতই তিনি শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন।"

পাণ্ডাজী থামতেই সকলে করজোড়ে প্রণাম জানালেন। কাকে বলতে পারব না। কারণ, পাণ্ডাজী ভাগবতকার ও কৃষ্ণ—তিনজনকেই প্রণাম করা যেতে পারে। হয়তো তাঁরা তাই করেছেন।

কিন্তু সভা ভাঙে না। পাণ্ডাজী আবার বলতে থাকেন, "পুত্রের মুখ-বিবরে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মা-যশোদা ভাবলেন—এ কি স্বপ্ন, না দৃষ্টিভ্রম! কিন্তু পরক্ষণেই তিনি অনুভব করলেন—এই হচ্ছে ভগবৎ-ঐশ্বর্য। যিনি একরূপে আমার পুত্র, অন্যরূপে তিনিই বিশ্বব্যাপ্ত। যশোদা তখন শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হলেন। আর তার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে যশোদা আবার কৃষ্ণকে পুত্ররূপে অনুভব করতে থাকলেন। তিনি সস্নেহে গোপালকে বুকে চেপে ধরলেন।" থামলেন পাণ্ডাজী।

জানকী আমার দিকে তাকায়। সে আমাকে ঘরে নিয়ে যাবার

জন্যে অস্থির হয়ে আছে। পাণ্ডাজীর কথা কতটুকু তার কানে গিয়েছে বুঝতে পারছি না।

কিন্তু সে কিছু বলে ওঠার আগেই পাণ্ডাজী আবার বলতে শুরু করেন, "যশোমতীর স্নেহে তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন। এই লীলার ভেতর দিয়ে ভগবান বোঝাতে চেয়েছেন যে, যাঁর অন্তরে বিশ্বজগৎ বিরাজ করছে, তিনিই আবার নন্দ-যশোদার পুত্ররূপে বাৎসল্য রস আস্বাদন করছেন।"

॥ কুড়ি ॥

'গোকুল নগরে আমার বঁধূরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হৈল মোরে।
আপনা বলিয়া দু কুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥'

কে গান গাইছে? চণ্ডীদাসের গান। ভারী মিষ্টি গলা। বড় ভাল লাগছে।

কিন্তু কে? কে গান গাইছে?

চোখ মেলে তাকাই। কেমন ঝাপসা দেখছি। দু'হাত দিয়ে চোখ রগড়ে নিই একবার।

ঐ তো জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। একমনে গান গাইছে। আর আমি শুয়ে রয়েছি বিছানায়।

আমি কোথায়? চারদিকে তাকাই।

ঐ মেয়েটিই বা কে? আমার ঘরে দাঁড়িয়ে এমন দরদ দিয়ে কেন সে এ গান গাইছে? এ যে জনমদুঃখিনী রাধারাণীর বিরহাশ্রু মাখানো গান—প্রেমের জয়গান। সে গেয়ে চলেছে—

'কুলের কামিনী হাম অভাগিনী
নহিল দোসর জনা।
রসিয়া নাগরী গুরুজনা বৈরী
এ বড় মূরখপনা॥

বিধির বিধান   এমন করল
বুঝিলু করমদোষে।
আগু পাছু বুঝি   না কইল সমঝি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥
গোকুল নগরে   আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।...'

গান শেষ হয়। সে এদিকে ফেরে। কে?

"আপনার ঘুম ভেঙেছে?" উত্তেজিত স্বরে মেয়েটি প্রশ্ন করে ওঠে।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। তবু তাকে যেন ঠিক চিনতে পারছি না।

সে ছুটে আসে আমার কাছে। পাশে বসে। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, "চিনতে পারছেন আমাকে?"

এবারে আমি চিনতে পারি তাকে, তাই মাথা নাড়ি।

আমার একখানি হাত নিজের মুঠোয় নিয়ে খুশিভরা স্বরে সে আবার প্রশ্ন করে, "বলুন তো আমি কে?"

"জা...ন...কী।"

আমার উত্তর শুনে জানকী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

হাসি পাচ্ছে আমার। কিন্তু হাসতে পারছি না। বড় দুর্বল লাগছে। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। তবু ক্ষীণকণ্ঠে কোনমতে বলি, "আমি তোমাকে চিনতে পারব না কেন জানকী?"

সে আমার হাতখানি ছেড়ে দেয়। যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কি একটু ভাবে। তারপরে বলে, "না, মানে গত দু'দিন আপনি জ্বরের ঘোরে কাউকে চিনতে পারেন নি কিনা!"

"দু'দিন!" চমকে উঠি।

জানকী শান্তস্বরে বলে, "হ্যাঁ, দু'দিন তিন রাত।"

কি বলছে জানকী! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

কি হয়েছে আমার? জ্বর! কবে জ্বর হয়েছে? মনে করতে চাই।

পারি নে। আমার যে কিছুই মনে পড়ছে না।

জানকীর দিকে তাকাই। তার চোখে চোখ পড়ে আমার। চোখ নামিয়ে নেয় সে।

"এ আমরা কোথায় রয়েছি জানকী?" জিজ্ঞেস করি।

সে একটু হাসে। তারপরে আমাকেই পাল্টা-প্রশ্ন করে, "ভাল করে চেয়ে দেখুন তো, মনে করতে পারেন কি না?"

আমি আবার চারদিকে তাকাই। মনে করতে চাই।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে আমার। এই তো সেই ঘর—মহাবন সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দোতলার একখানি ঘর। ব্রহ্মাণ্ডঘাট থেকে পাণ্ডাজী গোবর্ধন মহারাজ দিদিমা জানকী ও তার মায়ের সঙ্গে আমি যে-ঘরে এসেছিলাম। জানকী আমাকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল, বসিয়েছিল ঐ জানালার ধারে। তারপরে আমার বিছানা খুলে এয়ার-ম্যাট্রেস ফোলাতে গিয়েছিল। আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম—ওটা ফুটো হয়ে গেছে, ফুলবে না। এমনি মেঝের ওপর পেতে দাও।

—ঠাণ্ডা লাগবে যে! জানকী বলে উঠেছিল।

আমি বলেছি—লাগলেও উপায় নেই।

জানকী আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গিয়েছিল এ-ঘর থেকে। কিছুক্ষণ বাদে নিজের কম্বল ও বালিশ নিয়ে ফিরে এসেছিল। আমায় বিছানা করে দিয়েছিল। আপত্তি করি নি। কারণ, জানতাম তাতে কোন লাভ হবে না।

আমি নিঃশব্দে শুয়ে পড়েছিলাম জানকীর কম্বলের ওপরে। তারপরে···

তারপরে সংকীর্তন-শোভাযাত্রা এসে পৌঁছেছিল গোকুল-মহাবনে। খানিকক্ষণ বাদে বোসবাবু সেনবাবু কেষ্টপ্রভু চেকারপ্রভু ও চক্রবর্তী এ-ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

তাঁরা সবাই কোথায় গেলেন ? তাঁদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো ! বোধহয় প্রসাদ পেতে গেছেন।

কিন্তু তাহলে তাঁদের বিছানাগুলো কোথায় গেল ? ওঁদের জিনিসপত্র নেই কেন ?

"কি, মনে পড়েছে ?" জানকী আবার প্রশ্ন করে।

আমি মাথা নাড়ি। বলি, "আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো ! ওঁরা সবাই…"

"চলে গেছেন।"

"কোথায় ?"

"মথুরায়।"

"কবে ?"

"গতকাল দুপুরে।"

চলে গেছেন ! আমার মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা-পথের সাথীরা সবাই আমাকে ফেলে চলে গেছেন ! চব্বিশ দিনের আনন্দ ও বেদনার অংশীদাররা আমাকে ছেড়ে গেছেন ! আর কি কোনদিন দেখা হবে তাঁদের সঙ্গে !

দেখা হবে চক্রবর্তী খাণ্ডাপ্রভু সেনবাবু নরেনপ্রভু চেকারপ্রভু ও বণিকপ্রভুর সঙ্গে ? দেখা হবে বৌদি দিদিমা মিসেস খাণ্ডা ও মিসেস বণিকের সঙ্গে ? দেখা হবে কেষ্টপ্রভু মথুরা মহারাজ, ভক্তি মহারাজ, গোবর্ধন মহারাজ ও গুরুমহারাজের সঙ্গে ?

বিদায় একদিন নিতেই হতো। পথের সাথীর কাছ থেকে পথের শেষেই বিদায় নিতে হয়। একদিন মানসীর কাছ থেকেও বিদায় নিতে হয়েছিল আমাকে। কাজেই দুঃখ তাঁদের বিদায় নেবার জন্য নয়। দুঃখ এই যে, বিদায়-বেলায় একবার দেখা পর্যন্ত হল না।

"চলে না গিয়ে যে উপায় ছিল না।" আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে জানকী আবার কথা বলে।

আমি তার দিকে তাকাই।

জানকী বলে, "ওঁরা ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছেন। একসঙ্গে মথুরা গিয়ে ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন না করলে যে পরিক্রমা পূর্ণ হয় না।"

"তোমার মা-ও চলে গিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে যেতে হয়েছে তাঁকে।"

"তুমি যে রয়ে গেলে এখানে ?"

"চলে যেতে পারলাম না বলে !"

"তোমার পরিক্রমা অপূর্ণ থেকে গেল যে ?"

"কি করব বলুন, গোকুলচন্দ্রের ইচ্ছে নয়, আমি পরিক্রমা পূর্ণ করি।" একবার থামে জানকী। তারপরে বলে, "নইলে আপনি হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়বেন কেন ?"

"আমার জন্য তুমি একা রয়ে গেলে এখানে !"

"একাই থাকব ভাবছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আরও একজন রয়েছেন আমাদের দলে, যাঁর কাছে পরিক্রমা পূর্ণ করার পুণ্যের চেয়ে সহযাত্রীর জীবনের মূল্য অনেক বেশি।"

"তিনি কে ?"

"বোসদা।"

"কোথায় ? তাঁকে এখানে দেখছি না তো !"

"কিছুক্ষণ আগে একটা কাজে বৃন্দাবন চলে গেলেন। কাল সকালেই ফিরে আসবেন।"

"তোমার তাহলে বলদেব যাওয়া হয় নি ?"

"না। চক্রবর্তীদারা গিয়েছিলেন, কিন্তু আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি।"

জানকী উঠে দাঁড়ায়। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে এগিয়ে যায় ঘরের অপর প্রান্তে।

একটু বাদেই সে আবার ফিরে আসে কাছে। বলে, "এই ওষুধটুকু খেয়ে নিন তো !"

সুবোধ বালকের মতো আমি তার নির্দেশ পালন করি।

জলের গ্লাশটা রেখে দিয়ে জানকী আমার পাশে এসে বসে। উচ্ছ্বসিত স্বরে সহসা বলে ওঠে, "ও! আজ যে আমি কত নিশ্চিন্ত, আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে—তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "ডাক্তার-বাবু অবশ্য বলে গেছেন, আজই আপনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

"আচ্ছা," আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, "এ ক'দিন কি আমার একেবারেই জ্ঞান ছিল না?"

"মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, তবে তখন আপনি ভীষণ ছটফট করেছেন আর ভুল বকেছেন। বাধ্য হয়ে আপনাকে বার বার ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছে। আজ ভোর চারটে নাগাদ জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। তবে বোধকরি ওষুধের জন্যই আপনার এত দেরিতে ঘুম ভাঙল।"

"কেমন করে বুঝলে যে, ঠিক ভোর চারটের সময় আমার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে?"

"বারে! আমি যে তখন আপনার গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, খুব ঘাম হচ্ছিল। গা মুছিয়ে আপনার জামা পালটে দিলাম। তারপরে থার্মোমিটারে দেখলাম জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। তখন ঠিক চারটে বেজে দশ।"

"সারারাতই তুমি এ-ঘরে ছিলে?"

জানকী একটু হাসে। তারপরে বলে, "ভাল প্রশ্ন করেছেন! পেশেণ্ট রইল এ-ঘরে, আর এটেণ্ডেণ্ট্ রইবে পাশের ঘরে!"

"আজ রাতে কোথায় থাকবে?" আমি তার মুখের দিকে তাকাই, বলি, "আজ যে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে!"

তার চোখে চোখ পড়ে আমার। চোখ নামিয়ে নেয় জানকী। শান্তস্বরে জবাব দেয়, "আপনি তাড়িয়ে না দিলে, এ-ঘরেই থাকব।"

"ভয় করবে না ?"

"তা একটু তো করতেই পারে ! এত বড় বাড়ি, লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ঘরের ভেতর ভয় করবে কেন ?"

"ঘরের ভেতরেও তো ভয়ের কারণ থাকতে পারে !"

"কি কারণ ?"

"বোসবাবু নেই যে।"

"তাতে কি হয়েছে ! আপনিই তো রয়েছেন।" একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে, "অবশ্য আপনি যদি গত রাতের মতো ঘুমোতে শুরু করেন আর আমার ঘুম না আসে, তাহলে একটু গা ছমছম করবে বৈকি। কাল রাতেও করেছে।"

আশ্চর্য মেয়ে ! একজন পরপুরুষের সঙ্গে একাকী একঘরে রাত কাটাবে, অথচ ওর চোখে-মুখে সামান্যতম চিত্ত-চাঞ্চল্যের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনা না করাই ভাল। তাই অন্য কথা বলি, "তার মানে এখন এখানে তুমি ছাড়া আমার আর কোন আপনজন নেই, এই তো ?"

"আপাতদৃষ্টিতে তাই দাঁড়াচ্ছে।" জানকী জবাব দেয়, "অবশ্য যদি আমাকে আপনজন বলে মেনে নিতে আপনার কোন আপত্তি না থাকে।"

আমি ওর দিকে তাকাই। গম্ভীরস্বরে বলি, "আমি বোধহয় অতটা অকৃতজ্ঞ নই জানকী !"

"আপনি আমাকে মাফ করুন। আমি না ভেবে কথাটা বলেছি।"

"তুমি আমার জন্য যা করলে, তার তুলনা হয় না। এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ দিতে পারব না জানকী !"

"দেবার দরকারও নেই।" সে মাথা উঁচু করে। আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলে, "কেবল গোকুলানন্দের কাছে কামনা করুন, তিনি যেন আপনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলেন।"

অবাক বিস্ময়ে চুপ করে থাকি। জানি না জানকী আমার এ নীরবতাকে কি ভাবছে? হয়তো ভাবছে, গোকুলবিহারীর কাছে আমি নিজের আরোগ্যলাভ কামনা করছি। কিন্তু আমি তাঁকে মনে মনে বলছি—হে মানুষের ভগবান, এমন একটি মহৎপ্রাণের প্রতি তোমার এত অবিচার কেন? একটা প্রতারকের পাল্লায় পড়ে কেন এভাবে তার জীবনটা নষ্ট হতে চলেছে? ঠাকুর, তুমি তাকে শান্তি দাও, তাকে সুখী কর।

"আজ ডাক্তারবাবু কি বলেছেন জানেন?"

জানকী নীরবতার অবসান করে। আমি তার দিকে তাকাই।

সে আবার বলে, "ডাক্তারবাবু বলেছেন, জ্বর ছেড়ে যাবার পরেও আপনাকে অন্তত দিন তিনেক এখানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।"

"তার মানে তোমাকে আমি আরও তিনদিন এখানে আটকে রাখছি, এই তো?"

"থাকতে পারলে ভালই হতো", জানকী আমার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে, "কিন্তু আমার যে থাকার উপায় নেই।"

"কেন?" আমি আঁতকে উঠি।

"আমরা পরশু কলকাতায় রওনা হচ্ছি। আমাকে কাল বৃন্দাবন চলে যেতেই হবে।"

"কালই!"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি এখানে একা থাকব কেমন করে?"

জানকী হাসে। বলে, "ওমা, একা থাকবেন কেন?"

"তুমিও যে চলে যাবে বলছো?"

"চলে তো যেতেই হবে, চিরকাল থাকব বলে তো ব্রজে আসি নি। তাছাড়া মা-র সঙ্গে এসেছি, তাঁর সঙ্গেই তো ফিরতে হবে আমাকে।" একবার থামে সে। তারপর বলে, "আপনাকে সঙ্গে

নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো। জায়গামত পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু ডাক্তারবাবু যে বলে গেলেন, অন্তত দিন তিনেক আপনাকে নড়ানো চলবে না এখান থেকে।"

"কিন্তু তুমি চলে গেলে, দুর্বল শরীর নিয়ে একা এই অচেনা-পুরীতে আমি কেমন করে থাকব জানকী?" আমি তার একখানি হাত ধরি।

সে একটু কাল চুপ করে থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি ছাড়িয়ে নেয় আমার হাত থেকে। অকম্পিত কণ্ঠে বলে, "আপনি অযথা উত্তেজিত হবেন না। বোসদা ফিরে আসুন, ব্যবস্থা একটা কিছু করেই যাব।"

উঠে দাঁড়ায় জানকী। সহসা চড়া গলায় ধমক লাগায় আমাকে, "বাজে চিন্তা না করে চুপচাপ শুয়ে থাকুন তো! ডাক্তারবাবু আপনাকে কথা বলতে বারণ করে গেছেন। আমি একবার নিচের থেকে আসছি।"

"আবার নিচে যাচ্ছ কেন?"

"এ-ক'দিন তো পেটে জল ছাড়া আর কিছু পড়ে নি। আজ জ্বরটা ছেড়ে গেছে। আমি দোকান থেকে একটু গরম দুধ নিয়ে আসছি।"

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে একটা গ্লাশ হাতে নিয়ে জানকী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সকৃতজ্ঞ চোখে তাকিয়ে থাকি তার চলে-যাওয়া পথের দিকে।

তারই কথা ভাবতে থাকি। মুখখানি মিষ্টি হলেও জানকী সুন্দরী নয়। তার গায়ের রঙটি বেশ কালো। তাকে রোগা ও বেঁটে বলা যেতে পারে। আর তাই বোধহয় সেই ছেলেটি শেষ পর্যন্ত ধর্মের দোহাই দিয়ে আরেকটি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আশ্চর্য, এতকাল তার সঙ্গে মেলা-মেশা করেও কি সে জানকীর অন্তর-সৌন্দর্যের সন্ধান পায় নি? সে কি জানে না যে, মানুষের

প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে তার বুকের ভেতরে? শুনেছি ছেলেটি লেখাপড়া শিখেছে। সে কি ভিক্টর হ্যুগোর 'হাঞ্চব্যাক্ অব্ নোৎরদাম্' পড়ে নি? সে কি শোনে নি পিতামাতার স্নেহচ্ছায়া-বঞ্চিত, সমাজ ও সংসার থেকে নির্বাসিত সেই বিকলাঙ্গ বিকৃতদর্শন কোয়াসিমোদোর অন্তর-সৌন্দর্যের কথা?

করুণাময় কৃষ্ণকে প্রণাম করি। মনে মনে বলি—প্রভু, তোমার অশেষ মহিমা। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছো। মানুষের এমন মহৎ ও সুন্দর রূপ দেখার সৌভাগ্য হল আজ। আমার গোকুল-দর্শন সার্থক হল।

কোমল করপল্লবের মধুর স্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি চোখ মেলে তাকাই। সকাল হয়ে গেছে—গোকুলের সকাল।

আমার কপালের ওপর থেকে হাতখানি সরিয়ে নেয় জানকী। হাসতে হাসতে বলে, "বাপ রে বাপ্! কি ঘুমটাই ঘুমোতে পারেন!"

অবাক কণ্ঠে বলি, "বারে! কাল রাতে খাইয়ে দাইয়ে, মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে অত যত্ন করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে, আর আমি ঘুমোব না!"

"ঘুমোবেন বৈকি। ডাক্তারবাবু তো আপনাকে বিশ্রাম নিতেই বলেছেন। কিন্তু তাই বলে এমন কুম্ভকর্ণের মতো!" একটু থেমে সে আবার বলে, "তিন-তিনবার উঠে গায়ের কম্বল ঠিক করে দিয়েছি। টের পেয়েছেন কি?"

"না।"

প্রবল অট্টহাসিতে জানকী ফেটে পড়ে। তার হাসি থামলে আমি বলি, "তার মানে কাল রাতেও তুমি ঘুমোও নি।"

"ও মা! ঘুমোব না কেন! ঘুমিয়েছি, তবে আপনার মতো

বেহুঁশ হয়ে নয়।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "পাশে রোগী নিয়ে শুলে, একটু সজাগ থাকতে হয় বৈকি!"

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে আমার। বলি, "আচ্ছা, সেদিন তো নিজের বালিশ ও কম্বল দিয়ে আমার বিছানা করে দিয়েছিলে। রাতে তুমি গায়ে দিচ্ছো কি?"

"দু'রাত তো বলতে গেলে শুতেই পারি নি। চাদর গায়ে দিয়ে আপনার বিছানায় বসে রাত কাটিয়েছি। কাল রাতে বোসদার কম্বল ও বালিশ দিয়েই কাজ চালিয়ে নিয়েছি।"

"আর একটা কথা!"

"কি? বলুন!"

"ঘরের কোণের ঐ বেড-প্যান্‌টা, যেটা আমি কালও ব্যবহার করেছি, ওটা কোথায় পেয়েছো?"

"পাণ্ডাজী এনে দিয়েছেন।" জানকী জবাব দেয়, "আপনার যে ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ।"

"কিন্তু ও বস্তুটি এ-ক'দিন কে পরিষ্কার করেছে?"

জানকী একটু হাসে। তারপরে বলে, "কে আবার করবে! এখানে কি জমাদার আছে!" একবার থেমে সে আবার বলে, "আমার বাবা বহুদিন শয্যাশায়ী থেকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমার এ-সব অভ্যেস আছে।"

আমি কোন কথা বলতে পারি না। কি বলব? শুধু বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি জানকীর দিকে।

জানকী চোখ নামিয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। তার পরেই ধমক লাগায় আমাকে, "এ-সব বাজে কথা তুলে কেন অযথা সময় নষ্ট করছেন? সাড়ে-আটটা বাজে, ন'টায় ওষুধ। পাণ্ডাজী গরম জল রেখে গিয়েছেন, বোধহয় জুড়িয়েই গেল। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি চা নিয়ে আসবেন। আপনি ঘরের কোণে ঐ নর্দমার ধারে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে নিন, উঠুন।" নিচু হয়ে জানকী আমার হাত ধরে।

আমি উঠে বসি। জানকী হাত ছাড়িয়ে নেয়।

"বাথরুমটা কোথায় ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"নিচে।" জানকী উত্তর দেয়। গম্ভীর স্বরে বলে, "সেখানে যেতে হবে না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।"

"না, না, আজ আমি বেশ ভাল আছি। অনায়াসে বাথরুমে যেতে পারব।"

"না।" জানকী যেন শাসন করে আমাকে। বলে, "ডাক্তারবাবু আপনাকে নিচে নামতে বারণ করে গেছেন। অন্তত তিনদিন আপনার এ-ঘর থেকে বেরুনো চলবে না।"

"কিন্তু তুমি নাকি আজই বৃন্দাবন চলে যাবে ?"

জানকীর চোখদু'টি হঠাৎ যেন কেমন করুণ হয়ে ওঠে। ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেয় সে, "হ্যাঁ। আর যে এখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"কিন্তু তুমি চলে গেলে, এই নির্বান্ধব পুরীতে কে আমার এমন যত্ন করবে ?"

আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্যই বোধহয় জানকী একটু হাসতে চায়, কিন্তু হাসতে পারে না ঠিকমতো। তবে স্বাভাবিক স্বরেই কথা বলে, "আপনাকে তো বলেছি, ব্যবস্থা একটা কিছু করেই যাব। যাক্‌গে, আর বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিন। এখুনি পাণ্ডাজী এসে পড়বেন।"

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জানকী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বারান্দায় গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিতে দিতে বলে, "আমি একেবারে স্নান সেরে আসছি।"

স্নান সেরে ফিরে এলো জানকী। লাল পাড়ের একখানি সাদা শাড়ি পরেছে সে। সিক্ত এলো চুল পিঠের ওপরে পড়েছে ছড়িয়ে। ভারী ভাল লাগছে তাকে। কে বলে জানকী কুৎসিত ?

সে সুন্দরী—পরমা সুন্দরী, কল্যাণী নারী।

আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি জানকীর দিকে। সে মাথা নিচু করে।

একটু বাদেই আবার মুখ তোলে জানকী। বলে, "অনেকদিন থেকেই বলব-বলব ভেবেও একটা কথা বলা হয় নি আপনাকে!"

"বেশ তো, বলো!"

"হ্যাঁ, আজ না বললে হয়তো আর কোনদিন বলার সুযোগ পাব না।" একবার থামে জানকী. তারপরে জিজ্ঞেস করে, "আপনি নিশ্চয়ই এ পরিক্রমা নিয়ে বই লিখবেন?"

সহযাত্রীদের মধ্যে একমাত্র জানকীই আমার লেখক-পরিচয় জানে। নিজের অসাবধানতায় সেদিন সেরগড়ে কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছিলাম তার কাছে। জানকী অবশ্য কথা রেখেছে, কাউকে বলে দেয় নি।

"আশা রাখি।" জানকীর প্রশ্নের উত্তর দিই।

"আমার কথাও লিখবেন কি?"

"নিশ্চয়ই!"

"কি লিখবেন?"

"তুমি যা, তাই লিখব।"

"বোধহয় লিখবেন যে. আমার মতো এমন হতভাগিনীর সঙ্গে আপনার আর কোনদিন দেখা হয় নি।"

"না। লিখব যে, তোমার মতো এমন স্নেহশীলা ও সেবাপরায়ণা কল্যাণী নারীর সঙ্গে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না এ জীবনে।"

জানকী বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পেরে ওঠে না। দু' গ্লাশ চা ও খানকয়েক বিস্কুট হাতে নিয়ে পাণ্ডাজী ঘরে ঢোকেন।

তাড়াতাড়ি দু'হাত জোড় করে বলে উঠি, "দণ্ডবৎ!"

"জয় রাধে।" পাণ্ডাজী প্রতি-নমস্কার করেন। চা-য়ের থালাখানি

জানকীর হাতে দিয়ে তিনি আমার কাছে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, "এখন কেমন আছেন?"

"ভাল।" আমি সহাস্যে উত্তর দিই, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আপনার সাহায্য না পেলে এত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠতে পারতাম না।"

"এমন কথা বলবেন না প্রভু!" পাণ্ডাজী হাতজোড় করেন, "একথা বললে গোকুলবিহারীর অমর্যাদা হবে। সবই তাঁর ইচ্ছে। তবে দিদিমণি না থাকলে সত্যই আপনাকে খুব মুশকিলে পড়তে হত।" তিনি জানকীর দিকে তাকান। বলতে থাকেন, "লেখা-পড়া জানা একালের কোন শহুরে মেয়ে যে এমন হতে পারে, আমার সে ধারণাই ছিল না।"

"লেখা-পড়া না-জানা কোন গ্রাম্য পাণ্ডা যে এমন হতে পারে, আমারও কিন্তু সে ধারণাও ছিল না।"

আমি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠি।

জানকী এককাপ চা ও বিস্কুটের প্লেটটা আমার সামনে রেখে আবার বলে, "এ-ক'দিন পাণ্ডাজী আপনার জন্য কি করেছেন, আপনি জানেন না।"

মাথা নেড়ে বলি, "শুধু পাণ্ডাজী কেন, তুমি কি করেছো, তাও যে জানা নেই আমার।"

এবারে পাণ্ডাজী হেসে ওঠেন।

কিন্তু জানকী তাঁর সে হাসিকে আমল না দিয়েই বলে যেতে থাকে, "ডাক্তার ডাকা, ওষুধপত্র আনা, আমার ও বোসদার খাবারের ব্যবস্থা—সবই করেছেন উনি।"

আমি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পাণ্ডাজীর দিকে তাকাই। তিনি বোধহয় একটু লজ্জা পান। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "এগুলো যে আমাদের কর্তব্য দিদিমণি। যাত্রীদের সেবা করাই পাণ্ডাদের ধর্ম।" আবার আমার দিকে ফেরেন তিনি। বলেন, "তবে দিদিমণি

আপনার জন্য যা করেছেন, তার কোন তুলনা হয় না। যাক্ গে, আমি তাহলে এখন চলি। একবার ঘাটে যেতে হবে, একটা বাৎসরিক কাজ আছে। যজমান এসে গেছেন। কাজ শেষ করে আমি আবার আসব'খন।"

আমরা মাথা নাড়ি। পাণ্ডাজী চলে যান।

চা-বিস্কুটে মন-সংযোগ করি। জানকীও নীরবে চা খাচ্ছে। কি ভাবছে কে জানে!

ভাবতে থাকি পাণ্ডাজীর কথা, পাণ্ডাদের কথা—পাণ্ডাজীর স্বাস্থ্য ও পোশাক দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, তিনি খুবই দরিদ্র। দারিদ্র্য এই দেব-সেবকদের নিত্য-সহচর। যাঁরা পুণ্যার্থীদের কাছে দেবতার প্রসাদ বিতরণ করে থাকেন, তাঁরা নিজেরা দেবতার প্রসাদ লাভে বঞ্চিত। অথচ তাঁদেরও সংসার আছে, তাঁদেরও খাওয়া-পরার সমস্যা আছে। সুতরাং সুযোগ পেলেই তাঁরা যাত্রীদের ওপর জুলুম করেন। ফলে আজকাল পাণ্ডাদের সম্পর্কে সকলেই বড় বেশি উদাসীন হয়ে পড়েছেন। ট্যুরিস্টদের কথা ছেড়েই দিলাম, তীর্থযাত্রীরাও যতটা সম্ভব পাণ্ডাদের এড়িয়ে চলেন।

এমনটি কিন্তু হওয়া উচিত নয়। যাত্রী এবং পাণ্ডাদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন। কারণ, তাতে যাত্রীদের পক্ষে যেমন তীর্থ-দর্শন সহজ হবে, তেমনি পাণ্ডাদের পক্ষেও সংসার প্রতিপালন সহজতর হবে।

এই সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণীয় একটি নির্দিষ্ট নিয়ম। আর সেটিকে পাণ্ডাদের তরফ থেকেই চালু করতে হবে। এই পাণ্ডাজীর মতো তাঁদের প্রত্যেককে অনুভব করতে হবে—যাত্রীরা আমাদের লক্ষ্মী। আমরা তাঁদের সেবক। তাঁদের সেবা করাই আমাদের ধর্ম।

যাত্রীরা তখন দ্বিধাহীন চিত্তে পাণ্ডাদের পূজারী ও পথ-প্রদর্শক রূপে জ্ঞান করতে পারবেন এবং তাঁরা যথাসাধ্য প্রণামী দেবেন

পাণ্ডাদের। শুধু মথুরা-মণ্ডলে নয়, ভারতের সমস্ত তীর্থেই এ নিয়মটির প্রচলন হওয়া প্রয়োজন।

"কি ভাবছেন?"

জানকীর প্রশ্নে আমার ভাবনা থেমে যায়। মৃদু হেসে বলি, "ভাবছিলাম তোমার কথা।"

"আমার কথা!"

"হ্যাঁ।"

"কি ভাবছিলেন?"

"ভাবছিলাম, আমার মতো একজন পরের জন্য কেন তুমি এত কষ্ট করলে?"

"কষ্ট করতে কোন কষ্ট হল না বলে।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় জানকী, "তাছাড়া আপনিই তো বলেছেন, কে পর আর কে আপন, তা নাকি আজও নিশ্চয় করে বুঝে উঠতে পারেন নি। অতএব আপন-পরের কথা থাক্।"

সেদিন নিজের সম্পর্কে বলেছিলাম। তখন একেবারেই খেয়াল হয় নি যে, কথাটা জানকীর সম্পর্কেও সমান সত্য। যাকে সে একদিন আপন ভেবে ভালোবেসেছিল, আজ সে পর হয়ে গেছে। আর তাই হয়তো এখন পরকে সে আপন জ্ঞান করছে।

জানকী আবার কথা বলে, "সেদিন সন্ধ্যায় গিরিরাজ-গোবর্ধনের পাদতলে দাঁড়িয়ে আমি আপনাকে যে-কথা বলেছি, আজও সে-কথাই বলব—ভাববেন না, আপনি বলেই আমি এখানে এভাবে একা রয়ে গেছি, যে-কেউ আপনার মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেই আমাকে থাকতে হতো এখানে। জানি এই থেকে যাবার জন্য সবাই আমাদের নামে দুর্নাম রটাবে। আমি দুর্নামকে ভয় করি না। কিন্তু দুঃখ এই যে, আমার জন্য আপনাকেও দুর্নামের বোঝা বইতে হবে।"

"আমিও তো সেদিন তোমাকে বলেছিলাম জানকী, দুর্নামে আমারও কোন ভয় নেই। বরং এই ভেবে আরেকবার আশ্বস্ত হলাম

যে, আমার সহযাত্রীদের মধ্যে আমি এমন একজনকে পেয়েছি, যে পুণ্যের লোভে কিংবা দুর্নামের ভয়ে আমাকে ফেলে পালিয়ে যায় নি। দুর্নাম মাথায় করে একা আমার কাছে রয়ে গিয়েছে।"*

জানকী চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবছে। আমিও নীরব থাকি।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় জানকী। উচ্চস্বরে ধমক লাগায় আমাকে, "গ্লাশটা হাতে নিয়েই বসে থাকলে চলবে, না চা-টুকু শেষ করে ওষুধটা খেয়ে নিতে হবে!"

তাড়াতাড়ি এক চুমুকে জুড়িয়ে-যাওয়া চা-টুকু শেষ করে গ্লাশটা ওর হাতে দিই।

গ্লাশ ধুয়ে ওষুধ নিয়ে আসে জানকী। বলে, "ওষুধ খেয়ে চুপ-চাপ শুয়ে থাকুন। আজে-বাজে কথা বলে একদম আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমাকে সব গুছিয়ে নিতে হবে। বোসদা এখুনি এসে পড়বেন।"

"তুমি কি আজ সত্যিই চলে যাবে জানকী?"

ম্লান হেসে ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেয় সে, "আজ যে না গিয়ে উপায় নেই আমার। রেলের টিকেট কাটা হয়ে গেছে। বৃন্দাবনে মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। কাল দুপুরে আমাদের মথুরা থেকে তুফান ধরতে হবে।"

মনে পড়ছে সেদিনকার কথা—আজ থেকে ঠিক ছাব্বিশ দিন আগে, এই তুফান-এক্সপ্রেসে করেই হাওড়া থেকে রওনা হয়েছিলাম বৃন্দাবনের পথে। সেদিন সহযাত্রীদের কাউকেই চিনতাম না। তবু গাড়িতে বসে পরিচয় হয়েছিল চক্রবর্তী বোসবাবু খাণ্ডাপ্রভু ও দিদিমার সঙ্গে। জানকী ছিল অন্য কামরায়। তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তার বেশ কয়েকদিন পরে, বৃন্দাবনে বসে। অথচ সেদিনকার সেই অপরিচিতা জানকী আজ চলে যাচ্ছে বলে আমার

* 'বনপর্ব' দ্রষ্টব্য।

সমস্ত মন একটা অব্যক্ত বেদনায় গুমরে উঠছে। কি বিচিত্র মানুষের মন! কত অল্প সময়ে তার কত বড় পরিবর্তন আসতে পারে!

"কি ভাবছেন?" জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে প্রশ্ন করে জানকী।

আমার ভাবনা থেমে যায়। বলি, "ভাবছিলাম তোমার চলে যাওয়ার কথা।"

জানকী নীরবে নিজের কাজ করতে থাকে।

আমি আবার বলি, "বোসবাবু যে ট্যাক্সিতে আসবেন, তুমি তো সেই ট্যাক্সি করেই বৃন্দাবন চলে যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি একা যেতে পারবে?"

"একা যাব কেন? বোসদাও তো বৃন্দাবন ফিরে যাবেন আমার সঙ্গে।"

কিছুই বুঝতে পারছি না। বোসবাবু কেন হঠাৎ বৃন্দাবন গেলেন? কেনই বা এখানে আসছেন? আর কেনই বা আবার ফিরে যাবেন?

তাহলেও এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করি না আমি। নীরবে বিছানার ওপর উঠে দাঁড়াই।

জানকী কাজ ফেলে ছুটে আসে কাছে। কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "এ কি, আবার উঠে দাঁড়োলেন কেন?"

সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আমি তার একখানি হাত ধরে ফেলি। জানকী যেন কেঁপে ওঠে একবার। কিন্তু তারপরেই আবার স্থির হয়ে যায়। হাত ছাড়িয়ে নেয় না সে। শুধু মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়। তারপরে শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে, "কি?"

"না।"

জানকী চুপ করে থাকে।

আমি আবার বলি, "তুমি এভাবে আমাকে এখানে একা ফেলে কিছুতেই চলে যেতে পারবে না।"

সে একটু হাসে। বলে, "আপনাকে এখানে একা ফেলে আমি চলে যাব, এমন ধারণা আপনার হল কেমন করে ?"

আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। চুপ করে থাকি।

সে আস্তে আস্তে আমার হাত থেকে তার হাতখানি ছাড়িয়ে নেয়। তারপরে ধীরপায়ে ফিরে যায় নিজের কাজে। জিনিসপত্র গোছগাছ করতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে জানকী আবার বলে, "তা যদি পারতাম, তাহলে তো সেদিনই সবার সঙ্গে চলে যেতাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার ওপরে বিশ্বাস রাখুন। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখে যাব, এখানে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।"

কি ব্যবস্থা ? পাণ্ডাজীকে বলে অন্য কোনও লোক ঠিক করেছে ? বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি কাছে না থাকলেই আমার অসুবিধে হবে। কিন্তু তার আগেই জানকী ধমক লাগায় আমাকে, "এবারে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকুন তো। আমাকে কাজ করতে দিন। ওঁরা এখুনি এসে পড়বেন।"

"কারা ?"

"বোসদা।"

"আর কে ?"

"জানি না যান। বললাম না চুপচাপ শুয়ে থাকতে। বাজে বক্-বক্ করে আমার সময় নষ্ট করবেন না। আমাকে গুছিয়ে নিতে দিন।"

নীরবে শুয়ে পড়ি। ভাবতে থাকি। না, বৃন্দাবনের কথা নয়, ব্রজ-পরিক্রমার কথাও নয়। ভাবতে থাকি জানকীর কথা। জানকী আজ চলে যাবে। চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। আর কোনদিন হয়তো দেখা হবে না তার সঙ্গে। আমার চোখদু'টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে—আমি চোখ বুজি।

কে যেন আমার গায়ে হাত দিয়েছে। আমার ঘুম ভেঙে যায়। জানকীর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন তন্দ্রা নেমে এসেছিল আমার চোখে।

কেউ আমার গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করছে। কে আবার, জানকী। এখানে সে ছাড়া আর কে আছে আমার? গায়ে হাত দিয়ে দেখছে, আমার আবার জ্বর-টর এলো কিনা।

জানকীর অহেতুক উৎকণ্ঠার কথা ভেবে হাসি পায় আমার। চোখ মেলে তাকাই।

"কে?" চিৎকার করে উঠি।

"আমি।" মানসী উত্তর দেয়।

"কখন এলে?"

"এই তো একটু আগে। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে।"

"কার সঙ্গে এলে?"

"বোসদা আমাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। জানকী পাঠিয়েছিল তাঁকে।"

"তিনি তোমার ঠিকানা জানলেন কেমন করে?"

"জানকী দিয়েছে। তোমার ডায়েরী থেকে পেয়েছে।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় এতক্ষণে। তাই তখন জানকী বলেছে—বোসদা ফিরে আসুন, ব্যবস্থা একটা কিছু করেই যাব। কিন্তু জানকী যদি মানসীর হাতেই আমাকে দিয়ে যাবে, তাহলে সে কেন আমার জন্য এত করল?

"সে কোথায়?" আমি বলে উঠি।

মানসী উত্তর দেয়, "বোসদাকে নিয়ে মন্দিরে প্রণাম করতে গেছে। ওরা তো এক্ষুণি চলে যাচ্ছে কিনা। আমি যে ট্যাক্সি করে এসেছি, সেই ট্যাক্সিতেই ওরা ফিরে যাচ্ছে।" একটু থেমে মানসী আবার বলে, "ভাগ্যিস মেয়েটা সঙ্গে এসেছিল, নইলে আমার অদৃষ্টে

কি লেখা ছিল কে জানে !" মানসীর চোখছ'টি যেন অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

আমি একখানি হাত দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যাই। মানসী আর সামলাতে পারে না নিজেকে। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে।

কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরে আমি একখানি হাত ওর মাথার ওপরে রাখি। বলি, "কাঁদছো কেন ? আমি তো ভাল হয়ে গেছি। লক্ষীটি, উঠে বোস। ওরা হয়তো এক্ষুণি এসে যাবে।"

মাথা তোলে মানসী। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে সে ঠিক হয়ে বসে। স্বাভাবিক স্বরে বলে, "বোসদা সব বলেছেন আমাকে। গোকুলানন্দের অশেষ করুণা, জানকী তোমাদের সঙ্গে এসেছিল।"

"আসতে পারি ?" বারান্দা থেকে জানকীর গলা ভেসে আসে।

"নিশ্চয়ই।" মানসী উঠে দাঁড়ায়।

হাসিমুখে ঘরে ঢোকে জানকী। তার পেছনে বোসবাবু। শান্ত-শিষ্ট ছোটখাটো ধার্মিক মানুষটি। প্রবীণ কিন্তু অকৃতদার। সংসারে মা ছাড়া আর কোন আপনজন নেই। বালিগঞ্জ প্লেসে থাকেন। আমার জন্য তাঁকেও কম ঝক্কি পোয়াতে হয় নি। তিনিই বৃন্দাবনে গিয়ে মানসীকে নিয়ে এসেছেন।

সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলি, "আসুন বোসবাবু !"

কিন্তু বোসবাবু কিছু বলে ওঠার আগেই জানকী জিজ্ঞেস করে, "দু'জনে কানে কানে কি কথা হচ্ছিল ? আমাকে গালাগালি দিচ্ছিলেন তো !"

"হ্যাঁ।" একটু হেসে মানসী উত্তর দেয়, "তুমি আমাদের জন্য এত করলে, তোমাকে গালাগালি না দিলে যে অধর্ম হবে ভাই !"

"দিদি !" জানকী গম্ভীর স্বরে বলে, "তুমিও একই কথা বলছো ? আমি এমন কিছুই করি নি, যার জন্য এই একটা কথা আমাকে বার

বার শুনতে হবে।" কথা শেষ করে জানকী একবার আমার দিকে তাকায়। দেখে মনে হচ্ছে সে ভীষণ রেগে গেছে। জানকী মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকে।

কিন্তু গম্ভীর থাকে না মানসী। সে জানকীর মুখের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে। আর অচিরেই সে হাসিটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা ঘরে। শেষ পর্যন্ত জানকীও আর গম্ভীর থাকতে পারে না, সে-ও হেসে ফেলে।

হাসি থামলে জানকী মানসীকে বলে, "সত্যি দিদি, তোমাকে বাহাদুরী দিতে হয়।"

"কেন বল তো?" মানসী প্রশ্ন করে।

আমাকে দেখিয়ে জানকী উত্তর দেয়, "ভদ্রলোককে তুমি একেবারেই বশ করে রেখেছো। কেবল মানসী, মানসী আর মানসী। জ্বরের ঘোরে মানসী, জ্ঞান হারালে মানসী, জ্ঞান ফিরে এলেও মানসী। বিশ্বাস না হয় বোসদাকে জিজ্ঞেস করো।"

আমরা বোসবাবুর দিকে তাকাই। বোসবাবু বোধহয় লজ্জা পান। তিনি একটু হেসে মাথা নিচু করেন।

জানকী এবারে আমার দিকে ফিরে আবার বলতে থাকে, "সত্যি, কি কাণ্ডই না করেছেন দু'দিন। যতবার বলি—আমি মানসী নই, জানকী, ততবার ছোট্ট ছেলেটির মতো আমার একখানি হাত ধরে বলে উঠেছেন—আমার মাথায় বড্ড যন্ত্রণা, তুমি আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও মানসী, আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। সবাই দূরে দাঁড়িয়ে হাসেন, কিন্তু আমি না পারি হাসতে, না পারি কাঁদতে। তাই তো কাল বোসদাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলাম।" থামে জানকী। সে মানসীর দিকে তাকায়।

মানসী হাসে। জানকী আবার বলে, "বেঁচেছি দিদি, তুমি এসে গিয়েছো। এবারে তোমার মানুষ তুমি সামলাও, আমাকে ছুটি দাও।"

জানকী ছুটি চাইছে, শুধু মানসীর কাছে নয়, আমার কাছ থেকেও। আমি চুপ করে থাকি।

এতক্ষণে বোসবাবু কথা বলার সুযোগ পান। আমার কাছে এগিয়ে আসেন তিনি। জিজ্ঞেস করেন, "আজ বোধহয় একটু সুস্থ বোধ করছেন ?"

"একটু নয়, আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তবু নাকি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না, তিনদিন শুয়ে থাকতে হবে এখানে।"

"হবেই তো।" বোসবাবু কিছু বলার আগেই জানকী বলে ওঠে। সে মানসীর দিকে ফিরে বলে, "তোমাকে বলে যাচ্ছি দিদি, কাল সকালে ডাক্তারবাবু আসবেন, তাঁর অনুমতি না নিয়ে ওঁকে এখান থেকে এক পা-ও নড়তে দেবে না। তারপরে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে অন্তত পনেরোদিন তোমার বাসায় বন্দী করে রাখবে।"

"পনেরোদিন !" আমি আঁতকে উঠি। সবিনয়ে বলি, "আমার যে কলকাতায় অনেক কাজ পড়ে আছে !"

"থাক্ গে, চুলোয় যাক্ কাজ। আপনাকে পুরো পনেরোদিন বৃন্দাবনে বিশ্রাম নিতে হবে। এর যদি কোন ব্যতিক্রম হয়, তাহলে ভাল হবে না বলে গেলাম।" জানকী সাবধান করে আমাকে।

জানি ওর এই সতর্কবাণী অর্থহীন, কারণ সে ব্যতিক্রমের কথা জানকী জানতে পারবে না। তবু তার এ নির্দেশ মানতেই হবে আমাকে। সে যে আমার ভালর জন্যই আমাকে মানসীর বাসায় বিশ্রাম নিতে বলছে।

"তাই হবে বোন। তোমার কথা আমি নিশ্চয়ই রাখব।" মানসী আশ্বাস দেয় জানকীকে।

"এবারে তাহলে আমাকে বিদায় দিন !"

জানকীর কথা শুনে চমকে উঠি। শ্রান্তিহীন সেবা-শুশ্রূষা করে

সে আমাকে সুস্থ করে তুলেছে। তারপরে আমাকে মানসীর হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরের পথে পা বাড়াতে চাইছে। সে আমার কাছে বিদায় চাইছে।

চোখদু'টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। আমি চোখ মুছি।

জানকী ধমক লাগায়, "ছিঃ, কাঁদছেন কেন? পুরুষমানুষদের অমন কাঁদতে নেই। শোনেন নি, বৃন্দাবনচন্দ্র যেদিন গোপিনীদের অনন্ত বিরহ-সাগরে বিসর্জন দিয়ে বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন, সেদিন তাঁর চোখে কেউ একফোঁটা জলও দেখতে পায় নি।" জানকী একবার থামে। তারপরে বলে, "একটু উঠে বসুন তো!"

"কেন?"

"আপনার বিছানা থেকে আমার কম্বল ও বালিশটা নেব।"

ছিঃ! কথাটা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। দু'রাত তো বেচারী একখানি চাদর গায়ে দিয়ে কাটিয়েছে, বালিশ পর্যন্ত মাথায় দিতে পারে নি। আজ সে চলে যাচ্ছে, ওর জিনিস ওকে দিতে হবে বৈকি! তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই।

জানকী কম্বল ও বালিশটা তুলে নিয়ে আমাকে বলে, "বসুন।" একটু থেমে আবার বলে, "ভয় নেই, ছেঁড়া এয়ার-ম্যাট্রেসে শুয়ে রাত কাটাতে হবে না, দিদি বিছানা-পত্তর সব নিয়ে এসেছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না। আর অসুবিধে হলেই বা আমার কি? আমি তো তখন দেখতে আসব না।"

জানকী কম্বল ও বালিশ নিয়ে তার বিছানা বাঁধছে, বোসবাবু এবং মানসী তাকে সাহায্য করছে। আমি চুপ করে থাকি।

গোছগাছ শেষ হবার পরে পাণ্ডাজীর লোক জানকী ও বোসবাবুর জিনিসপত্র নিয়ে নিচে নেমে যায়—ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জানকী আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই জানকী সহসা নিচু হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

আমি তাকে বাধা দিতে পারি না। শুধু অপলক নয়নে তাকিয়ে

থাকি তার দিকে। সে আমাকে কাঁদতে নিষেধ করেছে, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার চোখদু'টি অশ্রুসিক্ত।

জানকী ধীরপায়ে এগিয়ে যায় মানসীর দিকে। সে মানসীকে প্রণাম করতে চায়। পারে না। মানসী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। সকৃতজ্ঞ স্বরে বলে, "রাধাগোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করি বোন, তুমি সুখী হও।"

জানকী একটু হাসে - বড় করুণ সে হাসি।

মানসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জানকী আবার ফিরে আসে আমার কাছে। স্বাভাবিক স্বরে বলে, "সকালে পথ্য খাওয়ার সময় প্রশ্ন করেছিলেন কেন আমি আপনাকে ভাল করে তুললাম? কেন জানেন?"

"কেন?" আমি তার দিকে তাকাই।

সে উত্তর দেয়, "আমি না-পেয়ে যা হারিয়েছি, মানসীদি যাতে পেয়েও তা না হারায়।..." আর কিছু বলে না জানকী। হয়তো বা বলতে পারে না। সে ত্রস্তপায়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

কাছে এসে বোসবাবু আমার একখানি হাত ধরে বলেন, "এবারে আসি তাহলে?"

মুখে কিছু বলতে পারি না। শুধু ঘাড় নাড়ি।

বোসবাবু আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান—মানসী অনুসরণ করে তাঁকে। সে জানকীদের ট্যাক্সিতে তুলে দিতে গেল।

আমি একা। সেদিন ব্রহ্মাণ্ডবিহারীর মন্দির থেকে জানকী হাত ধরে আমাকে যে ঘরে নিয়ে এসেছিল, সেই ঘরে আমি এখন একা। একাকী বসে বসে ভাবছি...না, মধু-বৃন্দাবনের কথা নয়, মানসীর কথাও নয়, জানকীর কথা।

জানকী চলে গেল। আর কোনদিন কোথাও তার সঙ্গে আমার দেখা হবে কি?

হয়তো হবে না। না হোক্, তবু এই কল্যাণী নারীর কোমল করপল্লবের স্পর্শ আমার মানসলোকে অক্ষয় হয়ে রইবে।

সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। এখান থেকে নিচের বড় রাস্তাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ট্যাক্‌সিতে মাল তোলা হয়ে গেল। বোসবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে জানকী কথা বলছে মানসীর সঙ্গে। ঐ সেই পথ, যে-পথ দিয়ে সেদিন আমি ও জানকী টাঙ্গায় চেপে ব্রহ্মাণ্ডঘাটে এসেছি। ঐ পথ দিয়েই জানকী আজ চলে যাবে আমাকে ছেড়ে।

এখনও সে কি যেন বলছে মানসীকে। সে কি আমার সেবা-শুশ্রূষা সম্পর্কে মানসীকে কোন পরামর্শ দিচ্ছে?

জানকীর কথা ফুরিয়েছে। মানসীর একখানি হাত ধরে সে শেষবারের মতো বিদায় নিল তার কাছ থেকে। তারপরে···

তারপরে সে সহসা ওপর দিকে তাকালো, দেখতে পেল আমাকে। আচ্ছা, জানকী কি জানত আমি এসময়ে এখানে এসে দাঁড়াবো?

একটু হাসল জানকী। সে হাত তুলে বলল, "আমি আসছি!"

আমিও হাত নাড়ি। বলি, "এসো।"

জানি না আমার দুর্বল কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছল কিনা।

জানকী ঘুরে দাঁড়ায়। সে গাড়িতে উঠে বসে।

মানসী দরজাটা বন্ধ করে দিল। একটা বিকট শব্দ হল। আমি কেঁপে উঠলাম।

গাড়ির ইঞ্জিন গর্জে উঠল।

গাড়িটা চলতে শুরু করেছে।

মানসী হাত নাড়ছে।

জানকী গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। সে একবার ওপর দিকে তাকালো। আমাকে দেখতে পেল কি?

গাড়ির গতি বাড়ছে। জানকী মুখ সরিয়ে নিল।

গাড়ি চলে যাচ্ছে। কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই বাঁকের মুখে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানকী চলে গেল।

তবু আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি পথের দিকে। অক্রূরের রথ অদৃশ্য হবার পরেও বিরহ-ব্যাকুলা সখীরা সেদিন কি এমনি অপলক নয়নেই পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন?

কিছুক্ষণ আগেও জানকী বৃন্দাবনচন্দ্রকে নির্দয় বলেছে। যেদিন তিনি গোপিনীদের অনন্ত বিরহ-সাগরে বিসর্জন দিয়ে বৃন্দাবন ত্যাগ করেছিলেন, সেদিন নাকি কেউ তাঁর চোখে একফোঁটা জলও দেখতে পায় নি। তবু আমি সেই নিষ্ঠুর কৃষ্ণের কাছেই কামনা করি—ঠাকুর, তুমি জানকীকে সুখী করো। তোমার মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমা-পথের প্রান্তে পৌঁছে সে যেন তার ভাবী জীবন-পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতে পারে।

একটা আকস্মিক স্পর্শে চমকে উঠি। কেউ আমার পিঠে একখানি হাত রেখেছে।

"চলো, ওখানে জানলার ধারে গিয়ে একটু বসবে। আমি বিছানা করে দিচ্ছি, তারপরে শুয়ে পড়বে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছো।" মানসী আমার একখানি হাত ধরে।

মানসীর হাত ধরে ফিরে আসি ঘরে, একদিন জানকীর হাত ধরে আমি যে ঘরে এসেছিলাম। আজ জানকী চলে গেছে, এসেছে মানসী। এখন এ ঘরে শুধু আমি আর মানসী। আমাকে মানসীর হাতে তুলে দিয়ে জানকী বিদায় নিয়েছে আমার কাছ থেকে।

শুধু জানকী নয়, যাদের সঙ্গে সেদিন মধু-বৃন্দাবনে এসেছিলাম, তারা সবাই ঘরের পথে পা বাড়িয়েছে। কেবল আমি একা রয়ে গেছি এখানে, এই গোকুল-মহাবনে।

না। আমি একা নই। আমার পাশে রয়েছে মানসী। আমার

সেই হারিয়ে-যাওয়া মানসীকে আমি আবার ফিরে পেয়েছি। বৃন্দাবনচন্দ্র ফিরিয়ে দিয়েছেন আমার মানসীকে। তাকে পেয়ে আজ আমার সব হারাবার ব্যথা হারিয়ে গেল। আমার ব্রজ-পরিক্রমা পূর্ণ হল। মধুবনবিহারী মধুসূদনের মধুর কৃপায় মধু-বৃন্দাবন আমার জীবনে চির-সুমধুর হয়ে রইল।

ব্রহ্মাণ্ডঘাট থেকেও ভেসে আসছে উপনিষদের সেই মধুর প্রার্থনা। পাণ্ডাজী বোধহয় তাঁর যজমানকে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন—

'ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ।
ওঁ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥'

—০—

চুরাশী ক্রোশ ব্রজ-পরিক্রমার পথপঞ্জী

দিন	স্থান	পর্ব	পৃষ্ঠা
			(মধু-বৃন্দাবনে)
১-৫	বৃন্দাবন দর্শন ও পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা	·· ব্রজপর্ব	১—২৯১
৬	মথুরা দর্শন	·· বনপর্ব	১—৭৭
৭	মথুরায় ভূতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে মধুবন (৩২ মাইল)। সেখান থেকে ধ্রুবটিলা তালবন ও কুমুদবন দর্শন (প্রায় ১০ মাইল)	··· ঐ	৯০—১২৩
৮	মধুবন থেকে বহুলাবন (৮ মাইল), পথে শান্তনুকুণ্ড দর্শন	··· ঐ	১২৮—১৩৭
৯	বহুলাবন থেকে রাধাকুণ্ড (৭২ মাইল), রাধাকুণ্ড পরিক্রমা	··· ঐ	১৪৩—১৭০
১০	রাধাকুণ্ড থেকে গোবর্ধন শহর, পথে কুসুম সরোবর দর্শন (৩ মাইল)। পৈঠা দর্শন। গিরিরাজ গোবর্ধন পরিক্রমা	··· ঐ	১৭১—২৩৮
১১	গোবর্ধন শহর থেকে ডিগ্ (লাঠাবন), পথে গুলালকুণ্ড ও গাঁঠুলি দর্শন (১২ মাইল)	ঐ	২৩৮—২৮৮
১২	ডিগ্ থেকে কাম্যবন (১৪ মাইল), পথে বিমলাকুণ্ড দর্শন। কাম্যবন দর্শন	মহাবন পর্ব	৯—৩৮
১৩	কাম্যবন থেকে চরণ-পাহাড়ী, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনকুটির, ব্যোমাসুরের গুহা ও ভোজনথালি পরিক্রমা	··· ঐ	৪১—৭৪

দিন	স্থান	পর্ব	পৃষ্ঠা
		(মধু-বৃন্দাবনে)	
১৪	কাম্যবন থেকে বর্ষাণা (৮½ মাইল)। বর্ষাণা পরিক্রমা	মহাবন পর্ব	৭৫—১০৩
১৫	বর্ষাণা থেকে নন্দগ্রাম (৮ মাইল), পথে প্রেম-সরোবর, সংকেত ও পাবণ-সরোবর দর্শন। নন্দগ্রাম পরিক্রমা ...	ঐ	১০৪—১২৫
১৬	নন্দগ্রাম থেকে কোশী (৮ মাইল), পথে যাবট দর্শন ...	ঐ	১২৬—১৩৬
১৭	কোশী থেকে সেরগড় বা খেলনবন (১৩ মাইল) ...	ঐ	১৪৭—১৫৬
১৮	সেরগড় থেকে নন্দঘাট (৮ মাইল) ...	ঐ	১৬২—১৭২
১৯	নন্দঘাট থেকে মাটবন (৬ মাইল), পথে ভদ্রবন ও ভাণ্ডীরবন দর্শন ...	ঐ	১৭৩—১৯৫
২০	মাটবন থেকে মান-সরোবর (৮ মাইল), পথে বিল্ববন দর্শন ...	ঐ	২০০—২২২
২১	মান-সরোবর থেকে লৌহবন (৮ মাইল), পথে পানিগাঁও দর্শন ...	ঐ	২৩৫—২৪৬
২২	লৌহবন থেকে ব্রহ্মাণ্ডঘাট (৯ মাইল), পথে রাবেল ও গোকুল-মহাবন দর্শন ...	ঐ	২৪৭—২৯০
২৩	ব্রহ্মাণ্ডঘাট থেকে বলদেব (৬ মাইল), দর্শন ...	ঐ	
২৪	ব্রহ্মাণ্ডঘাট থেকে মথুরা (৮॥ মাইল) ...	ঐ	
২৫	মথুরা থেকে বৃন্দাবন (৬ মাইল) প্রত্যাবর্তন ...	ঐ	

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ

যাঁদের বই থেকে সাহায্য নিয়েছি

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন	—কাশীদাসী মহাভারত
,, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	—শ্রীমদ্ভাগবতম্ (দশম স্কন্ধ)
,, জয়দেব গোস্বামী	—শ্রীগীতগোবিন্দম্
,, মালাধর বসু	—শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়
,, প্রবোধানন্দ সরস্বতী	—শ্রীনবদ্বীপ শতক
,, কৃষ্ণদাস কবিরাজ	—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
,, নরহরি চক্রবর্তী	—শ্রীভক্তিরত্নাকর
,, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—কৃষ্ণচরিত্র
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—গীতাঞ্জলি
,, নগেন্দ্রনাথ বসু	—বিশ্বকোষ
,, দেবেন্দ্রনাথ বসু	—শ্রীকৃষ্ণ
,, গোবর্ধন দাস	—শ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ
ঐ	—শ্রীব্রজধাম (পরিচয় ও পরিক্রমা)
,, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	—চিত্রে জয়দেব ও গীতগোবিন্দ
,, জগদীশচন্দ্র ঘোষ	—শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম
,, মোহিনীমোহন চক্রবর্তী	—ব্রজে চৌরাশীক্রোশ বন-পরিক্রমা
,, পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়	—ব্রজবার্তা ও তন্মাহাত্ম্য
,, বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রণতি সান্যাল	—শ্রীমদ্ভগবত পরিচয় ও আলোচনা
,, হরিদাস দাস	—শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান
,, রাধাগোবিন্দ নাথ	—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট
ঐ	—গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন (ষষ্ঠ পর্ব)
,, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ	—গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর
,, বলরাম ব্রহ্মচারী	—সংকীর্তন মালা
,, বিমানবিহারী মজুমদার	—চণ্ডীদাসের পদাবলী

স্বামী যোগানন্দ —শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত

শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় —ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য

Dr. R. C. Majumder —The History & Culture of Indian People, Vol. 5. Struggle for Empire.

,, B. C. Law —Historical Geography of Ancient India.

—Do— —Holy Places of India

,, B. N. Puri —Cities of Ancient India

,, Bimanbehari Majumder —Krsna in History & Legend.

Shri N. L. Dey —The Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India

,, J. H. Dave —Immortal India (Vol. IV)

Mr. M. F. O' Dwyer --Assessment Report (1898-99

District Gazetteer of U. P. Vol. VII—1918

Gazetteer of India, U. P , Mathura District—1918

Census—1918. District Census Handbook, Mathura.

যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন :—

শ্রীশৈলেশ দে

,, ফকির কুণ্ডু (কুণ্ডু স্পেশাল)

,, প্রাণেশ চক্রবর্তী

,, সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

,, ভূপেশচন্দ্র দত্ত

,, বিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য

,, কানাইলাল দাস

,, দিবাকর মুখোপাধ্যায়

,, শৈলেন্দ্রনাথ সরকার

,, পরিতোষ চক্রবর্তী

,, গুরুপদ সেনগুপ্ত

,, শম্ভুনাথ দাস

অধ্যাপক করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

,, প্রলয় সেন

শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

,, সন্ধ্যা সরকার

,, আরতি সেন

,, মিতা হোম চৌধুরী

,, সুরমা কুণ্ডু

শ্রীমান গৌতম ঘোষ দস্তিদার

এবং

জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্লান্তিহীন কর্মীবৃন্দ

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
দাম-বন্ধনলীলা (ভাগবত)	...	২৭২
নন্দগ্রাম	...	১১৭
নন্দঘাট	...	১৭৫
নন্দ-মোক্ষণলীলা (ভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়)	...	১৭০
শ্রীনবদ্বীপ শতক (শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী)	...	৫৮
নৌকাবিলাস	...	১৭৭
পাঁয়গ্রাম	...	১৪৭
পানিগাঁও	...	২৩৬
পাবণ-সরোবর	...	১১৪
পিছল-পাহাড়ী (কাম্যবন)	..	৬৪
প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনকুটির (কাম্যবন)	...	৫৬
প্রলম্বাসুর বধ (শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ও ভাগবত)	...	১৬৮, ১৯১
প্রেম-সরোবর	...	১০৪
বড়-বৈঠান	...	১৬৩
বৎসখোর	...	১২৯
বনপর্বের পরিচয়	..	৩
বলদেব বা দাউজী	...	২৪১
বর্ষাণা	...	৭৫
বান্দীগ্রাম	...	২৩৯
বিমলাকুণ্ড	...	৯
বিলাস গড় (বর্ষাণা)	...	৯৪
বিল্ববন (শ্রীবন)	...	২০২
ব্যোমাসুর বধ (ভাগবত)	...	৬২
বৈষ্ণবধর্ম	...	২৪২
ব্রহ্মাণ্ডঘাট	...	২৫৯, ২৮১
ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা (ভাগবত)	...	৬৯
ব্রজপর্বের পরিচয়	...	৩
ব্রজ-মণ্ডলের ইতিহাস	...	৮০, ৩৫, ২৪৮
ভক্তিরত্নাকর (শ্রীনরহরি চক্রবর্তী)	..	৯, ২৩, ৩২, ৬৪, ২৩৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভদ্রবন	...	১৮৩
ভাণ্ডীরবন	...	১৮৩
ভোজনথালি (কাম্যবন)	...	৬৬
ভোজনলীলা (ভাগবত)	...	৬৮
ময়ূরকণ্ঠী (বর্ষাণা)	...	৯১, ৯৩
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের ব্রজ-পরিক্রমা (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)	...	৬, ১২৪, ১৪৯, ২০৫, ২৭৫
মহাবন (গোকুল)	...	২৫৬
মহাবন পর্বের পরিচয়	...	৩
মাটবন	...	১৮৮, ২৩৫
মান-ভঞ্জনলীলা (মানগড়, বর্ষাণা)	..	৮৯, ৯৮
মান-ভঞ্জনলীলা (মান-সরোবর)	...	২২১
মান-সরোবর	...	২১৫
শ্রীমালাধর বসু (গুণরাজ খান)	...	৫৯
মুচুকুন্দের ভগবৎস্তুতি (ভাগবত)	...	১৪৪
যমলার্জুন-ভঞ্জনলীলা (ভাগবত)	...	২৭১
যমুনা	...	১৭৫, ১৮০
যাবট	...	১২৬
যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজের পরীক্ষা (মহাভারত)	...	২৫
শ্রীরাধা	...	৯৫, ২৪৩, ২৫১
রাবেল	...	২৫১
শ্রীরামঘাট	...	১৬২
লুকোলুকি কুণ্ড (চরণ-পাহাড়ী, কাম্যবন)	...	৪৯
লোহবন	...	২৩৭
সেরগড় (খেলনবন)	.	১৪৭
শ্রীবন (বিল্ববন)	...	২০২
সংকেত	...	১০৮
শ্রীসনাতন গোস্বামী	..	১১৫, ১৫৫, ২৪০

—•—